ভালবেসেছ—আজ তাকে তুমি ফেলে দে... করে? বীণাই বা কি করে এ কথা তাকে জানাবে? এ কাজটা যে ... অন্যায় হবে মা!"

মিসেস্ রায় এ কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। তিনি উদাসীন ভাবে বলিলেন, "সে এখন আর হয় না লীলা! আজ যদি বীণা মনের আবেগে এ রকম একটা জীবনব্যাপী ত্যাগ করতে রাজি হয়, তাহলে সে সেটা বিষম ভুল করবে, আর সত্যিই সে কোন দিন জীবনে সুখী হতে পারবে না। আর অরুণের এ দুর্ঘটনায় আমি যে কত আঘাত পেয়েছি—সে অন্তর্য্যামী যদি কেউ থাকেন, ত তিনিই বুঝবেন। কিন্তু তা হলেও আমি মা—আমাকে নিজের সন্তানের ভাল-মন্দ ত আগে দেখতে হবে? সাধ করে একটা দুর্দ্দৈব কে ডেকে আনতে চায়? আমি খুব জানি—এ বিবাহ হলে বীণার সারা জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।"

এ কথায় লীলার মন শান্ত হইল না। সত্যকার মা যে, সে কি কেবল নিজের সন্তানের ভালমন্দই দেখিবে? আর কাহারও দিকে দেখিবার তাহার অবসর নাই? অরুণও ত একদিন মা বলিয়া স্নেহের দাবী জানাইয়া, কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল? আর বীণার সম্বন্ধেই বা এত ভাবনা কেন? মানুষের জীবনে স্নেহ, ভালবাসা কর্ত্তব্য-জ্ঞান কিছুরি কি দরকার নাই? শুধু নিজের সুখই সব চেয়ে বড়? দু'দিন আগে যখন তাহার স্বাস্থ্য, রূপ, শক্তি ... ছিল, তখন ত বীণা তাহাকে ভালবাসিয়াছিল!

সে বলিল, "কিন্তু ধর, যদি ওদের বিয়ের পর এ ব্যাপারটা ঘটতো, তখন তোমরা কি করতে? তখন ত তাকে এমন অসঙ্কোচে তফাৎ করে দিতে পারতে না?"

মিসেস্ রায়ের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মেয়েটার কি

সকল সময় সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার! সহজ দিকটা ও কিছুতেই বুঝিবে না বলিয়া যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে! নিজের বোনটার কথা ভাবিয়া দেখ—তা না,—যাহাকে কস্মিন্‌কালে চোখেও দেখে নাই, তাহার জন্য যত রাজ্যের দরদ উথলিয়া উঠিল! কি বিপদেই যে তিনি পড়িয়াছেন।

প্রকাশ্যে তিনি অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "না, তা পারতুম না! তখন যত বড়ই দুঃখ হোক, বীণার মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে রকম কিছুই হয় নি—একটা মুখের কথা হয়েছিল মাত্র। সে রকম কথা কত লোকের সঙ্গে হয়, কত লোকের সঙ্গে ভেঙ্গে যায়—কাজেই, সেটাকে বড় করে তোলবার কোন দরকার নেই। বিশেষ, এ প্রস্তাব আমি নিজে করিনি, অরুণই বীণাকে এ কথা জানিয়েছে। তার বড় উদার মহৎ প্রকৃতি। সে কি কখনো এ অবস্থায় আর একটা তরুণ জীবনকে এই রকম নিরানন্দ দাসত্বের জীবনে টেনে আনতে পারে? সে তার নিজের দিক থেকেই এ বিবাহ-ভঙ্গের প্রস্তাব করেছে।"

—"তাকে ত এ কথা বলতেই হবে। সে জানে, এ ঘটনার পর আর আগের মত সে বীণাকে নিতে পারে না। তাই সে এ ক্ষেত্রে যা বলা উচিত—তাই বলেছে। সেটা তার মহত্ত্ব। কিন্তু সে বলেছে বলেই কি তার সম্বন্ধে তোমাদের সব কর্ত্তব্য ফুরিয়ে গেল? এখন বীণার উচিত বলা—যে, সে কখন তাকে ত্যাগ করতে পারে না। যদি বীণা সত্যই তাকে ভালবেসে থাকে, তা হলে এ ছাড়া আর সে কি বলতে পারে, আমি ত তা বুঝতে পারি না। এখন শুধু বীণাই তার মনের অগাধ ভালবাসা দিয়ে তাকে শান্তি ও সুখ দিতে পারে, তার সমস্ত হতাশা ও বেদনা মুছিয়ে দিতে পারে। এ তো আর কারু কাজ নয়!"

মিসেস্ রায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ভাবে বলিলেন, "তুমি এ বিষয়টা শুধু একটা সেন্টিমেন্টের দিক দিয়ে দেখছো, বিচার করে দেখছো না। জীবনটা অত্যন্ত বাস্তব পদার্থ, ভাবের আবেগ দু দশ দিন চলতে পারে। তার পর যখন সে ভাব ফুরিয়ে যাবে, তখন জীবনকে ঠেকাবে কি দিয়ে? তোমরা ছেলেমানুষ, সংসার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই তোমাদের, শুধু কতকগুলো পুঁথিগত কথা আওড়াতে খুব শিখেছ! তলিয়ে কোন কথা বুঝলে কি এ প্রস্তাব করতে পারতে? এ বিবাহ হলে বীণাকে যাবজ্জীবনের মত ধাত্রী ও বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে। অরুণ এখন সম্পূর্ণ অসহায়, সব সময়ই স্ত্রীর উপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া তার আর উপায় নেই। এখন বোঝ—এই সারা জীবন বন্দিত্ব স্বীকার করে নেওয়া কি সহজ কথা? বিশেষ, বীণার মত মেয়ে, যে জীবনে কোন দিন কোন দুঃখ-কষ্টের লেশ মাত্র জানে না, কোন কিছু করতে যে মোটেই অভ্যস্ত নয়, চিরদিন আদরে ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যে মানুষ হয়েছে, তার কি ওই রকম জীবন কোন দিন সহ্য হবে? এ ভাবে থাকতে হলে সে যে মরে যাবে!"

মিসেস্ রায় চৌকি হইতে উঠিয়া চঞ্চল ভাবে ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে লাগিলেন। লীলাও আর কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুই একবার ঘুরিয়া আসিয়া মিসেস্ রায় বলিলেন, "তার কেনই বা সে ইচ্ছে করে এই দুঃখের জীবন মাথায় তুলে নেবে! তার মত মেয়ে—রূপে-গুণে অতুলনীয়, সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন সে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার সামনে খোলা রয়েছে,—সে স্বচ্ছন্দে যে-কোন যোগ্য পাত্রকে বিবাহ করে সুখী হতে পারে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই তার অনুকূল! সে কোন্ দুঃখে সাধ করে এ রকম জন্মব্যাপী দুঃখকে বরণ করে নিতে

যাবে? তুমি যাও তার কাছে, তার কাছে কাছে একটু থেকো—আর আমি যে কথাগুলো বল্লুম—সেগুলো দরকার হলে বুঝিয়ে বোলো তাকে। তোমাদের এ-সব ভাবুকতা দূরে ফেলে তার সমস্ত অবস্থা বুঝে দেখা উচিত, ও অরুণের চিঠির সেই মত উত্তরও দেওয়া উচিত। বিশেষ, এ প্রস্তাব অরুণের কাছ থেকেই আসছে, এতে আমাদের পক্ষে সঙ্কোচ করবার কোন কারণ নেই।”

লীলা বুঝিল, মাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বৃথা, তিনি কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প ছাড়িবেন না। আর কোন তর্ক করিলে কেবল একটা মনান্তরের সৃষ্টি হইবে মাত্র।

সে আর কোন কথা না বলিয়া শুষ্ক হৃদয়ে বীণার সন্ধানে চলিয়া গেল।

[৪]

মিঃ রায়ের দুই কন্যা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ গুণ ও প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল। বীণার রূপ মার মত অতুল, সে নিতান্ত চপল লঘু-প্রকৃতি। লীলার চেহারায় এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না, মোটের উপর সে সুশ্রী। সে পিতার উন্নত চিন্তাশীল হৃদয় ও জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছিল।

কিশোর বয়স হইতেই বীণা সমাজের একটি উজ্জ্বল রত্ন-বিশেষ। সমাজের সমস্ত আদবকায়দা, চলাফেরা, হাসিগল্প, কোথায় কতটা এবং কাহার সঙ্গেই বা কি কি পরিমাণ চালাইতে হইবে, এ সবে সে বিশেষ অভ্যস্ত। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, সংযত শোভন ভদ্রতা, কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও কৃত্রিম হাবভাবে বিমুগ্ধ তরুণের দল অন্ধ উপাসকের

ন্যায় সর্ব্বদা তাহার স্তব-গুঞ্জন করিত, সঙ্গে সঙ্গে অনুগত জনের মত ফিরিত। সেও নিজের মোহিনী শক্তির প্রভাব তাহাদের উপর বিস্তার করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে নিজের চারি পাশে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট করিয়া রাখিত। সে কাহাকেও ভালবাসিত না, জয়ের আনন্দেই সে বিভোর।

বীণার উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপের আভায় সকলেরই দৃষ্টি ঝলসিত। কাজেই বেচারা লীলা দিদির আওতায় একেবারে মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। তাহার দিকে সহজে কাহারও দৃষ্টি পড়িত না, সেও প্রাণপণে এই সব অকিঞ্চিৎকর সঙ্গ ও নির্লজ্জ চাটুবাদ এড়াইয়া চলিত। বীণার কৃত্রিম হাবভাব, সর্ব্বদা পুরুষের মনোরঞ্জনের সযত্ন প্রয়াস দেখিয়া বিষম বিতৃষ্ণায় তাহার হৃদয় বিমুখ হইয়া গিয়াছিল। মিসেস্ রায় বীণার মত কন্যার গর্ব্বে আত্মহারা। লীলাকেও তিনি নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এখানে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। দিন যাইতে লাগিল, লীলার হৃদয়ের জ্ঞানস্পৃহা ততই বাড়িতে লাগিল। কলেজের পাঠ্য বিষয়ের সীমার মধ্যে সে আর নিজেকে বদ্ধ রাখিতে পারিত না। জগতে যাহা কিছু জানিবার আছে, সে-সবই সে জানিতে চায়। সে তাহার সমস্ত অবসর বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা ও পাঠের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিল। তাহার মত তরুণীর এইরূপ অদম্য জ্ঞান লাভের চেষ্টা ও পাঠানুরাগ দেখিয়া কলেজের জ্ঞানবৃদ্ধ প্রফেসরগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

সুদীর্ঘ আট বৎসরের সাধনার ফলে সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত-হৃদয় লইয়া লণ্ডন হইতে বাড়ী ফিরিয়া লীলা দেখিল, সংসারে মা ও বীণার সঙ্গে তাহার কোনখানে যোগ নাই, সে মার কথামত কোনরূপে চলিতে

পারে না। যে-সব অসার বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাদের সময় কাটে, যে-সব তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন হয়, লীলা কিছুতে সে-সবের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। অথচ তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে মা বিরক্ত হন, অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও মার সঙ্গে তাহার তর্কবিতর্ক বাধিয়া যায়। লীলা ক্ষুব্ধ হইল, বেদনা পাইল, কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায় দেখিল না।

পক্ষান্তরে মিসেস্ রায়ও দীর্ঘকাল পরে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সর্ব্বক্ষণ যেন সে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য পণ করিয়া বসিয়া আছে! তাহার স্বাধীন মত, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, সংস্কারশূন্য উন্নত মনের পরিচয় তিনি পাইলেন না, এবং তাহার গুণ গ্রহণ করিবার মত শক্তিও তাঁহার ছিল না। তিনি বুঝিলেন, সে অত্যন্ত অবাধ্য ও একগুঁয়ে এবং জেদী। প্রতি পদে, প্রতি কথায়, সকল কার্য্যেই তাহার সহিত তাঁহার মতভেদ আরম্ভ হইল। ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই সে তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল।

মিঃ রায় জানিতেন, তাঁহার এই তেজস্বিনী দুর্ব্বোধ মেয়েটিকে কেহ বুঝিবে না। তিনি তাঁহার হৃদয়ের অগাধ স্নেহে ও আদরে অনাদৃতা বালিকাকে বুকে টানিয়া লইলেন। পিতার স্নেহের আশ্রয়ে লীলা আপনার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের সমস্ত বেদনা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া কেবল একটিমাত্র সংবাদে লীলা সুখী হইয়াছিল সেটি বীণার সঙ্গে অরুণের বিবাহ সংবাদ। সে সংবাদপত্রে এই তরুণ যুবকের কত সাহস, কত বীরত্বের কাহিনী পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ, বা পরিচয়ের আগেই সে তাহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ভাল বাসিয়াছিল।

অনেক সময় সে অরুণের কথা মনে মনে ভাবিত। বীণা কি তাহাকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারিবে ? সে যেরূপ চঞ্চল ও লঘুপ্রকৃতি, অরুণের মত উন্নতচিত্ত যুবকের রুচি ও মন বুঝিয়া চলিতে পারিবে কি ? আজ অরুণ তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু শুধু রূপের মোহ কত দিন স্থায়ী হইবে, যদি তাহার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না থাকে ?

এই ভাবে দিন কাটিতেছিল। লীলার বাড়ী ফিরিবার তিন মাস পরে এক দিন অতর্কিত বজ্রাঘাতের ন্যায় অরুণের দুর্ভাগ্যের সংবাদ এই পরিবারের সকলকে মুহ্যমান ও স্তব্ধ করিয়া দিল।

ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ঘোষাল সাহসের সহিত নিজ সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সহসা নিকটে একটি কামান ফাটিয়া যাওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। হাসপাতালে চিকিৎসা হইবার সময়ও অরুণের মনের বলের লাঘব হয় নাই। তখনো তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি আবার সুস্থ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু প্রায় এক মাস চিকিৎসার ফলে ডাক্তারদের সমবেত পরামর্শে স্থির হইল, মাথার "ওপটিক নার্ভ" আক্রান্ত হইয়াছে, লেফটেন্যাণ্ট জীবনে আর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন না।

[৫]

বীণা তাহার ঘরে একখানা সোফার উপরে একা শুইয়া উদাস নেত্রে জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল। অবিরাম রোদনে তাহার চোখ দুটি আরক্তিম ও স্ফীত। একখানি লতাপুষ্পখচিত রেশমী রুমালে সে ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল মুছিয়া ফেলিতেছিল।

স্বভাবতই অপূর্ব্ব সুন্দরী সে। এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। সর্ব্বদা সযত্নরচিত বেশভূষা, সাজসজ্জায় সেই সংস্কৃত ও মার্জ্জিত সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ প্রভায় দর্শকের দৃষ্টি ও মন মুগ্ধ করিয়া তুলিত। সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই সে-রূপ অপূর্ব্ব ও নয়নাভিরাম। আজও তাহার সেই অশ্রুসিক্ত ম্লান করুণ রূপে তাহাকে সুদক্ষ শিল্পীর রচিত মনোরম চারুপ্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছিল।

সে অত্যন্ত কোমল ও লঘুপ্রকৃতি। অজস্র আদরে ও প্রশ্রয়ে পালিত হওয়ায় তাহার প্রকৃতি গঠিত হইতে পারে নাই। সে প্রজাপতির মতই মনোরম—প্রকৃতিও তাহার সেইরূপ সুখী ও আমোদ-প্রিয়; সংসারে অভাব বা দুঃখ-কষ্টের কল্পনামাত্রও সে সহিতে পারে না। তাহার জীবনের এই প্রথম আঘাতে সে সত্যই প্রথমটা একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

লীলা ধীরে নিঃশব্দ-পদে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ মুগ্ধ ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভগিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার পাশে ধীরে বসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া ডাকিল—"দিদি!" উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। বীণা মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই লীলার সজল নয়নের সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল

—"লিলি! আমার বুকটা যেন ভেঙ্গে গেছে ভাই!" বীণা বালিশে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। লীলা নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল, তাহার চোখের জলে বীণার মাথার চুলের রাশি সিক্ত হইতে লাগিল।

টেবিলের উপর সুদৃশ্য ফ্রেমের ভিতর হইতে অরুণের নিশ্চল প্রতিকৃতি নীরব সহাস্যমুখে এই দুই ক্রন্দনরতা ভগিনীর দিকে চাহিয়া ছিল।

শোকের বেগ একটু প্রশমিত হইলে লীলা বলিল, "অরুণের ভাগ্যে যে এমন দুর্ঘটনা ঘটবে, তা কে ভেবেছিল? চিরজীবনের মত দৃষ্টি হারিয়ে থাকা যে কি ভয়ানক—মনে মনে কল্পনা করতেও পারা যায় না। যা হোক, সব মন্দ জিনিসের ভিতরই কিছু না কিছু ভাল থাকেই,—এখন সেইটাই আমাদের পরম সান্ত্বনা তুমি যে তাকে একবারে হারাও নি, এইটেই এখন সব চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের কথা নয় কি ভাই?"

বালিশের উপর হইতে মুখ তুলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বীণা বলিল, "এখন আর তাতে আমার কোন সান্ত্বনাই নেই।"

—"কেন নেই? ভেবে দেখলে এখনো এর ভাল দিকটাও ঢের আছে। যুদ্ধে অরুণ একেবারে মারা পড়তেও পারতো, তা হলে আর তাকে ফিরে পাবার কোন আশা থাকতো না। এখন সে বেঁচে আছে, এখনো তোমাকে সে আগের মতই বা হয় ত আগের চেয়েও বেশি ভালবাসে। সে আবার তোমারি কাছে ফিরে আসছে। এখন এইগুলোই ত পরম সান্ত্বনা, দিদি!"

—"তুমি যে গোড়ার কথাটাই বুঝছো না লিলি! এর পরে আর তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ হতে পারে না। আমি তার সেই দৃষ্টিহীন চোখ, সে মুখ কিছুতেই দেখতে পারবো না। এ-কথা মনে করতে গেলে আমি যেন পাগল হয়ে উঠি। আমার বুকের ভিতর যে কি রকম করছে, তুমি বুঝতে পারবে না। মনে হচ্ছে, যে-দিকে হোক, ছুটে পালিয়ে যাই,—তাতে যদি মনে শান্তি আসে!"

লীলা সস্নেহে তাহার বিশৃঙ্খল চুলের গোছা গুছাইয়া দিতেছিল। সে বলিল, "জীবনের প্রথম আঘাতেই এমন করে ভেঙ্গে পড়ো না ভাই! সংসারে মানুষকে অনেক ধাক্কা খেয়ে, অনেক ঝড়-তুফানের

মধ্য দিয়ে যেতে হয়,—এত অল্পে কাতর হলে কি চলে? তুমি ত কোন দিন জীবনে কোন কষ্ট পাও নি, দুঃখ সহ্য করতে মোটেই অভ্যস্ত নও,—তাই প্রথমটা এ রকম মনে হচ্ছে। ধীরভাবে গ্রহণ করতে পারলে দেখবে, ক্রমেই এটা সহজ হয়ে আসবে। আরও দেখবে যে, যাকে ভালবাস, এত সহজে তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না। তাকে দেখতে হবে বলে এখন এত ভয় পাচ্ছ, এর পরে দেখবে তাকে সুখী করা ছাড়া জীবনে তোমার আর প্রার্থনীয় কিছু নেই। আর এ তো এখন তোমারি কাজ দিদি! তোমার ভালবাসার আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় তার শান্তি আছে? সংসারে আমাকে কোথাও দরকার নেই তা জানি; কিন্তু ধরো, যদি আমাকে কারু এমনি দরকার হতো, আমি কি তখন পেছিয়ে আসতুম?"

টেবিলের উপর সুদৃশ্য পুষ্পাধারে ফুল সাজানো ছিল। বীণা একটা গোলাপ তুলিয়া লইয়া বলিল, "উঃ! মাথাটা এমন ধরেছে!"

সে ফুলটি নাকের কাছে ধরিয়া লীলার কথার উত্তরে বলিল, "তুমি যে পিছাতে না, তা আমি জানি লিলি! তুমি চিরদিনের গোঁয়ার, দশ জনে যা করতে ভয় পায়, তুমি না ভেবে-চিন্তে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়,—এই তোমার স্বভাব। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি ঠিক তার উল্টো প্রকৃতির! আমি বড় অল্পে কাতর; দুঃখ-কষ্ট আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। অরুণকে বিয়ে করা দূরে থাক, আমি আর কখনো তার সঙ্গে দেখা করতেও পারবো না। মা বলেছেন, এ বিয়ে হলে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।"

—"মার কথা চুলোয় যাক! বয়স তো যথেষ্ট হলো, নিজের কথা একটু নিজে ভাবতে শেখো দিদি!" অত্যন্ত রাগিয়া লীলা এই কথা বলিয়াই তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইল, শান্তভাবে বলিল, "তুমি

যদি সত্যই তাকে ভালবেসে থাক, তা হলে এখন তোমার কি করা উচিত বা অনুচিত, এ কথা অন্যের তোমাকে শেখাবার কোন দরকার হবে না। তোমার নিজের মন থেকেই এর উত্তর পাবে। আমি তাই বলছি এখন মিছে কান্নাকাটি না করে, কথাটা ভাল করে শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখ, কি তুমি করতে পার। আমার মতে তোমার সর্ব্বপ্রথম কাজ হচ্ছে তাকে লেখা, যে, ঘটনা যেমনি হোক, তার সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ তা অনিবার্য্য, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। তোমার এই কথা তাকে যে কত শান্তি দেবে, তা তুমি এখন বুঝতে পারছো না।"

—"আমি কখন তাকে এই কথা লিখতে পারি না—কখন না! তুমি কি পাগল হয়েছ লিলি?" উত্তেজনার আতিশয্যে বীণা বিছানায় উঠিয়া বসিল। "আমি যখন নিশ্চয় জানি যে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে অসম্ভব, তখন খামকা তাকে মিছে আশা দিয়ে চিঠি লিখে লাভ কি? যদিও এ ঘটনায় আমার বুক একেবারে ভেঙ্গে গেছে, তবু তাকে সত্য কথা বলবার মত সাহস আমার যথেষ্ট আছে।"

লীলা একদৃষ্টে বীণার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সে বলিল, "তুমি যদি এটা একেবারে স্থিরনিশ্চয় বলে মীমাংসা করে রেখে থাক, তা হলে এর ওপর আর বলবার কি আছে! এখন তা হলে মাকে নিশ্চিন্ত হতে বলি গে। তিনিই ব্যস্ত হয়ে আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, পাছে তুমি ভালবাসার খাতিরে তাকে কোন আশা দিয়ে চিঠি লিখে ফেল। তাঁর বোঝা উচিত ছিল, আর যে যাই করুক, তাঁর বীণা কখনো এমন কাজ করতে পারে না।"

তার পর একটু হাসিয়া সে আবার বলিল, "তোমরা ত জানোই—আমি একরোখা কাঠখোট্টা মানুষ—খাই দাই, ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াই

বড় জোর একটু পড়াশুনা করি। কিন্তু ভালবাসার কোন ধার ধারি না—ও বিষয়টা ভাল বুঝিও না। তুমি আজ যে ভালবাসার নমুনাটা দেখালে ভাই! এই যদি ভালবাসা হয়, তাহলে ও-বস্তুকে দূর থেকেই নমস্কার করছি! আমার এই কাঠখোট্টা স্বভাবই ভালো—ও-জিনিস বুঝে কোন দিন দরকার নেই বাবা!"

বীণার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "মা যে বলেন, তোমার কিছু মায়া-দয়া নেই, তুমি একেবারে হার্টলেস্—তা সে-কথা সত্যি; না হলে তুমি আমার এমন শোকের সময় আমায় এরকম ঠাট্টা করতে পারতে না!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "দোহাই তোমার, রাগ করো না মিছেমিছি! যেটা তুমি শোক বলে ভাবছো, ওটা শোক নয়—শোকের অভিনয় মাত্র। তোমাদের সমাজের নিয়ম ও ফ্যাসান যে, এ রকম ঘটনা হলে নায়িকার বুকভাঙ্গা পতন, মূর্চ্ছা, শোক ইত্যাদি হওয়া উচিত,—তুমিও সে নিয়মটা উল্টে দিতে পারো না। কাজেই, যা যা করতে হয়, সবই করেছ; আর দু এক ঘণ্টা বাদে একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠবে—এখন কোন ভয় বা ভাবনা নেই। যথার্থ আঘাত যার লাগে, সে কি সে সময় বসে বসে নিজের ভাল মন্দ সম্বন্ধে এমন চুলচেরা বিচার করতে পারে? যা হোক, আমি এখন যাই—তোমাকে সান্ত্বনা দেবার বিশেষ কিছু ত দরকার দেখছি না। ভাল কথা, অরুণের চিঠিখানার কি জবাব দেবে তা হলে?"

—"সে আমি ওই টেবিলের ওপর লিখে রেখেছি। কিন্তু লিলি, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার কর—এ একেবারে আমার পক্ষে অসহ্য!"

বীণা রুমালখানা তুলিয়া লইয়া আবার চোখ ঢাকিল।

লীলা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "এর মধ্যেই লিখে ফেলেছ? কই, দেখি?"

টেবিলের উপর হইতে খোলা চিঠিখানা চকিতে তুলিয়া লইয়া লীলা পড়িতে লাগিল—

"প্রিয় অরুণ! তোমার দুর্ভাগ্যের সংবাদ আমায় একবারে ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি যে কি যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছি, সে লিখে জানাতে পারবো না। তুমি আমাদের বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছো, আমিও অনেক ভেবে দেখেছি—এখন সেইটাই উচিত। কারণ, এখন তোমার যেরূপ স্ত্রীর দরকার, আমি তার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি অত্যন্ত অল্পেতেই কাতর হয়ে পড়ি—ধৈর্য্য ও সহ্য করবার শক্তি আমার মোটে নেই। সেবা ও যত্ন—যা তোমার এখন সারা জীবন অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন—আমি তাতে একবারে অক্ষম। মা-ও বলেছেন, এ বিবাহ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া এখন আমাদের দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত কষ্টকর, তাই আমার মনে হয়, এ কষ্ট স্বীকার করবার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমি তোমায় কখনো ভুলবো না, কখনো না! প্রার্থনা করি—তোমার অবশিষ্ট জীবন যতদূর সম্ভব—যেন সুখী হয়! এখন তবে বিদায়!

বীণা—"

লীলা পত্র পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—এ কি হৃদয়হীনের মত নিষ্ঠুর উত্তর! পত্রের কোনখানে একটা আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা বা সমবেদনার লেশমাত্র নাই! মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহার দুরবস্থার সময় এমনি করিয়া এক কথায় তাহাকে ছাড়িয়া ফেলিতে পারে?

বীণা কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিল,

"লিলি! তুমি এখানা ডাকে ফেলিয়ে দিতে পারবে? অরুণ এখন কিছু দিন কিরণের কাছে থাকবে লিখেছে। চিঠিখানা বসন্তপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেই চলবে।"

লীলার আর কোন কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সে পত্রখানা হাতে করিয়া নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিল।

[৬]

অপরাহ্নে ক্লাবের টেনিস-কোর্টে বীণা তাহার বন্ধুদের সঙ্গে টেনিস খেলিতেছিল। লীলার কথাই ঠিক—সমস্ত দিন একা ঘরে বন্ধ থাকিয়া ও প্রচুর অশ্রুবর্ষণ করিয়া তাহার হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া গিয়াছিল। সে প্রজাপতির মতই মনোরম—ও তাহারি মত চঞ্চল ও লঘুপ্রকৃতি—তাহার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। যেমন সে অল্প আঘাতে মুহ্যমান হইয়া পড়ে—তেমনি অল্পেতেই সব ভুলিয়া যায়। কোন কিছুই তাহার অন্তরে স্থায়িভাবে ছাপ রাখিতে পারে না।

লীলা তাহার সঙ্গে ক্লাবে আসিয়াছিল,—সে খেলায় যোগ না দিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সকলের খেলা দেখিতেছিল। আজ তাহার মনে প্রতিদিনের মত আনন্দ বা স্ফূর্তি ছিল না,—সমস্ত দিনের মধ্যে আজ সে একবারও তাহার অভ্যস্ত লেখাপড়ায় বা কোন কাজে মন দিতে পারে নাই। অরুণের শোচনীয় পরিণামের কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। এ সম্বন্ধে তাহার নিজের কাতরতা দেখিয়া নিজেই সে মনে মনে বিস্মিত হইতেছিল। সকলেই এ সংবাদ শুনিয়াছিল, ও শুনিবামাত্র আহা! উহু! করিয়া দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিয়া এ সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে,

স্থির করিয়া—প্রতিদিনের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে খুব সহজেই সে মন দিল; কিন্তু তাহার এ হইল কি! যাহাকে সে কোন দিন চক্ষে দেখে নাই, যাহার সঙ্গে তাহার কোন পরিচয় মাত্র নাই তাহারি কথা ক্ষণে ক্ষণে মনে হইয়া কেবলি আজ তাহার চোখে জল আসিতেছে, এ কথা সে কাহাকে বলিবে, কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

ও পাশের কোর্ট হইতে টেনিসের ব্যাট হাতে লইয়া নির্ম্মলা ছুটিয়া আসিল। "লীলা! খেলতে যাবি নি! দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?"

লীলা বলিল, "আজ আমি খেলবো না ভাই! তোরা যা, খেলগে —আমার আজ ভাল লাগছে না কিছু!"

নির্ম্মলা কাছে আসিয়া লীলার মুখের কাছে মুখ লইয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সকৌতুকে বলিল, "তোর আবার আজ হলো কি? মন ভাল না থাকা, মুখ ভার, এ সব উপসর্গ তোর ত কোন কালে ছিল না,—ও সব ত আমাদেরি একচেটে জিনিস। কিন্তু আজ উল্টো রকম দেখছি যে! না ভাই! চল্! একজন পার্টনার না হলে আমাদের খেলা হচ্ছে না! আমার সঙ্গে তুই খেলবি চল্!" নির্ম্মলা লীলার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

লীলা হাত ছাড়াইয়া বলিল, "না ভাই নিলি! আজ আমি খেলতে পার্ব্বো না। সত্যিই কিছু ভাল লাগছে না! ওই [illegible] প্রভা দাঁড়িয়ে আছে,—ওকে ডেকে নিয়ে তোরা খেলগে যা!"

—"ও কিছু খেলতে পারে না। কিন্তু তাও না হয় ওকে নিয়েই খেলছি; কিন্তু তোর হল কি—সেটা বল্? এখানে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি তুই—এই রকম মুখ করে—দেখে আমি খেলতেই বা যাই কি করে?"

বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া ওঠায় লীলা উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কাহাকেও না দেখিয়া বলিল, "হবে আর কি! মনটা বিশেষ ভাল নেই। কিন্তু কিরণ আজ কেন এখনো আস্‌ছে না বল্ তো? সে তো এত দেরি কোন দিন করে না?"

নির্ম্মলা লীলার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "অবাক্ করেছিস্ তুই! এই জন্যে মুখে বিশ্বের বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্ বুঝি? যা হোক, এতক্ষণে একটা হদিস্ পাওয়া গেল! আহা মরে যাই আর কি!"

নির্ম্মলা তাহার পরিপুষ্ট শুভ্র বেল-ফুলের মত মুখখানি লীলার মুখের কাছে আনিয়া সকৌতুকে গাহিল—

"ওই বাঁশী-স্বর তার, আসে বার বার
সেই শুধু কেন আসে না—
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।"

লীলা রাগিয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া বলিল, "যা—দূর হ এখান থেকে, বিশ দিন না বলেছি—কিরণ আমার বন্ধু—তাকে নিয়ে তোদের ঐ-সব চিরকেলে পচা ঠাট্টা করবিনি কখনো?"

নির্ম্মলা বলিল, "ও বাবা! মেয়ের যে একেবারে মিলিটারী মেজাজ দেখছি! মরগে যা তবে এখানে একলা দাঁড়িয়ে! কিরণ এলে এর শোধ নিয়ে তবে আমার অন্য কাজ!"

নির্ম্মলা চলিয়া গেলে লীলা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া হলের ভিতর

আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতা ও মিঃ ঘোষ ব্রীজ্ খেলায় মত্ত ছিলেন, সে কিছুক্ষণ তাহাই দেখিতে লাগিল।

মিঃ রায় বলিলেন, "লিলি যে আজ এদিকে? খেলতে যাও নি?"

লীলা শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল, "না বাবা! আজ খেলতে ভাল লাগছে না!"

তাহার পরই সে মিঃ ঘোষের বিশাল পরিপুষ্ট স্কন্ধদেশে তাহার হাত রাখিয়া আব্দারের স্বরে বলিল, "কাকা! আপনি যে নতুন বাগানবাড়ী কিনলেন, আমরা বুঝি সেখানে যেতে পাব না? কবে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, বলুন!"

মিঃ ঘোষ তাসের হিসাব একমনে করিতেছিলেন, সহসা আক্রান্ত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তোরা যেদিন যাবি—সেই দিনই—ওর আর আমি দিন ঠিক করব কি রে পাগলি? নির্ম্মলাকে বলে তোরা একটা দিন ঠিক করে চল্ না—কালই কি পরশু, যেদিন তোদের সুবিধে হয়।"

তাঁহারা আবার খেলায় মন দিলেন। লীলা শূন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে মায়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্লাব-ঘর উজ্জ্বল আলোক-মালায় শোভিত—ঘরে ঘরে বিলিয়ার্ড খেলা, তাস খেলা চলিতেছে। বারাণ্ডায় স্থানে স্থানে তরুণীর দল তাহাদের ভক্ত উপাসক-বৃন্দে বেষ্টিত হইয়া আলাপে মগ্ন—মাঝে মাঝে তাহাদের সুমিষ্ট হাসির ধ্বনি ও গল্পের মৃদু গুঞ্জন অস্পষ্টভাবে শোনা যাইতেছিল। প্রবীণা গৃহিণীর দল এক স্থানে সমবেত হইয়া পরস্পরের চর্চ্চায় চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন।

মিসেস্ দত্ত পাটনা সহরের একটি গেজেটবিশেষ—সহরে সর্ব্বসাধারণের ঘরের খবর তাঁর নখ-দর্পণে বিরাজ করিত। কে তাহার

ঘরে কি দিয়া ভাত খায়, অমুক বাড়ীর ছেলেটা কত রাত্রে বাড়ী ফেরে, কোন্ বাড়ীর মেয়েদের লজ্জা ও শীলতা সীমা অতিক্রম করিতেছে, কোন্ বাড়ীতে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব নাই, এ-সমস্ত তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারিতেন। একবার কাহাকেও নিরীক্ষণ করিলে তিনি তাহার রীতি-চরিত্র, নাড়ী-নক্ষত্র—সব অবলীলাক্রমে বলিয়া দিতেন। তাঁহার কথার বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রমাণ আনিলেও, তাঁহার রায়ের কখনও পরিবর্ত্তন হইত না। তিনি বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলিতেন, "আমরা হলুম সবজান্তা লোক, আমাদের কাছে চালাকি? হুঁ!" ইহার পর আর কোন কথা চলিত না।

লীলা শুনিল—এ হেন প্রথিতযশা মিসেস্ দত্ত তাহার মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছিলেন, তা তুমি বেশ করেছ, দিদি! এ ক্ষেত্রে বিয়ে ভেঙ্গে না দিয়ে আর উপায় কি? মেয়েটাকে ত আর হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারো না? আর মেয়ে বলে মেয়ে! এমন মেয়ে—এ সহরের কথা ত ছেড়েই দাও—বাংলা দেশে খুঁজলে আর একটি পাবে না—এ আমি বড়-গলায় জোর করে বলতে পারি! কি দুঃখে এমন সোণার প্রতিমা অন্ধের হাতে ধরে দেবে?

মিসেস্ রায় এই সহানুভূতিতে একেবারে গলিয়া গেলেন। বীণা অদূরে একখানা সোফায় বসিয়া বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। মিসেস্ রায় একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই তোমরা পাঁচ জনে বল ত ভাই! এতে কি আমার অন্যায় হয়েছে কিছু? বিশেষ যখন প্রস্তাবটা সে নিজেই করেছে! মেয়ে সকাল থেকে তার ঘর থেকে বেরোল না, কেঁদে কেঁদে খুন! আমার এত ভাবনা হয়েছিল, সে কি আর বোলবো! বিকেলে যখন কাপড় ছেড়ে নেমে এলো, তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাচলুম! যা হোক,

তবু কতকটা সামলেছে দেখে এখানে নিয়ে এসেছি,—পাঁচজনের মধ্যে থাকলে মনটা শীঘ্র ভাল হবে!"

মিসেস্ দত্ত বলিলেন, "বেশ করেছ! খেলা-ধূলো করুক, আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে মিশুক, সব ভুলে যাবে! ও মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা! কত লোকে মাথায় করে নিয়ে যাবে! এই দু'চার দিনের ভিতর কলকাতা থেকে আমার এক বোন-পো আসছে, ছেলে যাকে বলতে হয়! চেহারা কি! অরুণ কোথা লাগে তার কাছে! বাংলা দেশে মস্ত জমিদারী—রাজা উপাধি তাদের, এলে দেখো তখন···"

একজন মহিলা বলিলেন, "আজকাল সরলাকে যে আর দেখতে পাই নে? সে তো এদিকে আসা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে দেখছি? পাটনায় আছে, না চলে গেছে কলকাতায়?"

মিসেস্ রায় বলিলেন, "না, সে এখানেই আছে। সেদিন একটা চিঠি দিয়েছিল,—শরীর ভাল থাকে না, তাই আস্‌তে পারে না, লিখেছে।"

মিসেস্ দত্ত একটু হাসিয়া বলিলেন, "ও-সব বাজে কথা! বাড়ীর পাশে থাকি আমি! আমার কাছে কি আর কোন খবর লুকানো থাকে! যে-সব ব্যাপার চলছে আজকাল···" কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি নীরব হইলেন।

তখন চারদিক হইতে সমস্বরে 'কি হয়েছে'? 'ব্যাপার কি'? ইত্যাদি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। যা হোক্ এতক্ষণে একটা মুখরোচক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে!

মিসেস্ দত্ত তখন জাঁকিয়া বসিয়া একটি বিরাট্ ভূমিকা ফাঁদিলেন, —"ব্যাপার আর কি! স্বামি-স্ত্রীতে বনিবনাও হচ্ছে না! মেয়েরা ত অল্প বয়সে নিজের মন ভাল করে বোঝে না—খালি ওপর-চটক দেখে

ভুলে যায়! যাই বল দিদি! আমি ঐ-সব বিদেশী লোকগুলোকে বিয়ে করার একেবারে বিপক্ষে! ওতে কখনো সুফল হতে ত দেখলুম না। এই সরলা—গোড়ায় বুঝলে না—ঢের বুঝিয়েছিলুম, এখন টের পাচ্ছেন ত?" কথাটা শেষ করিয়া তিনি একবার বিজয়-গর্ব্বে সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন।

—"কিন্তু সরলা ত খুব ভাল মেয়ে? তার সঙ্গে না বন্‌বার কারণ কি?"

—"কারণ আর কি? মারাঠিগুলো যে কাঠখোট্টা গোঁয়ার—ওরা কি কখনো আমাদের সঙ্গে মিলে-মিশে চলতে পারে? যতই লেখাপড়া শিখুক, জাতের স্বধর্ম্ম যাবে কোথা? ও পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, মারাঠি সব সমান! বাঙ্গালীর মধ্যে যে কোমলতা, যে ভদ্রতা আছে, আর কোন জাতে ত সেটি কই দেখলুম না।"

মিসেস্ রায় বলিলেন, "তা সরলা যদি এত কষ্টই পাচ্ছে, তা হলে ওদের মধ্যে ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া ভালো। সদ্ভাবই যদি না থাকে তবে মিছে এ সংসারের অভিনয় করে আরো নিজেদের জীবনে দুঃখ ডেকে আনার দরকার কি?"

—"ছেলেটি আছে যে! ছেলেকে সে ছাড়তে চায় না! আমি ত কত দিন ও কথা বলেছি তাকে! বল্লেই কাঁদে—বলে, ওর জন্যে আমি সব সহ্য করে বেঁচে থাকবো।"

এ-কথায় উপস্থিত মহিলাদের সকলের মনই একটি করুণ সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিসেস্ দত্ত অতঃপর কোন্ প্রসঙ্গ তুলিয়া সভা জমাট রাখিবেন, এই অবসরে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

লীলা বিরক্ত হইয়া হল ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ সেদিন একটু দেরী করিয়া আসিয়াছিল। লীলা বলিল,

"আর একটু হলেই তোমার সঙ্গে আজ আমার বিষম ঝগড়া হয়ে যেত!"

—"অপরাধ" ?—বলিয়া হাসিয়া কিরণ লীলার হাত ধরিল। খোলা বারাণ্ডা দিয়া উন্মুক্ত চাঁদের আলো তাহাদের দুজনের মুখে-চোখে রজতধারা ঢালিতেছিল।

লীলা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নির্ম্মলা আসিয়া তাহাদের নিকটে দাঁড়াইল। বলিল, "এই যে কিরণবাবু! এই এলেন বুঝি? আজ আপনার বড় দেরী হয়েছে! লীলা বিকেল থেকে যা ব্যস্ত হচ্ছিল!" বলিয়া সে অর্থপূর্ণ কটাক্ষে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

কিরণ কিছু না বুঝিয়া সরলভাবে বলিল, "তাই না কি? এত ব্যস্ত হবার কারণটা কি লিলি? দরকার ছিল কিছু?"

নির্ম্মলা নিরীহের মত বলিল, "আপনাদের যে কেমন স্বভাব! দরকার না থাকলে বুঝি আর মানুষ কারুকে খুঁজতে পারে না? যাক্, বসুন আপনারা, আমি বাড়ী যাই! রাত হয়েছে!"

কিরণ বলিল, "কিচ্ছু রাত হয়নি এখনো! তুমিও বসো না—গল্প করা যাক খানিকটা!"

—"নাঃ! আমার আজ কাজ আছে! একটা গান প্র্যাক্‌টিস্ করতে হবে! ঐ যে ভাল—সেই গানটা আপনি জানেন কিরণবাবু? 'হায়! মিলন হলো! যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!'—ঐটে?

কিরণ একটু বিব্রতভাবে মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "ঐটে কেন, আমি ত কোন গানই জানি না, সে তো তুমি জানই!"

নির্ম্মলা কথাটা শেষ করিয়াই মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল,—কিরণের উত্তর শুনিবার জন্য দাঁড়াইল না।

কিরণ কিছুই বুঝিল না, হাসিয়া বলিল, "নিশ্চলাটা আচ্ছা পাগলা দেখছি! কিন্তু সত্যি কেন খুঁজছিলে আমাকে লিলি? কিছু দরকার ছিল?"

—"ছিল না? বিশেষ দরকার! বিকেল থেকে খুঁজে খুঁজে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি,—ওঁর আসবার আর সময়ই হয় না! কি করছিলে এতক্ষণ?"

কিরণ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "তাই রাগ হয়েছে বুঝি? সত্যি লিলি! একটা কাজ ছিল, সেটা সেরে আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে! আমি কি জানি যে, তুমি আমায় খুঁজবে? যাক্, দরকারটা কি তোমার?"

—"সে একটা ভয়ানক বিষয়!"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "যাক গে, ভয়ানক বিষয় পরে শোনা যাবে, আপাততঃ তোমার সঙ্গেও আমার বিশেষ ঝগড়া আছে। তুমি এত ভাল গান গাইতে পার, অথচ আমায় এত দিনের মধ্যে সে-কথা কিছুই বল নি! আমি জানতুম, আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোন কথা গোপন থাকবে না।"

লীলা বলিল, "তোমায় কে বলেছে আমি গান গাইতে পারি?"

—"বলবে আবার কে? আমি নিজে শুনেছি—তুমি আজ সকালে মাঠে গান গাইছিলে। আমায় গান না শোনালে, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না! এতদিন আমায় কিছু বলা হয় নি!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "সে কি আমার দোষ? লণ্ডনে থাকতে আমি গান-বাজনা ভাল করেই শিখেছিলুম। এখানে এসে দেখি, সবাই বীণাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত—আমার বিষয় জানবার বা, আমার গান শোনবার কারু অবসর নেই। আমার কেউ খোঁজ করে নি, আমিও নিজে থেকে কারুকে কিছু বলি নি।"

—"বেশ করেছ! এখন উঠে এস! আজ আর ছাড়ছি না,—একটা গান শোনাতেই হবে!"

—"কিন্তু কিরণ! ওরা সব বড় হাসবে তা হলে!"

—"তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।"

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে পিয়ানোর কাছে বসাইয়া দিল।

[৭]

তরুণীদের মধ্যে একটা অস্ফুট হাসি ও গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিল। "লীলা ত একটা ঘোড়-সওয়ার ছিল, তাই জানতুম। সে আবার গাইয়ে হয়ে উঠলো কবে থেকে?" "কিরণের আবার আদর করে টেনে এনে পিয়ানোর কাছে বসান হচ্ছে? আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়!" "যে বেহায়াগিরি করে তুজনে বেড়ায়, কোন কি লজ্জা-সরম জ্ঞান আছে?" "অঃ, থাম্ না তোরা! একবার লীলার গানের নমুনাটা শোনা যাক!"

লীলার কিন্তু এ-সব দিকে দৃষ্টি ছিল না, সে একমনে একটি সুর বাজাইতেছিল। বহুদিনের অনভ্যস্ত অঙ্গুলির মৃদু আঘাতে সে প্রথমে সব সুরটা অস্ফুট ভাবে আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিল।

মিসেস্ রায় চারিদিকের অস্ফুট পরিহাসে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন। লীলা যে গোঁয়ার,—তাহার ত কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই,—এখনি একটা হাস্যকর কাণ্ড ঘটাইয়া বসে আর কি!

—"লীলা! উঠে এস! তোমার ত এ-সবে হাত তেমন অভ্যস্ত নয়! বাড়ীতে আগে প্র্যাকটিস করো—তবে ত হবে।"

লীলা মায়ের কথায় কাণ দিল না। এতক্ষণে সে সব সুরটি আয়ত্ত করিয়াছিল। পিয়ানোর স্বরের সহিত তাহার উচ্চ মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া সে গান ধরিল। গানটি নোয়েল জন্‌সনের বিখ্যাত গান—"ইফ্ ঢাউ ওয়ার্ট ব্লাইণ্ড!"

কক্ষের অস্ফুট পরিহাস-ধ্বনি অকস্মাৎ থামিয়া গেল। লীলার সতেজ কণ্ঠের মধুর স্বর লহরে লহরে কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। মিসেস্ রায় চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সে গাইতেছিল—

"যদি তুমি দৃষ্টিহীন হতে, হে বন্ধু! আমি আমার দৃষ্টি নষ্ট করে ফেলতুম, পাছে তোমার এই অন্ধত্ব আমাকে তোমার কাছ হতে দূরে রাখে!"

"যদি তুমি মূক হতে, হে বন্ধু! আমি আমার স্বর রুদ্ধ করে ফেলতুম! যাতে আমার এই চির-নীরবতা আমাকে তোমার নিকটে টেনে আনতে পারে!"

এই আত্ম-বিসর্জ্জী প্রেমের করুণ সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া কক্ষময় লুটাইতে লাগিল। শ্রোতা ও শ্রোত্রীর দলে কক্ষ ভরিয়া গেল! যাহারা কক্ষান্তরে ব্রীজ ও বিলিয়ার্ড খেলায় মত্ত ছিল, তাহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত ছুটিয়া আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া একবার গায়িকাকে দেখিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

লীলা ভাবের আবেগে তখন আত্মহারা—তাহার চক্ষু মুদিত—উচ্ছ্বাসের ভরে তাহার দুই নয়নে অশ্রুধারা—সে গানটিতে তাহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া গাহিতেছিল—

"যদি তুমি দীনহীন হতে, হে বন্ধু! আমি আমার সম্মান ও গর্ব্ব

নষ্ট করতাম, যাতে নম্র ও সম্ভ্রমশূন্য হয়ে আমি তোমার কাছে বাস করতে পেতাম!"

"যদি তুমি প্রাচীন হতে, হে বন্ধু! আমি আমার যৌবন নষ্ট করে ফেলতাম, যাতে তোমার প্রৌঢ়ত্ব আমাকে তোমার নিকট হতে দূরে না রাখে!"

"যদি তোমার মৃত্যু হত, হে বন্ধু! আমি আমার জীবন ত্যাগ করতাম—কেবল সেই আশায়, যাতে মরণের পরে আমি তোমার সঙ্গ লাভ করতে পারি!"

দুই বার—তিন বার আবৃত্তির পর যখন গানের শেষ কলি মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনির মত মিলাইয়া আসিল, তখন প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পরে চারিদিক হইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার একটা বিষম হট্টগোল একযোগে উঠিয়া বিচিত্র কোলাহল সৃষ্টি করিল।

কক্ষের শেষ প্রান্তে বীণা তাহার এক সিভিলিয়ান বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছিল। সকলে যখন একযোগে লীলার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে—সেই সময় সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তখন, আর একটা তুমুল কোলাহল বাধিয়া উঠিল। মিসেস্ রায় মিঃ দত্তের সাহায্যে বীণাকে সোফার উপর শোয়াইলেন। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহারা লীলার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা বীণার প্রতি সহানুভূতির আধিক্যে একবাক্যে লীলার নিন্দা আরম্ভ করিল।

—"লীলা কি নিষ্ঠুর—হার্টলেস্! জানে যে বোনটার মনের এই শোচনীয় অবস্থা! এই সময় কি ওই গান গাওয়া ওর উচিত?"

—"কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—আর কি!"

—"জানিই তো!—ও মেয়ে চিরদিন গোঁয়ার! ওর কি দয়া মায়া বলে আছে কিছু? ওর উচিত ছিল—যুদ্ধে যাওয়া!"

—"ঠিক বলেছ দিদি! মেয়ে তো নয়! যেন তুরুক্ সওয়ার! দিন রাত মাঠে মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছেন!"

লীলা কিন্তু এ-সব নিন্দা বা প্রশংসায় কাণ না দিয়া ছুটিয়া ছাতের উপর পলাইল। উচ্ছ্বসিত আবেগে তখন তাহার বুকের ভিতর ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে নীচের গোলমাল একটু থামিলে, কিরণ আসিয়া তাহার পাশে বসিল। "লিলি?"

লীলা মুখ তুলিয়া চাহিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন, একটা সূক্ষ্ম কালো আবরণে চতুর্দ্দিকের সৌধমালা আবৃত হইয়া আসিতেছিল। আমগাছের ঘন পাতার অন্তরাল হইতে ইতস্ততঃ গবাক্ষ-নিঃসৃত আলোর রেখা মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল, এবং ছায়ান্ধকার ম্লান আকাশের নীচে শ্রেণীবদ্ধ তালগাছের সারি চিত্রাঙ্কিত ফলকের ন্যায় নিঃশব্দে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

—"আজ তুমি কি সুন্দর গান গেয়েছ লীলা! আমার কাণে যেন সেই সুর এখনো বাজছে!"

—"যাও, ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি? ওই জন্যেই ত আমি কারু কাছে গান গাইতে চাই না!"

—"এটা কি ঠাট্টার কথা হলো? যাক্—এ বিষয়ে পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে! তোমরাও দেখছি অরুণের খবরটা শুনেছ! আমি সমস্ত সন্ধ্যাটা ভাবছিলুম যে, সে তোমাদের জানিয়েছে কি না? অবশ্য জিজ্ঞাসা করাটা ভদ্রোচিত নয় বলে কিছু বলি নি।"

—"তোমার প্রীতিকর হয় তো আরো একটা খবর তোমাকে

দিতে পারি। অরুণের চিঠি পেয়ে বীণা তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে। কত বোঝালুম তাকে, কোন ফল হলো না।"

—"তুমি যদি বীণা হতে, তা হলে অরুণ অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে না কি?" সন্ধ্যার অস্পষ্ট তারার আলোয় কিরণ সাগ্রহে লীলার মুখের দিকে চাহিল।

—"তাতে আর কোন সন্দেহ আছে? তার এই অসহায় অবস্থা—যখন তার জীবনে আরো বেশী ভালবাসা, ঢের বেশী আদর-যত্নের দরকার—সে সময় তাকে ফেলে দিতে পারি আমি! তা হলে আর কোন্ অবলম্বন নিয়ে সে বাঁচবে?"

কিরণ নীরবে কিছুক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল। পরে বলিল, "তুমি তখন বীণার কথা বলবার আগে—'যদি তোমার প্রীতিকর হয়' এ-কথাটা বল্লে যে?"

লীলা হাসিয়া বলিল,—"অর্থাৎ অরুণ সরে গেলে বীণার সম্বন্ধে তোমাদের একটা সুযোগ আসে, তাই বলছিলুম।—"

কিরণও হাসিল। সে হাসি উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের। সে বলিল, "আমি আপাততঃ সে-জন্যে বিশেষ ব্যস্ত নই, তুমিও তা জানো। কিন্তু তা হলে তুমি বলতে চাও—যাকে তুমি ভালবাস, তার যা-কিছু অবস্থান্তর হোক না কেন, তবু তুমি তাকে বিয়ে করবে?"

—"আমি ত ভাবতেই পারি না যে, কেউ এর অন্যথা করতে পারে!"

—"কিন্তু এটা বড় উঁচুদরের স্বার্থত্যাগ—সারা জীবন-ভোর এ রকম স্বার্থত্যাগ করা কি মুখের কথা?"

—"যদি সত্য ভালবাসা থাকে, তা হলে কিছু মাত্র কষ্টকর নয়—আমার ত এই ধারণা। আমার ত এখনো আশা আছে, বীণা এক

দিন তার ভুল বুঝবে, আর অরুণকে আবার ফিরিয়ে নেবে। সেই জন্যেই ত ও গানটা গেয়েছিলুম আমি!"

—"তুমি বড় ছেলেমানুষ—লীলা! তুমি কি ভাব—গানটায় যে যে কথা আছে, মানুষের বাস্তব জীবনে কখনো তা সম্ভব হয়?"

লীলা তাহার গভীর ভাবে ও বিশ্বাসে ভরা প্রশান্ত দৃষ্টি কিরণের মুখের উপর তুলিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। বলিল, "কেন হবে না? তোমার বিশ্বাস হয় না?"

—"কি জানি! তবে যদি সত্য হয়, তবে জীবনটা বড় সুখের হয়!" সে অন্যমনস্কভাবে গানের চতুর্থ কলি গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিতে লাগিল—

"যদি তুমি প্রাচীন হতে—হে বন্ধু! আমি আমার যৌবন ত্যাগ করতাম—যাতে তোমার বয়সের আধিক্য আমায় তোমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে!"

বহুক্ষণ পরে কিরণ ডাকিল, "লিলি! একবার আমার মুখের দিক চাও!"

লীলা তাহার কালো চোখের সরল দৃষ্টি কিরণের মুখে তুলিয়া ধরিল।

—"আমার বয়স কত হবে বলে তোমার মনে হয়?"

লীলা একটু ভাবিয়া বলিল, "এই তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ হবে।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "চমৎকার আন্দাজ! আমার বয়স বত্রিশ বৎসর! তোমার চেয়ে আমি অনেক বড় নয় কি লীলা?"

"তাতে আর হয়েছে কি?"

—"না—হয় নি কিছু। আমি ভাবছিলুম, আমি একটি কুড়ি

বছর বয়সের মেয়েকে জানি,—সে আমার এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও আমায় তার সঙ্গীরূপে নিতে পারে কি না ?"

লীলা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমার কথা বোলছো বুঝি ? তুমি কি জান না, যে, তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু ?"

কিরণ কিছুক্ষণ মুগ্ধ-নেত্রে লীলার প্রফুল্ল সরল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যে দিক হইতে কথাটা বলিয়াছে, লীলা যে তাহা ধরিতে পারে নাই, তাহা সে বুঝিল, কিন্তু আর পীড়াপীড়ি না করিয়া সেও সরল ভাবেই বলিল, "আমি তা জানি। তুমি আমায় চিরদিন এই ভাবেই গ্রহণ করো, তাই আমার একান্ত প্রার্থনা !"

কিছুক্ষণ প'র লীলা বলিল, "কিরণ ! আমি একবার অরুণের সঙ্গে দেখা করতে চাই ! সেই কথার জন্যেই তোমাকে সন্ধ্যা থেকে খুঁজছিলুম ! তার সঙ্গে আলাপ করবার আমার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিল—এখন এই ঘটনার পর আরো বেশি তাকে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার বাড়ীতে গিয়ে কি আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি না ?"

কিরণ একটু ভাবিয়া বলিল, "যেতে পারবে না কেন ? তবে আমার মনে হয়, তোমার না যাওয়াই ভালো। মিসেস্ র'য় শুনলে কি বলবেন ? তুমি ত জান, আমার বাড়ীতে মেয়েরা কেউ নেই।"

"তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। ও-সব আমি গ্রাহ্য করি না কিছু। তবে মায়ের কানে কথাটা উঠলে একটা গণ্ডগোল হবে বটে, তা সে জন্যে আর কি করি বল ? মার তো সব কথা নিয়েই গোলমাল করা একটা স্বভাব,—সে ভেবে কাজ করতে গেলে আমার চলে না।"

কিরণ বলিল, "তা ছাড়া আমার চাকরেরা এ-কথা নিয়ে কাণাকাণি করতে পারে। তাই থেকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে একটা

কুৎসার সৃষ্টি হবে। লোকজনদের মুখে মুখেই সত্য-মিথ্যা জড়ান যত আজগুবী খবর বাইরে ছড়ায়, জানো ত?"

লীলা রাগিয়া বলিল, "খুব জানি! আর সেই জন্য চাকরদের ভয় করে চলতে হবে আমাকে, এই ত বলতে চাও তুমি? তুমি পাড়ার সব বুড়ো গিন্নিদের মত কথা বলতে শিখেছ, দেখছি! আমি ও-সব কথা শুনতে চাই না। শুধু তোমার বাড়ী আমি যেতে পারি কি না, তাই বল!"

"কি পাগলামি তোমার লিলি!" কিরণ লীলার রাগ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার বাড়ীতে তুমি যাবে তার মধ্যে আবার জিজ্ঞাসা করবার কি আছে? নিশ্চয়ই যেতে পার! আমি শুধু কথাটা তোমায় একটু ভেবে দেখতে বলেছিলুম,—এ নিয়ে তোমার নামে একটা বিশ্রী চর্চ্চা হতে পারে, তাই। জানো ত, তোমার সম্বন্ধে অপ্রিয় কোন কথা শোনা আমার পক্ষে কি রকম কষ্টকর?"

—"তুমি নিশ্চিন্ত থাক! লোকে কি বলবে না বলবে সে-সব আমি গ্রাহ্য করি না। যাবো বলেছি যখন, তখন নিশ্চয়ই যাবো; কোন বাধা মানবো না। তবে তুমি তাকে এখন আমার সম্বন্ধে কোন কথা বোলো না। আমাদের প্রথম আলাপটা আমি একলাই করতে চাই। যে সময় তুমি বাড়ী থাকবে না, আমি সেই সময় যাব।"

—"বেশ। তা হলে সকালেই যেও। আমি চা খেয়ে বাইরে যাই, বারোটার আগে কোন দিন ফিরি না। তখন গেলে তাকে একলাই পাবে তুমি! এইবার সন্তুষ্ট হয়েছ ত? না, আর কিছু আব্‌দার আছে?" কিরণ হাসিয়া লীলার দিকে চাহিল।

লীলাও হাসিয়া বলিল, "না—উপস্থিত আর কিছু ত মনে আসছে না। তুমি না হলে আমার এক দণ্ড চলবার যো নেই। এই ত

সমস্ত দিন কি করে তার সঙ্গে দেখা হবে ... কোরবো—সমস্ত দিন ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছিলুম। তুমি আমার ... এক কথায় সব ঠিক হয়ে গেল। আচ্ছা কিরণ! তার সম্বন্ধে ... কথা জানবার আমার বড় আগ্রহ হচ্ছে। সে তোমার ওখানে এসে পর্য্যন্ত কি করছে, কি কথাবার্ত্তা বলছে, বল না!"

লীলার এই সাগ্রহ প্রশ্নে কিরণ গম্ভীর হইয়া বলিল, "এখন আর তার সম্বন্ধে বলবার মত কিছুই নেই লীলা! কাল থেকে আজ বিকেল পর্য্যন্ত সে দুটো চারটে নিতান্ত সাধারণ কথা ছাড়া আর বেশী কিছু বলে নি। যারা তাকে আগে দেখেছে, শুধু তারাই বুঝবে যে, তার পক্ষে এ ভাবটা কত অস্বাভাবিক। তার সমস্ত অন্তরটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এর চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হলেও ভাল ছিল। মনে কর, তার সারা জীবনটা এমনি জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাতে হবে এ-কথা যখন সে ভাবে, তার মনটা তখন কি রকম হয়? সমস্ত আশা-ভরসা নষ্ট হয়ে, জীবনের সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ থেকে বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকা—এ যে কি দুঃখ, তা যার হয়েছে—সেই শুধু জানে।"

লীলা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি সেটা নিজের মন দিয়ে খুব ভাল করেই বোধ করছি, কিরণ! তাই আর-সকলের মত কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পাচ্ছি না। খালি মনে হচ্ছে, তার জন্য কি করতে পারি আমি? তুমি ত কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাক, সব সময় তার কাছে থাকতে পার না,—আমি যদি মাঝে মাঝে গিয়ে কথায়-বার্ত্তায়-গল্পে তাকে কতকটা আনন্দ দিতে পারি, সেই জন্যেই তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছি। এ ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি আমি? কিন্তু এখন রাত হয়েছে, এসো এবার নীচে যাওয়া যাক্।"

পাটনা সহর হইতে অনেক দূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া অসিত পূর্ব্বাকাশে নবীন সূর্য্যের উদয়ের শোভা দেখিতেছিল। দুই দিকে সুদূর-বিস্তৃত আম্রবাগান, মধ্যে অপ্রশস্ত রাজপথ। বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। মাঝে মাঝে দুই একখানা ভগ্ন অযত্নপতিত বাসগৃহ জীর্ণ অবস্থায় কোনমতে দাঁড়াইয়া সুদূর অতীতে এ স্থানে মানুষের বসতির সাক্ষ্য দিতেছিল। উষার মৃদুরঞ্জিত অরুণ আলোর রেখা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট আঁধার অরণ্যানীর মাথায় মাথায় জাগিয়া উঠিতেছিল। সদ্য-জাগ্রত বিহগকুলের আনন্দ-কলরবে চারিদিক তখন মুখরিত।

অসিতের বয়স ২৬।২৭, দীর্ঘ সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠব, মুখশ্রী গম্ভীর, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—সহসা তাহাকে দেখিলেই দর্শকের মনে একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয়।

অসিত অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর ফিরিয়া আসিল। ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া সে একখানা বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সময় নিঃশব্দে আর একটি যুবক তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়াই অসিতের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ব্যগ্রভাবে বলিল, "এই যে পরেশ! এত দেরি হলো তোমার? কাল থেকে তোমার অপেক্ষায় আমি এই জঙ্গলে বসে আছি। তার পর, খবর কি সব? ওদিককার কাজ সব ঠিক হয়ে গেল?"

পরেশ ঝুপ করিয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ শুষ্ক, দেহ ঘর্ম্মাক্ত। অত্যন্ত শ্রান্তভাবে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছিল।

অসিতের প্রশ্নের প্রতি সে কোন মনোযোগ না দিয়া বলিল," এ কাপ্ চা আগে চট্ করে এগিয়ে দাও ত দাদা! তার পরে সব কথা-বার্ হবে'খন! উঃ! সারা রাত্তির ধরে ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গলের ভিত দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে! দম্ বেরিয়ে গেছে একেবারে!"

অসিত আর কিছু না বলিয়া চায়ের কেটলিতে চা ভিজাইতে দিল। তার পর ষ্টোভে দুধ চড়াইয়া কুলুঙ্গী হইতে একটা বিস্কুটের টিন পাড়িয়া আনিয়া পরেশের সামনে রাখিল।

"বাঃ! এ যে একবারে রাজভোগ! এ জঙ্গলের মধ্যে এটা কোথায় পেলে?" লুব্ধ দৃষ্টিতে পরেশ টিনটার দিকে চাহিল।

"কাল এখানে আসবার সময় সহর থেকে নিয়ে এসেছিলুম। আর কিছু হোক্ বা নাই হোক, চায়ের জোগাড়টা ত ভাল করে রাখতে হবে?" অসিত এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া পরেশকে আগাইয়া দিল। তার পর নিজের পেয়ালার চা ঢালিয়া লইয়া বলিল, "এইবার বল দেখি তোমার খবরটা কি? কাল এলে না যে? কোথায় ছিলে?"

পরেশ চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত চক্ষু মুদিয়া বলিল, "হচ্ছে! হচ্ছে! ক্রমশ সব রহস্যই প্রকাশ করা যাবে। একটু জুত করে চা'টা এখন খেতে দাও বাবা! সারা রাত্তিরের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর এ জিনিসটা যে কি 'অমৃতোপম' লাগছে, তা তোমার মত কাঠগোঁয়ার বুঝবে কোথা থেকে? সত্যি! আমার মনে হচ্ছে, চায়ের উপরে আমি একটা কবিতা লিখে ফেলি!"

অসিত একটু হাসিয়া বলিল, "সাধু সংকল্প! তবে সেটা একটু শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ করে ফেলো,—নয় ত ভাব জুড়িয়ে যেতে পারে! কিন্তু তুমি রাত-ভোর বন-বাদাড় ভেঙ্গে আসতে গেলে কেন? কেউ কিছু সন্দেহ করেছে না কি?"

"শুধু সন্দেহ? একেবারে পিছু পিছু ধাওয়া! কাল বিকেলে ষ্টেশন থেকে যেমন বেরিয়েছি, তখন থেকেই মনে হ'ল, একটা লোক আমার উপর লক্ষ্য রাখছে। ভাল করে সেটা জানবার জন্যে আমি হন্ হন্ করে এগিয়ে খানিকটা দূর চলে গেলুম। অনেকক্ষণ পরে পিছনে চেয়ে দেখি, অন্য ফুটপাত ধরে সেও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। একটা গলির ভিতর ঢুকে তখন একটা দোকানে ঢুকে পড়লুম। ঘণ্টা খানেক সেখানে বসে বসে কাটিয়ে দিয়ে, প্রায় সন্ধ্যার সময় উঠে গলি থেকে বেরিয়ে দেখি, সে লোকটা একটা আলোর পোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। তার হাত এড়াবার উপায় ভাবতে ভাবতে কতক দূরে এসে দেখি, একটা জায়গায় খুব সোরগোল হচ্ছে,—একটা ছোকরা মেয়েদের মত সাজগোজ করে মিহি সুরে গান ধরে ঘুরে ঘুরে নাচছে, আর দুজন লোক তার গানের সঙ্গে মাথা নেড়ে, নানা অঙ্গভঙ্গী করে, হেলে দুলে সারেঙ্গী আর তবলা বাজাচ্ছে। রাস্তার লোকে হাঁ করে সেই অদ্ভুত তামাসা দেখছে। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। তার পর সময় বুঝে অন্ধকারের মধ্যে এক দিক থেকে বেরিয়ে গিয়ে চলতে লাগলুম। রাত্রে এক চাষীর দাওয়ায় আশ্রয় নিয়ে ঘণ্টা দুই তিন কাটিয়েছি। তার পর রাত থাকতে উঠে এই ক্ষেত-খামার, বাগান-টাগানের ভিতর দিয়ে চলে আসছি। সোজা পথে গেলুম না,—কে আবার কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে, কাজ কি?"

অসিত বলিল, "সে ভালই করেছ। এখানে যে ক'দিন থাকতে হবে তত দিন এ আস্তানার সন্ধান কেউ না পেলেই ভালো। তার পর, ওদিকে সব কি হলো?"

পরেশ তার চায়ের খেয়ালা আগাইয়া দিয়া বলিল, "সে সব ভেস্তে গেছে। কিন্তু তুমি এখন আর এক কাপ দাও অসিত-দা—এক

বাড়িতে হলো না কিছু।" তার পর সে দুইখানা বিস্কুট [illegible] পুরিয়া দিয়া বলিল, "খবর অনেক আছে। তোমার কাছে সব কথা বলবার জন্যেই ত তারা আমায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরিয়ে দিলে। কিন্তু ওদিককার যা কিছু এত দিনের কাজ, যা কিছু আয়োজন, সব পণ্ড হয়ে গেল,—এইটেই বড় আপশোষের কথা!"

অসিত চা ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরেশও তাহার ভাব দেখিয়া, আর কিছু না বলিয়া, নীরবে চা খাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে অসিত বলিল, "যাক্, দু' এক দিনে বা সামান্য চেষ্টায় কোন মহৎ কাজ হয় না। বারবার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই আমরা সফল হব। এতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। এখন বল, তারা কি বলতে তোমায় পাঠিয়েছে।"

তাহারা দুই জনে নিম্নস্বরে কথা বলিতে লাগিল ও ক্রমশঃ সেই আলাপের মধ্যে এমন মগ্ন হইয়া গেল যে, আর কোন-কিছু মনে রহিল না। বেলা বাড়িয়া চলিল, তাহাদের সম্মুখে অভুক্ত খাদ্য পড়িয়া রহিল, চা জুড়াইয়া জল হইয়া গেল,—তাহারা তাহা জানিতেও পারিল না।

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে ও নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদে সেই নির্জ্জন স্থান মুখর হইয়া উঠিল। অসিত ও পরেশ চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহারা দুইজনেই বারাণ্ডায় গিয়া দেখিল, একখানা প্রকাণ্ড মোটরের টায়ার ফাটিয়া, সেখানা রাস্তার ধারের একটা গাছে ধাক্কা লাগিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়াছে; এবং একটি যুবক ভিতরের আরোহীদের বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পরেশ একবার অসিতের মুখের দিকে চাহিল। অসিত বলিল, "চল, এখানেই তুলে আনতে হবে।"

দুইজনে চক্রের নিমেষে ছুটিয়া নামিয়া গেল। যুবকের সাহায্যে তাহারা গাড়ীর ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও একটি মহিলাকে নামাইয়া পথের উপর দাঁড় করাইল।

মহিলাটির হাত কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। বৃদ্ধ সে দিকে চাহিয়াই ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! নির্ম্মলার হাতে বড় চোট লেগেছে কিরণ! ভয়ানক রক্ত পড়ছে যে! কি করা যায়?"

কিরণ তখন একটু আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে দেখিতেছিল। অসিতকে দেখিয়া বলিল, "মশায়! এখানে কাছাকাছি কোথাও বসবার মত জায়গা আছে কি?"

অসিত তাহাদের ভাঙ্গা বাড়ীখানা দেখাইয়া দিয়া বলিল, "সামনে এইটে ছাড়া আর কোথাও স্থান নেই। ওটাকে যদিও ঠিক বাড়ী বলা যায় না, তবু—"

"যথেষ্ট! যথেষ্ট! এঁকে একটু বসাবার মত জায়গা পেলেই বাঁচা যায়। এস নির্ম্মলা!" বলিয়া কিরণ নির্ম্মলার হাত ধরিল।

অসিত সকলকে লইয়া উপরে আসিল। পরেশ মিঃ ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনার কোথাও লাগে নি ত?"

"আমার? নাঃ, আমার বিশেষ কিছু হয় নি। কিন্তু নির্ম্মলা—ওঃ! ওর বড় কষ্ট হচ্ছে! এখানে কোন ডাক্তার কাছাকাছির মধ্যে পাওয়া যাবে কি?"

অসিত একবার নির্ম্মলার বিবর্ণ যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বলিল, "এখানে চার-পাঁচ কোশের ভিতর ডাক্তার অষুধ কিছুই পাওয়া যাইবে না। বলেন ত আমি ওঁর হাতের রক্তটা ধুয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ করে দিতে পারি,—তাতে কতকটা আরাম পেতে পারেন।"

কিরণ বলিল, "উপস্থিত তাহলে ওঁর হাতটা আপনি ব্যাণ্ডেজ করেই দিন,—আমি একটু এগিয়ে একখানা গাড়ী বা ট্যাক্সির সন্ধান করি গে। সহজে না পৌঁছিতে পারলে ত কোন ব্যবস্থাই করতে পারা যাবে না!"

"তাই যাও, তাহলে যেমন করে হোক এখন বাড়ী পৌঁছতেই হবে।" মিঃ ঘোষ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইতেই অসিত বলিল, "আপনি উঠছেন কেন? গাড়ী আনাবার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি,—আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন। যে-স্থানে এসে পড়েছেন, এখানে আপনাদের সাহায্যের জন্যে আর কিছুই করা যায় না। পরেশ, দেখ ত উঠে একবার,—গাড়ী বা ট্যাক্সি যা সামনে পাবে, একখানা এঁদের জন্যে নিয়ে এস।"

পরেশ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। অসিত দড়ির উপর হইতে একখানা পরিষ্কার চাদর লম্বালম্বি ভাবে ছিঁড়িয়া ব্যাণ্ডেজের মত পাকাইয়া লইল—পরে পরিষ্কার জলে নির্ম্মলার আহত স্থান ধুইয়া দিয়া ক্ষিপ্র নিপুণ হস্তে হাতটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল।

এই অপরিচিত যুবকের করস্পর্শে নির্ম্মলার ক্লিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। হাত বাঁধা হইবার পর সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল—ও তাহার স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি অসিতের মুখের দিকে তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হাতটা এখন অনেক ভাল মনে হচ্ছে। এতক্ষণ হাতের ভিতর যা কন্‌কন্‌ করছিল।"

অসিত মুখে কিছু না বলিলেও, তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কিরণ সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, "মশায় কি মেডিকেল কলেজের ষ্টুডেণ্ট? না, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কোন সেবক?"

অসিত সহসা তাহার সম্বন্ধে এই কৌতুকপ্রদ প্রশ্নে হাসিয়া বলিল, "কেন বলুন ত? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ ধারণা হলো যে?"

"আপনি যে রকম সুন্দর ব্যাণ্ডেজ করে ফেল্লেন, তাই দেখে আমার মনে হচ্ছে, এ ত অজ্ঞ লোকের হাতের কাজ নয়,—পাকা হাত না হলে এ রকম দক্ষতা দেখা যায় না—তাই আমার অনুমান..."

অসিত বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির প্রশংসা করলেও, আপনার অনুমান এ ক্ষেত্রে একেবারেই ভুল,—আমি ও দুটি পর্য্যায়ের কোনটির মধ্যেই নয়। তবে এ-সব কাজ আমাদের কতকটা শিখতে হয়েছে বটে,—কত সময় কত দরকারে লাগে।"

কিরণ এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া গৃহের সজ্জা দেখিতেছিল। এক ধারে দড়ির উপর খান-দুই পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের একটি কোণে ষ্টোভ, তার অন্য পাশে চায়ের সরঞ্জাম ছড়ানো; সকালের অভুক্ত চা ও বিস্কুট তখনো সেখানে পড়িয়াছিল। একটা তুলুঙ্গীর উপর একটা ছোট অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি ও একখানা থালা ও খানকতক বই তোলা ছিল। গৃহের মধ্যে একমাত্র শয্যা—একখানা মাদুর, তার উপর মিঃ ঘোষ ও নির্ম্মলা বসিয়াছিলেন।

সে বলিল, "তবেই হলো। আমার অনুমান একেবারে ভুল বলতে পারেন না আপনি। আমি বলেছি—শিক্ষিত হাত ছাড়া এমন কাজ হয় না,—এবং সাধারণতঃ যে শ্রেণীর লোকে এ-সব শিক্ষা করে থাকেন, তাঁদের কথাই মনে হয়েছিল। আপনি সে-শ্রেণীর যদি না-ও হন, তবু-এ সব শিক্ষা করতে হয়েছে ত?"

"তা অবশ্য বলতে পারেন" বলিয়া অসিত একান্ত করুণার্দ্র নে মাদুরের উপর শায়িত নির্ম্মলার ক্লান্ত-করুণ মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

নির্ম্মলা অবসন্ন শরীরে মাটিতে মাদুরের উপর এলাইয়া পড়িয়াছি তার চক্ষু মুদ্রিত, গাঢ় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ নিটোল শুভ্র সুপুষ্ট কপোলে উপর লুটাইতেছিল। মিঃ ঘোষ উদ্বিগ্ন চিত্তে গাড়ীর আশায় কন্য মাথার কাছে নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া ছিলেন।

কিরণ বলিল, "আর একটা কথা,—আমরা না হয় এখানে এব দৈব দুর্ঘটনায় এসে পড়েছি,—কিন্তু আপনারা দুজনে এখানে কে হতে এসে পড়েছেন? এটা ত মানুষের বসতি স্থান বলে মনে হ না! দু'চার ক্রোশের মধ্যে ত জন-মানবের কোন চিহ্ন নেই দেখছি

অসিত বলিল, "তা নেই সত্যি! তবে আমরা এখানে মা মাঝে এসে থাকি। এটা আমাদের একটা ছোট-খাটো আস্তানা।"

"এখানে থাকেন? সত্যি নাকি?" কিরণ এবার সবিস্ম অসিতের মুখের দিকে চাহিল। সে মনে মনে একটা কিছু ভাবিতে বুঝিয়া অসিত হাসিয়া বলিল, "এবারও আমার সম্বন্ধে একটা কি অনুমান করছেন না কি?"

কিরণ এবার গম্ভীর ভাবে বলিল, "এ-ক্ষেত্রে অনুমানটা ঠি প্রয়োগ করতে পারছি না। কারণ, স্থানটি এমন কিছু লোভনীয় ন যার জন্যে স্বেচ্ছায় মানুষ এখানে এসে বাস করতে পারে। তবে এ যদি কেউ যোগ-সাধনা করতে চায়—"

অসিত বাধা দিয়া সপরিহাসে বলিল, "ঠিক ধরেছেন এবার জানেন ত, নির্জ্জনে না হলে যোগ-সাধনা হয় না!"

কিরণ উঠিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল, "এগুলো তবে যোগে বই বুঝি?" সে একখানা বই খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তার ব

গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে দুই এক পাতা পড়িয়া সেখানা রাখিয়া অন্য বইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তার পর একবার অসিতের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া অসিতও আর কোন কথা বলিল না। কিছুক্ষণ পরে কিরণ মিঃ ঘোষকে বলিল, "আপনারা বসুন, আমি একবার আমাদের গাড়ীখানার অবস্থা কি রকম—ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে আসি। ওটা আবার নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ত?"

মিঃ ঘোষ এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। কিরণ চলিয়া গেলে তিনি অসিতকে বলিলেন, "সত্যই কি আপনারা এই জঙ্গলের ভিতর থাকেন? আমি আরো কয়েকবার এই পথে যাতায়াত করেছি। এ ভাঙ্গা বাড়ীটার প্রতি অবশ্য কোন দিন লক্ষ্য করি নি। কিন্তু এদিকে কখনো কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে ত মনে হচ্ছে না।"

অসিত বলিল, "আমরা ত সর্ব্বদা এখানে থাকি না, কখন কখন আসি, হয় ত দু এক দিন থাকি, আবার চলে যাই। যে সময়টায় থাকি—তাও প্রায় বাড়ীর ভিতরেই পড়া-শুনা নিয়ে থাকি, পথে বেরোবার কোন দরকারই হয় না। তাতেই আমাদের সঙ্গে কারো দেখা হওয়া সম্ভব নয়।"

নির্ম্মলা এসব কথা শুনিয়া, এতক্ষণ সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া গৃহের অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিতেছিল। সে বলিল, "এই রকম জায়গায়—এত নির্জ্জনে একলা থাকতে আপনাদের কোন কষ্ট হয় না? কি করে থাকেন? খাওয়া দাওয়ারই বা কি ব্যবস্থা করেন?"

অসিত হাসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "কষ্ট কিসের বলুন? আমরা জীবন থেকে সব রকম বাহুল্য বর্জ্জন করে চলতে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই আর কোন কষ্টই আমাদের কষ্ট বলে মনে

হয় না। অভাব, দুঃখ, কষ্ট এ-সব অনেকটা আমরা নিজেরা তৈরি করেছি—তারি ফলে কষ্ট পাই। যথার্থ অভাব আমাদের খুবই কম।"

মিঃ ঘোষ এ-কথা শুনিয়া সহসা অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই ত যথার্থ জ্ঞানীর মত কথা! উনি ঠিক কথাই বলেছেন নির্ম্মলা! আমাদের চার পাশের যত কিছু দুঃখ, কষ্ট, অভাব—সবই আমরা নিজেরা গড়ে তুলেছি। সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করলে—যেমন সব আগেকার কালে জ্ঞানী লোকেরা থাকতেন, সে-ভাবে থাকলে,—অভাব যে কত অল্প, তা এখনকার লোকে ধারণাও করতে পারে না!"

নির্ম্মলা নিজেও এ-বিষয়ে কিছুই ধারণা করিতে পারে নাই। তাহার মনে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকমালা-সজ্জিত, মূল্যবান গৃহসজ্জায় শোভিত, সুখময় রম্য গৃহের চিত্র ভাসিয়া উঠিল। বন্ধু-বান্ধবের প্রীতি-প্রফুল্ল সম্ভাষণ, সেবাতৎপর সুদক্ষ দাস-দাসী-পূর্ণ, নিশ্চিন্ত আরামে পূর্ণ গৃহ ছাড়িয়া—এই গভীর জনমানবশূন্য জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙ্গা ঘরে মাটির উপর একা পড়িয়া থাকা কেমন করিয়া সুখকর হইতে পারে, সে তাহা বুঝিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া অসিত নিজেই আবার বলিল, "আর খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন? তা আর এমন শক্ত কি! ঐ হাঁড়িটায় কয়েক মুটো চাল, গোটাকতক আলু দিয়ে সিদ্ধ করে, বা চাল আর ডাল এক সঙ্গে সিদ্ধ করে নিতে পারলেই খাওয়ার প্রয়োজন মিটে যায়। ষ্টোভে হাঁড়িটা চড়িয়ে দিয়ে সামনে বসে বই পড়তে পড়তে সে কাজ আধঘণ্টার মধ্যে হয়ে যায়। শোবার জন্যে এই মাদুরই আমাদের যথেষ্ট। তবে আর কষ্ট কি?"

অসিত হাসিয়া এ-কথা বলিলেও, নির্ম্মলা মনের ভিতর শান্তি পাইল না। তাহার ভিতরকার সেবাপরায়ণ নারীপ্রকৃতি অসিতদের এ অবস্থায় থাকা সুখকর বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না। কিন্তু এই অত্যল্প কালের পরিচয়ে আর কিছু বলা যায় না; কাজেই সে চুপ করিয়া গেল।

অসিত তাহার মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিল। এই নীরব সহানুভূতিতে তাহার স্বভাবতঃ সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন কঠোর চিত্তও কেন যে একটা মধুর আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল, সে তাহা নিজেই বুঝিল না। সে কতকটা আত্মবিস্মৃত ভাবে বলিল, "তবে আপনার আজ অত্যন্ত কষ্ট হলো! আপনাদের ত এ রকম ভাবে থাকা অভ্যাস নেই কখনো! এই অসুস্থ শরীরে একটু শান্তি পেলেন না।"

নির্ম্মলা এ কথায় হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "না! না! সে জন্যে আপনি ভাববেন না কিছু! আমার এমন বিশেষ কিছু কষ্ট হয়নি।"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "আপনাদের সঙ্গে একটা দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পড়ে পরিচয় হয়ে গেল। এই সঙ্কটের সময় যেমন আপনাদের কাছে উপকার পেয়েছি, তেমনি এই পরিচয় হওয়ায় অত্যন্ত সুখী হলুম। আশা করি, আমাদের এ বন্ধুত্বের এখানেই শেষ হবে না। মধ্যে মধ্যে আপনাদের সাক্ষাৎ পেলে আমরা সকলেই বড় সুখী হবো।"

অসিত এ-কথার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রহিল। মিঃ ঘোষ সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখান থেকে আর খানিক দূরে আমি একটা বাগানবাড়ী কিনেছি। নির্ম্মলার বন্ধু-বান্ধবেরা সেখানে এক দিন সবাই পিকনিক করবে বলে ধরেছে। বাড়ীটা এখনো ভাল করে গোছান হয়নি। তাই আমরা আজ সকালে

কতকটা গুছিয়ে নেবার জন্যে যাচ্ছিলুম। তা এখন ত কিছুদিনের মত সে-সব বন্ধ হয়ে গেল,—নির্ম্মলা ভাল হোক আগে! তারপর আবার সব ব্যবস্থা করা যাবে। ভাল কথা, আপনারা যখন এখানে না থাকেন, তখন আর কোথায় আপনাদের পাওয়া যাবে?"

অসিত কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কিরণ উপরে আসিয়া বলিল, "পরেশবাবু গাড়ী নিয়ে এসেছেন নির্ম্মলা! কেমন আছ এখন? আপনি নীচে যেতে পারবে ত?"

মিঃ ঘোষ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতের উপর ভর রাখিয়া নির্ম্মলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, "তা পারবো বোধ হয়।" মিঃ ঘোষ তাহাকে লইয়া সিঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইলে, কিরণ অসিতের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আজ অকস্মাৎ আমরা বাড়ী চড়াও হয়ে এসে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আপনাদের নির্জ্জন শান্তি ভঙ্গ করলুম! কিন্তু আপনারা ছিলেন বলে আজ এ বিপদের সময়ে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গেল। না হলে বড় মুস্কিলেই পড়তে হ'ত। যা-হোক, এখন থেকে তা হলে মাঝে মাঝে আপনাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে ত?"

অসিত একটু ভাবিয়া বলিল, "সেই কথাটাই ঠিক করে বলা শক্ত। পরিচয় যখন আপনাদের সঙ্গে হলো—তখন মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আমরা খুব খুসী হতুম। তবে কাজের গতিকে আমরা কখন যে কোথায় থাকি, তা আমরা নিজেরাই সব সময় ঠিক জানি না, সেই জন্যে কোন কথা দিতে সাহস হয় না।"

কিরণ বলিল, "তা বলে আমরা আপনাদের ছাড়ছি না মশায়! আপনারা সহরে যদি আমাদের ওখানে যান—সে ত খুব আনন্দের বিষয়। না হলে, আমিই এখানে এসে আজকার মত চড়াও হতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবো না—জানবেন।"

অসিত হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তাতে ত কোন ফল হবে না। হয় ত আমরা এখানে আর নাও আসতে পারি!"

দুইজনে কথা কহিতে কহিতে নীচে নামিয়া দেখিল—মিঃ ঘোষ নির্ম্মলাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

পরেশ দূরে দাঁড়াইয়াছিল। কিরণ তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে গেলে, নির্ম্মলা অসিতকে নমস্কার করিয়া বলিল, "তা হলে সুবিধা-মত এক দিন আমাদের ওখানে যাচ্ছেন ত?"

অসিত হাসিমুখে যুক্তকরে তাহাকে নমস্কার করিতেই, মিঃ ঘোষ বলিয়া উঠিলেন, "যাবেন বৈ কি! নিশ্চয়ই যাবেন! এমনিতে ত যেতেই হবে, তোমার 'পিকনিকের' দিনও আমাদের এই নতুন বন্ধুদের ছাড়া হবে না—কি বল নির্ম্মলা?" বলিয়া নিজের কথায় নিজেই প্রচুর হাস্য করিয়া অসিতকে বলিলেন, "সহরে যাকে বলবেন—সেই আমার বাড়ী দেখিয়ে দেবে। নিবাস যদিও আমার অনেক দূরে, রাজসাহী জেলায়, তবু এখানে অনেক দিনের বাস কি না, বহুকাল এখানেই কেটে গেছে, সকলেই জানে। আমার নাম গিরীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। আপনার নামটি কি?"

অকস্মাৎ অসিত দুই পা পিছু হটিয়া গেল। ঘোর উত্তেজনায় তার মুখ রক্তবর্ণ ও দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল। ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় বিকৃত সে মুখ দেখিয়া, মিঃ ঘোষ স্তম্ভিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অসিত সগর্জ্জনে বলিল, "আপনিই রাজসাহীর মণ্ডলগড়ের জমীদার গিরীন্দ্র ঘোষ? আমি সেখানকার রামগোবিন্দ দত্তের পুত্র, আমার নাম—অসিতকুমার দত্ত!"

মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত মিঃ ঘোষের উন্নত মস্তক তাঁহার বক্ষের উপর ঝুলিয়া পড়িল। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, "তুমি অসিত? তুমি অসিত? ওঃ! এত দিন পরে!"

[৭]

অরুণের ডায়েরী হইতে—

"প্রবল ঝড়ের পরে বিক্ষোভিত মথিত উন্মত্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেমন আবার ধীরে ধীরে শান্ত স্থির হয়ে আসে, সেদিনের সেই প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লবের পরে আজ দারুণ অবসাদে আমার এ উন্মত্ত বিদ্রোহী হৃদয় যেন ছিন্নমূল তরুর মত মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে। যতক্ষণ সংসারে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষার কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ তার সবই থাকে। সেই ক্ষীণ আশার রেখাটুকুই তাকে তার সব সর্ব্বনাশের পরেও বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু যার সেই শেষ রেখাটুকুও মুছে গেছে, যার আর কোন দিকে কোন অবলম্বন না থাকে, সে আর সংসারে কোন্ সুখে কোন্ আশায় বেঁচে থাকবে? আমার আজ ঠিক সেই অবস্থা। সংসারে আজ আমাকে কারও প্রয়োজন নেই, আমারো ভবের হাটে এবারের মত সব দেনা-পাওনা শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার জীবনে আশা নেই, মরণে সুখ নেই, তবু আশ্চর্য্যের কথা এই —এখনো আমি আছি। বাঁচবার কোন দরকার ছিল না, তবু বেঁচে আছি। শুধু তাই নয়—এখনো বসে বসে সুখ-দুঃখের বিশ্লেষণ করছি!

নিজের কথা ভাবতে গেলে, থেকে-থেকে কেবল সেই ভীষণ দিনটার কথাই আমার মনে হয়! সেদিনকার সে যুদ্ধের কথা কোন দিন ভোলবার নয়! প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জয়ের আশা সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে, জগতে চির-পদদলিত অধম বাঙ্গালীর বীরত্বে শৌর্য্যে-বীর্য্যে অপরাজেয় জার্ম্মাণ সৈন্য অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে! তারা যত পিছনে হঠ্ছে, আমাদের উৎসাহ, শক্তি ও সাহস তত যেন দুর্জ্জয় হয়ে উঠছে! সেদিন আমার কোন জ্ঞান-চৈতন্য ছিল না; মনে হচ্ছিল— আজ নিজেদের রক্ত ও জীবন দিয়ে এই রণক্ষেত্রে বাঙালীর ভীরুতার

চির-অপবাদ ক্ষালন করবো! এগিয়ে চল! এগিয়ে চল ... দিক দেখবার দরকার নেই, কিছু ভাববার নেই—এগোও! ... এগোও! সেদিন সে কি অপূর্ব্ব উন্মাদনা? প্রাণ দেবার সে কি তীব্র বিপুল আনন্দ!

সেই বিচিত্র উত্তেজনার মধ্যে ফরাসী সেনার সঙ্গে আমার নিজের দল নিয়ে আমি কতদূর এগিয়ে গেছি, তা আমি নিজেই জানি না—অকস্মাৎ পিছন থেকে একটা তীব্র মধুর স্বর শুনতে পেলুম,—লেফটেন্যাণ্ট্! লেফটেন্যাণ্ট্ ঘোষাল!

তখন আর ফিরে দেখবার সময় ছিল না; কিন্তু আর বেশী দূর যেতেও হলো না! ভীষণ বজ্রনাদের মত ভয়াবহ শব্দে সামনেই একটা কামানের গোলা ফেটে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল,—আমার চারিদিকে হত-আহতদের তীব্র আর্ত্তনাদে সহসা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হয়ে উঠলো,—মাথার ভিতর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে সেইখানে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।

যখন আমার জ্ঞান হলো, তখন দেখলুম, আমার মাথা থেকে চোখ পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা,—কিছু বুঝতে পারলুম না। ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে পারলুম না,—সর্ব্ব শরীরে দারুণ বেদনা। কি করব ভাবছি—এমন সময়ে আমার পাশ থেকে কে বল্লে,—"এই যে! তুমি জেগেছ দেখছি! কিন্তু এখন নড়বার চেষ্টা কোর না—স্থির হয়ে থাক।"

সে স্বর আমার পরিচিত! আমি বল্লুম,—"কে? লিজি না কি?"

—"হাঁ! আমি! কিন্তু তুমি বেশি কথা বলো না, ডাক্তার বারণ করেছেন।"—আমি বল্লুম, "আমার কি হয়েছে? তোমরা আমায় হাসপাতালে এনেছ না কি?"—লিজি বল্লে, "তুমি বড় আহত হয়েছ,

তোমার মাথায় ও চোখের স্নায়ুতে গোলার 'শক' লেগেছে। ডাক্তার বলেছেন, এখন কিছু দিন তোমার খুব সাবধানে ও স্থিরভাবে থাকতে হবে। আমি তোমার কাছে কাছেই আছি। কিন্তু তুমি আর কথা না বলে ঘুমোও।"

"ওঃ! আমি তা হলে আহত!" মনটা কেমন মুষড়ে গেল—কত দিন এখন জড়পদার্থের মত এখানে পড়ে থাকতে হবে! আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম, "তা হলে এখন আমি কিছুদিনের মত তোমার চার্জে এই হাসপাতালে পড়ে থাকবো, কেমন?"

"আবার? তুমি ত বড় অবাধ্য রোগী দেখছি! কি বল্লুম—এতক্ষণ ধরে?" এলিজাবেথ শাসন-ছলে এই কথা বলে তাঁর ফুলের মত নরম হাতখানি আমার মুখের ওপর চেপে ধরলে।

আমি তার হাতটা সরিয়ে বুকের ওপর চেপে রাখলুম। বল্লুম, "আর একটি কথা লিজি! সেই কথাটা হয়ে গেলেই আমি চুপ করে ঘুমিয়ে পড়বো, সত্যি বলছি। আমি শুধু জানতে চাই, সেদিনকার যুদ্ধের ফলটা কি হলো?"

"ওঃ! সেদিন তোমাদেরি জিত হয়েছে। জার্মানরা সে জায়গাটা ছেড়ে পালিয়েছে। সে স্থান এখন আমাদের হাতে। কিন্তু সেদিন অনেক লোক মারা গিয়েছে, আহতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।"

বুকটা যেন আনন্দে ফুলে উঠলো! সেদিনকার সব পরিশ্রম সার্থক হয়েছে তা হলে? আমি বল্লুম, "ধন্যবাদ! এই খবরটা জেনে মন বড় সুস্থ হলো। তার পর খানিক চুপ করে থাকবার পর আমি আবার বল্লুম, "দেখ লিজি! আর একটা কথা আমার কেবলই মনে পড়ছে সেদিন আহত হবার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পিছন থেকে কে যেন

আমায় ডেকে বলছিল—ঘোষাল! লেফ্‌টেন্যাণ্ট ঘোষাল সাবধান—আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, সে স্বর তোমারই!

এলিজাবেথ বিস্মিত হয়ে বল্লে, "সে কি? আমি সেখানে কি করে যাব? তার পর একটু ভেবে সে বল্লে—কিন্তু বড় আশ্চর্য্য ত! আমার মনে হয় কোন দেবদূত তোমার আসন্ন বিপদ দেখে তোমা সাবধান করে দিয়েছিলেন।"

আমি বল্লুম, "তা হতে পারে, তবে সে স্বর যে তোমারই এ আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি। তার এ দূর প্রবাসে আমায় জন্য সর্ব্বক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে ভাববারই বা তুমি ছাড়া কে আছে?"

এলিজাবেথ বল্লে, "ওঃ সেদিন আমি প্রথমটায় কি ভয় পেয়েছিলুম!"

আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি তোমায় একবারেই হারিয়েছি! শে যখন ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লে, তুমি শুধু আহত হয়েছ, তখন আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।"—লিজি তার কথা শেষ করে দুই হাতে আমার ডান হাতটা জড়িয়ে ধরলে।

তার অন্তরের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে আমি বল্লুম,—"লিজি! আমার প্রতি তোমার এ পবিত্র স্নেহের কোথাও তুলনা নেই।

লিজির হাতের সুকোমল আবেষ্টনটিতে আমি তার অন্তরে নিবিড় স্নেহের স্পর্শ অনুভব করতে করতে সেদিন ঘুমিয়ে পড়লুম।

দেশে থাকতে যে ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যে বাস করতুম, তার সীমা বাইরে উদার উন্মুক্ত জগতের মাঝে এসে যেদিন দাঁড়ালুম, সেদিন সহসা যেন চোখের ওপর থেকে একটা পর্দ্দা খসে গেছে—এইরকম মনে হলো।

নতুন জীবন—নতুন দৃষ্টি—অফুরন্ত প্রাণ! চারিদিকে যা দেখছি—সে-সবও যেন অতীতের কঙ্কালের ওপর নব নব রূপ পরিগ্রহ করে

চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে! সে-সব আমার আগেকার সীমাবদ্ধ জ্ঞান, সংস্কার ও জড়তার অন্ধ ধারণার সঙ্গে কোথাও খাপ খায় না।

মনে হ'ত—চারিদিকে অবাধ উন্মুক্ত জীবনের স্রোত উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে—কর্ম্ম, জ্ঞান, শক্তির অনন্ত প্রবাহ—সকলে চঞ্চল—ব্যস্ত—নিজের নিজের কাজে—অবিরাম ছুটেছে!

এই কর্ম্মমুখর জীব-জগতের পাশে কল্পনায় আমাদের সনাতন ভারতবর্ষকে আমার মনে হ'ত, যেন সে বহু দিনের প্রাচীন অহিফেন-সেবীর মত নেশায় জড় হয়ে ঝিমোচ্ছে, ও এক-একবার মাথা তুলে—'ব্রহ্মই সত্য—জগৎ মিথ্যা', "কা তব কান্তা" এই সব বুলি জপ করছে—আবার নেশার ঘোরে তার মাথা ঝিমিয়ে পড়ছে।

আমার এই নতুন জগতে সবই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সুন্দর, কিন্তু সব চেয়ে যে বস্তু আমার চোখে অপূর্ব্ব মহিমায়, গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে আমায় মুগ্ধ করে তুলেছিল—সে হচ্ছে—সে দেশের নারী।

নারী যে কত বড় হতে পারে,—শিক্ষায়, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে নারী যে কত উৎকর্ষ লাভ করে, ঠিক পুরুষের মতই কর্ম্মক্ষেত্রে তার পাশে দাঁড়িয়ে তার সাহস ও শক্তি বাড়িয়ে বড় করে তুলতে পারে,—এ আমি এদের দেখে মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝেছি—ও সেই সঙ্গে নিজেদের দেশের মেয়েদের দৈন্য অনুভব করে মন আমার লজ্জায় ও ধিক্কারে ভরে গেছে। পুঁথি-পত্রে, রচনায়, শাস্ত্রে তাদের গৌরবের অন্ত নেই—কিন্তু যথার্থ জীবন থেকে তারা আজ কত দূরে!

এখানে যে-সব মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে—তাঁরা সকলেই ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা—ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন, রুশিয়ান্—সব দেশীয় নারীই আছেন! দেশে থাকতে শুনতে পেতুম—ও-দেশের মেয়েরা অত্যন্ত অলস ও বিলাসিনী,—তারা ফুলের ঘায়

মূর্চ্ছা যায়,—শুধু প্রজাপতির মত আমোদ-আহ্লাদ, বিলাস-ব্যসন নিয়েই তারা ব্যস্ত,—বাস্তব জীবনের দুঃখ-কষ্টের ভিতর না কি এই প্রজাপতির দল ভিড়তে চায় না। এখানে এসে আমার এত দিনের সে ধারণা একেবারে বদলে গেছে।

যে-দিন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে ডাক পড়লো, সে-দিন তাদের সুখশান্তি-পূর্ণ, নিশ্চিন্ত-আরামে-ভরা ঘর ছেড়ে এই সব মেয়েরা এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের মতই সহজে হাসি-মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানকার জীবনের নানা অসুবিধা, অভাব, অস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই তাদের এ কর্ত্তব্যের আহ্বান থেকে দূরে রাখতে পারেনি। তারা জানে—শুধু অন্তঃপুরই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র নয়, জগতের কাজেও পুরুষের মতই তারও প্রয়োজন আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা—চারিদিকের মৃত্যুযন্ত্রণাপূর্ণ আর্ত্তনাদ—অবিরল বারুদ ও ধূমে আচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় স্থানে প্রাণের ভয় অগ্রাহ্য করে, এরা পরম যত্নে আহতদের তুলে নিয়ে আসছে। তার পর সে কি সেবা—কি মমতা—এই সব দুর্ভাগ্য আহতদের না দেখলে শুধু কথায় বোঝান যায় না! এদের কাজ, এদের প্রকৃতি যতই আমি দেখেছি—ততই আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে গেছে।

আমার সহকারী সেন বলে একটি ছেলের সেবার পায়ের ভিতর গুলি ঢুকে গিয়েছিল। তার পা অস্ত্র করে সে গুলি বের করবার ফলে তাকে বেশ কিছু দিন হাসপাতালে থাকতে হয়। আমি যখন তাকে দেখতে যেতুম, সেই সময় লিজির সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে সেই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় পরিণত হয়।

সেন যেদিন হাসপাতালে যায়, তার পরে দু'তিন দিন আমি নানা কাজে ব্যস্ত থাকায়, তাকে দেখতে যাবার সময় করতে পারিনি। যে-

দিন প্রথম তার কাছে গেলুম, তখন সে একটু ভাল আছে,—তার মাথার কাছে একটা চৌকি পেতে লিজি বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল।

সেন তার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিতে, সে প্রথমে তার সুনীল চোখের বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তার পরে একটু মধুর হেসে, হাত বাড়িয়ে বল্লে, সেনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তার বন্ধুরা সকলেই নির্ব্বিচারে আমার বন্ধু।

আমি তার করমর্দ্দন করে বসলুম। তিনজনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প-গুজব করা গেল। লিজি তার অন্যান্য রোগীদের দেখতে উঠে গেলে আমি সেনকে বল্লুম, এখানে কেমন আছ? সেবা-যত্ন রীতিমত হচ্ছে ত? না—যেমন হাসপাতালে গোলে-হরিবোল কাণ্ড হয়ে থাকে, তেমনি?

সেন একটু হেসে বল্লে, "নিজেদের দেশের হাসপাতাল দেখে-দেখে আমাদের এমনিই ধারণা হয়েছে বটে। এখানে সে-রকম কিছু নয়। কোন কষ্ট বা অভাব নেই—আর সেবার কথা আর কি বলবো! এখানকার নর্সদের কাছে যে-রকম সেবা পাচ্ছি, বোধ হয় নিজের মা-বোন থাকলে এমন সেবা হয় না। বিশেষ, ঐ যে মেয়েটি এখান থেকে উঠে গেল, ও যে কি মমতাময়ী—কি করে বল্লে যে ওর সব কথা ঠিক বোঝান যায়—তা আমি ভেবেই পাই না। ও এ কয় দিন আমায় এত যত্ন করছে—"

আমি হেসে বল্লুম, "তুই যে একেবারে নর্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলি! দেখিস্—যুদ্ধ করতে এসে যেন কিছু গোলযোগ বাধাস্ নি!"

সেন গম্ভীর মুখে বল্লে, "না ভাই অরুণ! ওদের সম্বন্ধে ও-রকম কথা বলা চলবে না; সত্যি, কি উঁচু এদের মন! আর যাদের

সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, সেই সব ভিন্নদেশী ভিন্নভাষী মানুষের জন্য এদের কি বুকভরা মমতা! আমি যখন যন্ত্রণায় গোঙাতুম,—ওর চোখে মুখে এমন তীব্র বেদনার চিহ্ন জেগে উঠতো,—আমি দেখে অবাক্ হয়ে যেতুম! খুব তীব্রভাবে অনুভব না করলে, মানুষের এমন রূপান্তর হতে পারে না। আমাদের পোড়া দেশে নারীর দেবীত্ব, মমতা, ভালবাসা সবই পুঁথিগত হয়ে রইলো,—জগৎ তার কোন সন্ধানই পেলে না। তাই বলছি—এদের ভালবাসার কথা আমার মনেই ওঠে না—এরা তার চেয়ে অনেক উচ্চে! আমি শুধু ওদের শ্রদ্ধা করতে পারি—ভক্তি করতে পারি!" তার পর থেকে আমি সময় পেলে সেনকে দেখতে যেতুম। লিজির সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

ক্রমে সেন সুস্থ হয়ে আবার কাজে যোগ দিলে; কিন্তু লিজি সময় পেলে আমার সঙ্গে দেখা করতো। আমরা দু'জনে সন্ধ্যাটা প্রায়ই একসঙ্গে কাটাতুম। তার সঙ্গ—তার সাহচর্য্য আমার স্বল্প অবসরটুকু রমণীয় করে তুলতো।

ক্রমশঃ আমার মনে একটা সন্দেহের ছায়া জেগে উঠতে লাগলো। কিছু দিন থেকে আমার মনে হচ্ছিল,—লিজি যেন আমার সম্বন্ধে সাধারণ বন্ধুত্বের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে! বীণার চিন্তায় আমার সমস্ত চিত্ত ভরে আছে,—তার রূপ সর্ব্বক্ষণ আমার অন্তরে বাহিরে জাগ্রত রয়েছে,—আমার মনে আর কারো জন্যে তিলমাত্র স্থান ছিল না,—আমি লিজির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লুম।

লিজির মত মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা—সে আমি বুঝি। বীণার চেয়ে তুলনায় সে অনেকাংশে হয় ত উচ্চও হতে পারে—কিন্তু তাতে কি? যোগ্য-অযোগ্য বিচার করে ত মানুষ ভালবাসতে পারে না। যাকে তার ভাল লাগে, সে তাকেই

ভালবাসে। আমার মন বীণার প্রেমে মুগ্ধ,—আত্মহারা। লিজির জন্যে আমার মনের কোথাও স্থান নেই। তাই সময় সময় আমার মনে হ'ত,—যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তবে লিজি বেচারা অনর্থক কি দুঃখ পাবে।

এক দিন আমরা দু'জনে একটা হ্রদের ধারে বসেছিলুম। এ জায়গাটার কাছে একবার যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে,—স্থানটা এখন ফরাসীদের হাতে। আশে-পাশে ধ্বংসের নৃশংস চিহ্ন তখনো বেশ পরিস্ফুট,—চারিদিকের বাড়ী-ঘর সব ভেঙ্গে চুরে স্তূপের মত এখানে ওখানে জড় হয়ে আছে। সুন্দর বিস্তৃত প্রান্তর ধূ ধূ করছে—জনমানবের বসতির চিহ্নমাত্রও নেই। এক সময় যেখানে কলরবময় মানুষের আবাস ছিল, এখন সে-স্থান শূন্য শ্মশানের মত পড়ে আছে। যত দূর দৃষ্টি যায়—নির্জ্জন—নিস্তব্ধ। হ্রদের স্থির জলে তীরের একটা অর্দ্ধভগ্ন গীর্জ্জার ছায়া পড়ে, মৃদু বাতাসে জলের বুকে নানা ছন্দে নানা রেখার জাল বুনছিলো।

লিজি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। থেকে থেকে সে বল্লে, "তোমাকে দেখলে কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ বলে মনে হয় না।"

আমি সকৌতুকে হেসে বল্লুম, "কেন—বল ত? হঠাৎ এ কথাটা যে মনে উঠলো?"

সে তার সুনীল সাগরজলের মত স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির রেখে বল্লে, "হঠাৎ নয়—এ কথাটা প্রায়ই আমার মনে হয়। তোমার হয় ত মনে থাকতে পারে, প্রথম আমি যেদিন তোমায় দেখি—সেন তোমায় তার দেশের লোক ও বন্ধু বলে পরিচয় করে দিতে, আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে ছিলুম! তুমি দেখতে বড়ই সুন্দর তাদের চেয়ে, সত্যিই বলছি—ভারি সুন্দর তুমি!" তার চোখে-মুখে

কি মনোহর একটা আলো জ্যোতির মত তখন ফুটে উঠেছিল—আমি হঠাৎ কি বলবো বুঝতে পারলুম না। মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেল।

সে আমার সামনে বসেছিল। বেশভূষার কোন আড়ম্বর ছিল না। একটি পরিচ্ছন্ন সাদা পোযাক। সোণালি চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে অনাবৃত তুষার-শুভ্র কাঁধের ওপর থেকে পিঠে লতিয়ে পড়েছে। পশ্চিম আকাশ থেকে একটি রক্তিম রশ্মি তার মুখে পড়েছিল— কি অপূর্ব্ব সুন্দরী সে! আমি মুগ্ধনেত্রে তাকে দেখতে দেখতে বল্লুম, "সে কথা বরং তোমার সম্বন্ধেই বলা যেতে পারে! তোমার মত এত সুন্দর আমি আর কোথাও দেখিনি!"

আমি এই কথা বলতেই, তার সমস্ত মুখ ঘোর আরক্ত হয়ে উঠলো। আর কোন দিন আমি এমন আত্মবিস্মৃত হয়ে তার রূপের প্রশংসা করি নি। সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলে না। তার অন্তরের অগাধ প্রেমে ও ভালবাসায় পূর্ণ চোখ দুটি তুলে—সে মৃদুস্বরে বল্লে, এ কি সত্যি কথা—ঘোষাল? সত্যিই কি আমাকে তোমার এত সুন্দর বলে মনে হয়? কথা শেষ করেই সে আমার হাতটা আবেগভরে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। ব্যাপার দেখে আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু এ যে কত বড় অন্যায় হচ্ছে, সে কথা মনে হ'তে আমি তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে খুব সহজভাবেই বল্লুম, সত্যিই বলছি—লিজি! আমি তোমার মত এত সুন্দর আর কোথাও দেখি নি—অবশ্য—একজন ছাড়া—আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী—তার কথা তোমায় বলি নি—বোধ হয়—সেও ঠিক এমনিই সুন্দর দেখতে!"

লিজির মুখ হঠাৎ মড়ার মত সাদা হয়ে গেল। অত্যন্ত চমকে উঠে, আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে বলে উঠলো, "তোমার বাগ্‌দত্তা পত্নী? তুমি এন্‌গেজড্ তা হলে? এ-কথা এত দিন ত বল নি?"

আমি অপরাধীর মত নিস্তব্ধ হয়ে রইলুম। সে-ও মুখ ফিরিয়ে ভাঙ্গা গীর্জাটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বহুক্ষণ নিঃস্পন্দ বসে রইলো। আমি যে তাকে কত বড় আঘাত দিয়েছি, আর সে যে নিঃশব্দে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করছে, সে সবই আমি নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারছিলুম,—তাকে কিছু বলবার আমার সাহস ছিল না।

দিনের স্বল্পাবশেষ আলোটুকু মিলিয়ে ক্রমে সন্ধ্যার আঁধারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে এলো। আকাশে দু' একটি তারা ফুটে উঠে স্তিমিত দৃষ্টিতে হ্রদের তটে উপবিষ্ট এই দুই স্তব্ধ প্রাণীর দিকে চেয়ে রইলো। আমরা দুজনে তেম্নিই বসে রইলুম।

বহুক্ষণ পরে এলিজাবেথ একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে মুখ ফিরালে। আমি চেয়ে দেখলুম, সে মুখ তখন পূর্ব্বের মতই স্থির ও গম্ভীর,—মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রেম ও অনুরাগের প্রবল উচ্ছ্বাসে যে মুখ পুলকাবেশে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, এখন আর তার কোন চিহ্ন ছিল না।

সে স্থির কণ্ঠে বল্লে, "তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালবেসেছিলুম—এ কথা আর অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এর পরে আর কোন কথা চলতে পারে না। থাক্—আমি সে জন্যে দুঃখিত নই। মানুষের জীবনে নানা দিক আছে। এক দিক রুদ্ধ হলেও, অন্যান্য দিক থেকেও সে সার্থকতা লাভ করতে পারে। তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই সব দিক থেকে তোমার উপযুক্ত হবেন? তুমি কিছু মনে করো না, আমি বন্ধুভাবে জিজ্ঞেস করছি। আমরা এখান থেকে শুনি কি না—তোমাদের দেশের মেয়েরা অত্যন্ত পিছিয়ে আছে?"

আমি বল্লুম, "তিনি সেখানকার হাইকোর্টের জজের মেয়ে। লণ্ডনে সাত আট বছর থেকে, আধুনিক সর্ব্ব রকম শিক্ষায় শিক্ষিতা হ'য়ে, সম্প্রতি দেশে ফিরে গেছেন।"

লিজি শুনে বল্লে, "আমি বড় সুখী হলুম। প্রার্থনা করি, তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক। যখন তুমি দেশে ফিরে যাবে, আমার কথা তাঁকে বোলো—আমার শুভ ইচ্ছা তাঁকে জানিও। তার পর সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, আর আমরা দুজনে ঠিক আগের মতই পরস্পরের বন্ধু—কেমন?"

আমি সাগ্রহে প্রসারিত হাতখানি ধরে বল্লুম, "অন্তর্য্যামী জানেন —এর চেয়ে সুখের বিষয় আমার আর কিছু নেই।"

তার পর থেকে তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ আগের চেয়ে কমে এসেছিল। তবু মাঝে মাঝে অনেক অপরাহ্ণ আমরা একত্র কাটাতুম। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই আমি আহত হয়ে হাসপাতালে এলুম।

আমার চিকিৎসা বেশ ভাল ভাবেই চলছিল। সুচিকিৎসা ও লিজির সেবার গুণে শীঘ্রই আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম—আমার দুর্ব্বলতা ও শরীরের গ্লানি সবই সেরে গেল। শুধু আমার চোখের ব্যাণ্ডেজ তখনো খোলা হলো না।

লিজি প্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার সেবা করত। তার সমস্ত অবসর-সময়টুকু সে বিশ্রাম না করে আমার কাছেই কাটাত। গল্প করে, সেবা করে, বই পড়ে শুনিয়ে আমায় প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতো। কিন্তু তবু আমার যেন মনে হ'ত, সে বুঝি সর্ব্বক্ষণ কি একটা প্রচ্ছন্ন বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে,—কথা বলতে বলতে সে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে! আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে, যেন অশ্রু সম্বরণ করতে উঠে যায়! আমি তার এ ভাবান্তরের কারণ কিছু বুঝতে পারতুম না।

এমনি করে প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। সুস্থ সবল শরীরে এমন করে পড়ে থাকতে ক্রমেই আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠছিলুম। প্রতি

দিনই এ জন্যে ডাক্তারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতুম। কত দিন যে বীণাকে চিঠি লেখা হয় নি—সে হয় ত এত দেরি দেখে উদ্বেগে আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠেছে। রোগ-শয্যায় পড়ে পড়ে আরো বেশী করে কেবল তার কথাই আমার মনে হতো। সন্ধ্যার সময়ে আমি মনে মনে সুদূর পাটনা নগরের এক প্রান্তে মিঃ রায়ের সুরম্য বাসভবনটি প্রায়ই কল্পনায় দেখতে পেতুম। সেখানকার বিস্তৃত টেনিস্ ক্ষেত্রে বীণা, কিরণ, নির্ম্মলা, চৌধুরী সবাই মিলে খেলা করছে! বীণার মুখ ঈষৎ ম্লান, বিষণ্ণ,—সে যে কত দিন আমার কোন সংবাদ পায় নি! এই দারুণ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষেত্রে যে তাহার প্রিয়কে ছেড়ে দিয়ে, একটু পত্রের আশায় পথের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে, তার পক্ষে এত বিলম্ব যে কতখানি উদ্বেগ, কত আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে, সেটা উপলব্ধি করে আমি একেবারে অধীর চঞ্চল হয়ে উঠতুম,—মন আমার উধাও হয়ে সেই দূর সমুদ্র পার হয়ে বীণার পাশে ছুটে আসবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতো,—ফরাসী দেশের শত সেবা যত্ন, লিজির প্রাণঢালা নিঃস্বার্থ ভালবাসা, কিছুই আমায় সেখানে বাঁধতে পারতো না,—আমি তখন কেবল অধীর হয়ে ভাবতুম, কবে, দিনে এরা আমায় মুক্তি দেবে?

যা হোক, সংসারে সব জিনিসেরই শেষ আছে, আমারও একদিন মুক্তির আদেশ এলো। কিন্তু সে একেবারে অতর্কিত বজ্রাঘাতের মত!

সে দিন সকালে ডাক্তার এসে যথারীতি পরীক্ষাদির পর বল্লেন, লেফটেন্যানট্ ঘোষাল! তোমাকে আজ বলবার একটা বিষয় আছে। তুমি এখান থেকে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। আমি এখন দেখছি, আর তোমাকে এখানে আটকে রাখবার কোন দরকার নেই। কাল তুমি এখান থেকে মুক্তি পাবে।

আমি মুক্তির আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। এত দিন পরে তবে আবার সেই আগেকার মুক্ত আনন্দময় জীবন! বল্লুম, "ধন্যবাদ! শত শত ধন্যবাদ আপনাকে! এই মুক্তিটুকু পাবার জন্যে আমি যে কতদিন থেকে ব্যাকুল হয়ে রয়েছি—তা আপনি বুঝতে পারবেন না! চোখটা এত দিনে সেরে গেছে তা হলে? আজ কি তা হলে আমার ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেবেন?"

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, "ব্যাণ্ডেজটা রাখবার আর দরকার নেই,—তোমার নর্সকে বলে যাচ্ছি, সে ওটা খুলে দেবে। তবে হাঁ—চোখের কথা! তা ঐখানে একটু গোলযোগ হয়েছে—কিন্তু লেফ্‌টেন্যাণ্ট! কথাটা তোমাকে খুলে বলাই ভাল,—তুমি বীর-সৈনিক-পুরুষ,—আশা করি সৈনিকের মতই এ আঘাতটা গ্রহণ করবে!"

আমি চমকে উঠলুম! এত ভূমিকা কিসের—আমার হয়েছে কি? আতঙ্কে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলুম, "ডাক্তার! এ কি বলছো তুমি? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! স্পষ্ট করে বল—আমার হয়েছে কি?"

ডাক্তার বল্লেন, "অর্থাৎ তোমার মাথায় সেই যে গোলার 'শক্' লেগেছিল,—মনে আছে ত? তাতেই চোখের যে দৃষ্টি-বহা স্নায়ু—যার জন্যে আমরা সব জিনিস দেখতে পাই—সেইটা আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের যতদূর সাধ্য, আমরা চেষ্টা করে দেখলুম—বিশেষ ফল হ'ল না। চোখের কোন স্পেশ্যাল চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই এখানে। তাই আমরা স্থির করেছি—তুমি কাল বম্বে চলে যাও। সেখানে সব রকম ব্যবস্থা আছে। সেখানকার বড় মেডিকেল বোর্ড—তোমার সম্বন্ধে যা করা দরকার—সবই করবেন। আমরা এখান থেকে সে ব্যবস্থা করেছি। এখানে অনর্থক দেরি করবার কোন দরকার নেই,—কালই বেরিয়ে

পড়ো। তোমার সঙ্গে যাবার লোকেরও আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমি বড় দুঃখিত হচ্ছি ঘোষাল—তোমার জন্যে কিছু করতে পারলুম না—যদিও চেষ্টা যতদূর করবার সবই করা গেল। আচ্ছা এখন—তবে বিদায়!"

মস্ মস্ করে জুতোর শব্দ হ'ল। বুঝলুম—ডাক্তার চলে গেল। কি যে সব বলে গেল—ঠিক মর্ম্ম বুঝতে পারলুম না—সভয়ে ডাকলুম, "লিজি!"

সে কাছেই ছিল—আমি বল্লুম, "ডাক্তার কি বলে গেল? আমি কি আর দেখতে পাব না? আমার চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে?"

লিজি বোধ হয় নিঃশব্দে কাঁদছিল, সে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বল্লে, "ওঁরা তাই সন্দেহ করছেন।"

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। মনে হতে লাগলো—একটা বিরাট সূচীভেদ্য অন্ধকার ধীরে ধীরে আমার চোখের ওপর নেমে আসছে। আজ এক মাস হতে গেল—আমি আহত হয়ে হাসপাতালে চোখ-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। এক দিনের জন্যও আমার মনে কোন চিন্তা বা আতঙ্ক আসে নি। মনে যথেষ্ট ভরসা ছিল,—আমি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিতে পারবো! কিন্তু আজ এরা এ কি বলছে? আমি অন্ধ! আমার চোখের দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে! এ কি কখনো সম্ভব? এমনি করে আমার এত সাধের,—আশায় উৎসাহে ভরা জীবন এক কথায় ব্যর্থ হয়ে যাবে? অসম্ভব!

উদ্বেগে ও হতাশায় আমি পাগলের মত চীৎকার করে বল্লুম, "লিজি! লিজি! আমার চোখের বাঁধনটা খুলে দাও! আমি নিজে একবার দেখতে চাই! আমি কি সত্যই একেবারে অন্ধ হয়ে গেছি?"

এলিজাবেথ এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে লাগলো! সমস্তটা খুলতে যেটুকু সময় লাগলো, তাতেই আমি অধৈর্য্য হয়ে

উঠছিলুম। শেষ পাকটা খোলা হতেই, আমি সজোরে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে, প্রাণপণে চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম—অন্ধকার! সব ঘোর অন্ধকার! তবু বিশ্বাস হলো না। মনে হলো—বহু দিন চোখ বাঁধা ছিল বলে হয় ত পাতা ভাল করে খোলে নি—দুই হাতে পাতাগুলো জোর করে খুলে আবার ব্যাকুল নেত্রে চাইলুম—অন্ধকার, সামনে পিছনে আশে পাশে বিরাট অন্ধকার!

তবে সবই সত্য! সত্যই আমি অন্ধ! শরীর অবসন্ন হয়ে এলো! আর কিছু ভাবতে পারলুম না। পৃথিবীর আলো আমার চোখের ওপর নিভে গেছে! আজ থেকে তবে জীবনের সমস্ত আশা, সুখ, আনন্দ—সবই শেষ! আজ আমার জীবনের অবসান হলো!

ভীত কম্পিত কণ্ঠে ডাকলুম, "লিজি! তুমি কোথায়? আমার কাছে এসো!"

আমার সেই অসহায় ভীত মুখের ভাব দেখে, সে স্নেহময়ী মাতার মত ছুটে এসে, আমার মাথাটা তার বুকের মধ্যে চেপে ধরলে; বল্লে,—ভয় কি? আমি ত তোমার কাছে কাছে সর্ব্বদা রয়েছি। তার পরে সে তার চোখের জল মুছে বল্লে, যে দিন ওরা প্রথম থেকেই তোমায় পরীক্ষা করে এ কথা বল্লে—সে দিন থেকে কি মর্ম্মান্তিক যাতনাই যে আমি ভোগ করছি, সে আর কি বোলবো! এত দিন তবু আমার কাছে ছিলে,—এইটুকু আমার সান্ত্বনা ছিল,—আজ থেকে তাও গেল। আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওরা আজ তোমায় এই অসহায় অবস্থায় কোথায় কত দূর পাঠিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের রেজিমেণ্টের আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না,—কাজেই বিদায়ের আয়োজন আরম্ভ হল। এক দিন আমি এখান থেকে মুক্তির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম,—কিন্তু যখন সত্যই সে মুহূর্ত্ত উপস্থিত

হলো, তখন আর তেমন আগ্রহে তাকে গ্রহণ করতে পারলুম না। তখন বুঝলুম, এলিজাবেথ কত দিক থেকে, কত রকমে, কত মধুময় বন্ধনে আমার বেঁধে রেখেছে।

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আমরা দু'জনে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলুম। আমাদের প্রথম পরিচয়ের পর থেকে সমস্ত ঘটনা এক এক করে তখন মনে হচ্ছিল। কত দিনের কত মধুর সন্ধ্যা, কত আলাপ, কত আমোদ-প্রমোদ—যেন ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠছিল,—আজ সে সবেরি শেষ! গভীর বিষাদের ভারে দু'জনেরি মন তখন এমন ম্রিয়মাণ—কোন কথা তখন বলা যায় না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে থেকে এলিজাবেথ শেষে বলে উঠলো, "দেখ! মানুষ আশাতেই বেঁচে থাকে,—আমরাই বা শেষ আশাটুকু ছাড়বো কেন? যদি বম্বের মেডিকেল বোর্ডের ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসায় তুমি সেরে ওঠো, তা হলে আর কখনো কি এদিকে আসবে না?"

তার স্নেহকাতর, সেবা-পরায়ণ নারী-প্রকৃতি যে আমার দূরে ছেড়ে দিতে কত ব্যাকুল হয়ে উঠছে—আমি তার এ কথায় তা বুঝলুম। তাকে মিথ্যা আশা দিতে আমার প্রবৃত্তি হলো না; কারণ, আমার মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল,—আবার সুস্থ হবো, এ আশা তখন আমি আর করতে পারছিলুম না। আমি ব্যথিত চিত্তে বল্লুম, "বম্বেতে আমার সম্বন্ধে ভাল-মন্দ যে কোন ফলই হোক—এখানকার রেজিমেণ্টে সে খবর আসবে সুতরাং তুমি খোঁজ করলেই সে খবর পাবে। ভাল যদি হই, তা হলে নিশ্চয়ই আবার আসবো, সে তুমি ঠিক জেনো। আর তা যদি না হই—তা হলে দেখা আর আমাদের মধ্যে হবে না,—চিঠি-পত্র দিয়ে খোঁজ নেওয়াও হয় ত আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কিন্তু লিজি! আমি কোন দিন জীবনে তোমায়

ভুলতে পারবো না। এই তিন মাস তুমি একাধারে কত কত রূপে যে আমার জীবন পূর্ণ করে রেখেছিলে, তা আজ বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি। আমার জীবনের সকল অভাব ভরিয়ে রেখেছিলে তুমি! সুখের দিনে তোমায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আমার পাশে পেয়েছিলুম! দুঃখের দিনে তুমি মায়ের স্নেহ বুকে নিয়ে এই দুর্ভাগ্য অসহায় অন্ধের অক্লান্ত পরিচর্য্যা করেছ! আর কি বেশি বোলবো,—আমার মনের ভিতর তোমার স্মৃতি জীবনদাত্রী দেবীর মত চিরজাগ্রত হয়ে থাকবে!"

আমার হাত ধরে লিজি বল্লে, "ও রকম করে কথা বোল না তুমি! আমার বড় কষ্ট হয়! তুমি তোমার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যাচ্ছ,—তাঁদের সঙ্গে, তাঁদের স্নেহে যতটা সম্ভব শান্তি পাবে। তা ছাড়া তোমার স্ত্রী আছেন,—তোমার সেবা করবার তাঁরই অধিকার। আমার কোন কথা বলবার অধিকার নেই,—বলা উচিতও নয়। তবু আজ এই বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে বলছি,—তোমার পাশে থেকে যাবজ্জীবন তোমার সেবা করা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু কাম্য নেই।"

অজস্র অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে এলিজাবেথ আমায় জাহাজে তুলে দিয়ে বিদায় নিলে। সে চলে যাবার পর আমি যেমন নিজেকে অসহায় বোধ করতে লাগলুম, জীবনে কোন দিন এমন মনে হয় নি। তিন মাস পূর্ব্বে এক দিন দেশ থেকে অদম্য আশা ও উৎসাহপূর্ণ চিত্তে, স্ফীতবক্ষে ফ্রান্সের উপকূলে এসে নেমেছিলুম,—সেদিন মনে কি দুর্জ্জয় সাহস। কি অজেয় শক্তি! নবলব্ধ অধিকার পেয়ে তখন আমরা কি করে যে বাঙালীর পরাক্রম জগৎকে দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ ও চকিত করে তুলবো,—নিশিদিন সেই চিন্তায় আত্মহারা! আজও আমার মনে সে দিনের সেই উৎসাহ, সেই সাহস, সেই অজেয় শক্তি—

সবই বিদ্যমান! কিন্তু মানুষের ভাগ্যের কি পরিবর্ত্তন! আজ আমি সেই উপকূল থেকে জীর্ণ, ভগ্ন হৃদয়ে, দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে, নিতান্ত দীন-হীনের মত আবার দেশে ফিরে চলেছি! আজ আর সংসারে আমার আশা বা আকাঙ্ক্ষা করবার কিছুই রইলো না।

বাস্তবিক, আমার এই অন্ধত্বটা আমার কাছে বিধাতার অত্যন্ত অবিচার ও অত্যাচার বলে মনে হয়! জাহাজের সুদীর্ঘ পথ আমি শুধু শূন্য-মনে এই কথাটাই এক মনে ভাবতুম,—যুদ্ধে অন্য কত লোকের মত আমার প্রাণ গেলেও ত যেতে পারত? তা হলে আজ অভিযোগ করবার ত কিছুই থাকতো না! কিন্তু তা হলো না! কত লোকের হাত-পা উড়ে গেছে! তারা কত কষ্ট পেয়েছে বটে, তবু বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ তাদের জোড়া তাড়া দিয়ে কোন রকমে আবার খাড়া করিয়ে দিয়েছে! আমার সে-রকমও কিছু হলো না! আমি অন্ধ! সবল সুস্থ,—অটুট স্বাস্থ্যে, যৌবনের শক্তিতে ভরপূর হয়েও আমি অক্ষম অসহায়! আমার আর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই পূর্ণ কার্য্যক্ষম থাকা সত্ত্বেও আমি অন্ধ! তাই আমার সব শক্তি থেকেও কিছু নেই! সব থেকে শুধু আমার চোখ দুটিই নষ্ট হয়ে গেল—যার আর প্রতিকার করবার কোন উপায় নেই! আশ্চর্য্য!

এক এক সময় একটা রুদ্ধ রোষে ও আক্রোশে আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠতো! কার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ,—কাকেই বা এর জন্যে শাস্তি দিতে চাই,—তা জানি না,—তবু মনের ভিতর একটা অশান্ত বিদ্রোহ জেগে উঠে, আমায় চঞ্চল করে তুলতো। আবার এক এক সময় একটা দারুণ নিরাশা ও অবসাদে সমস্ত মন মুহ্যমান হয়ে ভেঙে পড়তো। আমি অন্ধ! জগতের সকল সুখসাধে বঞ্চিত! আমার জীবনে কোন দিক থেকে আর কোন সুখের আশা নেই! কেন

তবে এ দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বয়ে মরা। একটি গুলিতে ত এই দুঃখময় জীবনের সব দুঃখ হতে অব্যাহতি লাভ করতে পারি! ক্ষোভে নিরাশায় যখন সত্যই আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠতো, তখন আমার এই দগ্ধ হৃদয়-পটে ধীরে ধীরে একখানি মধুর মুখ জেগে উঠে আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিত। সে মুখ আমার বীণার! বিদায়ের দিনের সেই কাতর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখ! আমার মন বলতো, সে তোমার আশায় সেখানে পথ চেয়ে বসে আছে, আর তোমার এই আচরণ? একটি বিশ্বস্ত প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে তোমার লজ্জা হয় না? সেই মুখ মনে করে তখন আমার সব দুঃখ, সব গ্লানি ভুলে যেতে সাধ হতো। ভাবতুম, আমার সব গেলেও এখনো আমার বীণা আছে,—সে আমার পাশে থাকলে আমি জীবনভোর এ দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করতে পারি!

আশা মায়াবিনী! কখনো বা সে তার কুহকজাল রচনা করে একটি মনোহর চিত্র আমার মনের উপর ধরতো! তখন ভাবতুম, আর যদিই-বা বম্বের হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়ে আবার আমার চোখ ভাল হয়ে ওঠে? ডাক্তার ত বলেই ছিল—সেখানে চোখের চিকিৎসার স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা নেই। ভাল রকম চিকিৎসা হলে হয় ত আমার চোখ সুস্থ হওয়া অসম্ভব না-ও হতে পারে!

মানুষ সহজে এতটুকু আশাও ছাড়তে চায় না। এই ক্ষীণ আশার সূত্রটুকু ধরে আমিও অনেক সময় একটু শান্তি পাবার চেষ্টা করতুম!

প্রথম প্রথম এলিজাবেথের ভারি অভাব বোধ করতুম। এই আত্মীয়-স্বজন-শূন্য প্রদেশে, কঠোর সৈনিক-জীবনে, স্নেহের প্রতিমার মত সে আমায় কি অসীম যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল!

আমি অযাচিতভাবে কেবলই তার কাছ থেকে অপরিমেয় ভালবাসা পেয়ে এসেছি, প্রতিদানে তাকে কিছুই দিতে পারি নি, কিন্তু তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে তার অভাবের তীব্র বেদনা আমায় জর্জ্জরিত করে তুলছিল।

জাহাজের অন্যান্য আরোহী ও আরোহিণীর দল সকলেই নিজের নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খেলায়, গল্পে, আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত,—আমিই শুধু একা তাদের আনন্দ-কলরবের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতুম। অন্ধের এই নিরানন্দ বৈচিত্র্যহীন জীবন! তার দিকে কারো মনোযোগ আকৃষ্ট হতো না। আমার সহচর সন্ধ্যায় আমায় ডেকের উপর চৌকি পেতে বসিয়ে দিয়ে যেত। আমি একা বসে বসে কল্পনা-নেত্রে দেখতুম,—নক্ষত্র-খচিত মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ,—জোছনার রজত-ধারায় চারিদিক প্লাবিত,—তারি মাঝে সুনীল অনন্ত-প্রসারিত সাগরের বারিরাশি মথিত করে আমাদের জাহাজ ছুটে চলেছে। সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম গর্জ্জন আমার কাণে বাজতো। আশ-পাশ থেকে মাঝে মাঝে গল্পের মধ্য থেকে কথার টুকরো বা হাসির শব্দ কাণে ভেসে আসতো। কখনো বা কোন প্রণয়ি-যুগলের মৃদু উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলাপ,—কখনও বা কোন দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষ তান!

ধীরে ধীরে আমার মনে অতীত জীবনের কত উজ্জ্বল দিনের মধুর স্মৃতি জেগে উঠতো,—আমিও তো এমনি করে জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণ করে কত দিন এ সংসারের সমস্ত আনন্দ, রস, সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটিয়ে পান করেছি! সেই আমি আজো বর্ত্তমান,—অপরিতৃপ্ত মনের তৃষ্ণা তেমনি অব্যাহত—কিন্তু সেদিন আজ কোথায়? কোন্ পাপে, কার অভিশাপে আমার জীবনের সমস্ত সুখের আশা নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেল?

হতাশায়, অভিমানে কত সময় আমার চোখ জলে ভরে আসতো। আবার তখনি মনে হ'ত,—আজ আর আমার পাশে স্নেহময়ী এলিজাবেথ নেই,—যে আমায় এতটুকু কাতর দেখলে, তখনি ছুটে এসে, তার অন্তরের সমস্ত মাধুর্য্য ঢেলে দিয়ে, আমার মনের বেদনা মুছে দেবার চেষ্টা করবে! আজ সে আমার কাছ থেকে অনেক—অনেক দূরে। নিজের ব্যথায় নিজেই কেঁদে কেঁদে অবসন্ন হয়ে পড়ে নিজেই নিরস্ত হতুম।

আশা ও নিরাশার মধ্যে এমনি করে দোল খেতে খেতে অবশেষে এক দিন বোম্বাইয়ের উপকূলে জাহাজ এসে থামলো।

আবার আমি বোম্বাইয়ের হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। যথারীতি আমার পরীক্ষা এবং চিকিৎসা চল্‌তে লাগ্‌ল। যখন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে সেখানকার হাসপাতালে ছিলুম, তখন আমার কোন আশঙ্কা ছিল না। আমার যে দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হতে পারে, এ সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কখনো আমার মনে আসে নি। সেই জন্য মন বেশ সুস্থ সবল ছিল। কিন্তু এখানে দিন দিন আমার মনের উদ্বেগ যেন অসহ্য হয়ে উঠছিল। এরা যে কোন্ দিন কি বলবে, সর্ব্বক্ষণ সেই উৎকণ্ঠায় আমার মন এমনি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতো, যেন সেই একটি কথার উপর আমার সমস্ত জীবন-মরণ নির্ভর করছে!

বম্বে এসে পর্য্যন্ত আর একটি কারণে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিল। আমার এ চাঞ্চল্যের কারণ—বীণা! যত দিন আমি তার কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলুম, যখন ইচ্ছা করলেই ছুটে চলে আসবার কোন উপায় ছিল না, তখন বাধ্য হয়ে মনও বেশ সংযত ছিল। কিন্তু এখন এত কাছে এসে তার কাছ থেকে এত দূরে থাকা, —এ যেন আমার পক্ষে একেবারে অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল। বম্বে

থেকে পাটনা—এইটুকু সামান্য ব্যবধান! এক এক সময় মনে হোত—সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে—এদের চিকিৎসার এই যে বন্ধন, এ সব ছিঁড়ে ফেলে, ছুটে তার কাছে চলে যাই! অন্তরের মধ্যে যার চিন্তা এত তীব্রভাবে সদা জাগ্রত, তাকে বাইরে থেকে পাওয়া কি এতই কঠিন?

বম্বের মেডিকেল বোর্ড প্রায় এক মাস আমার চোখের চিকিৎসা ও নানাবিধ পরীক্ষা করে দেখে, অবশেষে এক দিন তাঁদের সকলের মত প্রকাশ করলেন—চিকিৎসা-শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের বিশ্বাস—আমার দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে পাওয়া যাবে না! দৃষ্টিবহা স্নায়ু একেবারে অবশ হয়ে গেছে,—তার কার্য্যকরী শক্তি আবার ফিরিয়ে আনা তাঁদের শক্তির বাহিরে! সুতরাং এক কথায় আমার ভাগ্য নির্ণয় হয়ে গেল!

সেদিন—তখন সন্ধ্যা,—আমি একা আমার ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলুম,—অন্তরের মধ্যে তখন তুমুল ঝড় চলছিল। চারিদিকের সমস্ত বন্ধন থেকে বিযুক্ত হয়ে, আমি যেন একটা আশ্রয়হীন মহাশূন্যের মধ্যে এসে পড়েছি. আমার জীবনের যে এইখানেই পরিসমাপ্তি. তা যেন বুঝছি,—কিন্তু কেন? কিসের জন্য? সংসারে আর সকলে ঠিক আগেকার মতই সুখে আনন্দে তাদের জীবন-তরণী বেয়ে চলেছে,—আর আমিই শুধু এই ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে অতলে তলিয়ে যাবো? কোন্ অপরাধে আমার এ শাস্তি? এ অত্যাচার, এ অবিচারের কি কোন প্রতিবিধান নেই? মানুষের কি এমন কোন শক্তি নেই যে, সে এই অদৃশ্য শক্তির প্রতিরোধ করে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারে? আমার মনে তখন ঠিক যে কোন্ ভাবের উদয় হচ্ছিল,—কি যে তখন আমি ঠিক ভাবছিলাম,—তা আমি নিজেই ঠিক জানি না।

কেবল একটা উৎকট প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের তীব্র বাসনায় আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে গর্জ্জে গর্জ্জে উঠ্‌ছিল! কার জন্যে আমার জীবন এমনভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল!

বাইরে যখন ঝড় ওঠে, সে তার প্রবল বিক্রমে প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত মথিত করে ধ্বংসের চিহ্ন রেখে যায়। তার সে ভীম পরাক্রমের প্রতিরোধ করতে জগতের কোন শক্তিই তখন তার সামনে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু মানুষের মনের ভিতরে যে দুর্জ্জয় বিপ্লব চলতে থাকে, বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। একটা উন্মাদ বাসনায় আমার তখন কেবল মনে হচ্ছিল—প্রলয়ের একটা তাণ্ডব সংহার-লীলার মধ্যে জগৎটা ভেঙে-চুরে গুঁড়ো হয়ে যাক্; ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক্,—চন্দ্র সূর্য্য তারা নিবে যাক্,—গ্রহ উপগ্রহের ভীষণ সংঘাতে উল্কাপাতে সমস্ত সৃষ্টি রসাতলে যাক্! কিন্তু হায়, মানুষ কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র! তার জীবনের সব শুভাশুভ, সুখ-দুঃখ সেই শক্তির ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে! তার নিজের কোথাও কোন শক্তি নেই! তার বুক-ফাটা অভিশাপে বাহ্য জগতের কোনই ক্ষতি হয় না,—শুধু সে নিজের নিষ্ফল আক্রোশে নিজেই জলে পুড়ে মরে!

সেদিন সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত্রি টেবিলের ধারে চৌকির ওপর বসে বসেই কেটে গেল। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যখন উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ও অবসন্ন দেহ একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে এল, তখন টেবিলের ওপরেই মাথাটা রেখে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মত লুটিয়ে পড়লুম।

যতক্ষণ মানুষের মাথার ওপর কোন একটা আসন্ন বিপদের ছায়া ঘনীভূত হয়ে থাকে, ততক্ষণ তার জন্যে কত আশঙ্কা, কত উৎকণ্ঠা তাকে সব সময় উদ্বিগ্ন ও কাতর করে রাখে। কিন্তু যখন সে আর

দূরে না থেকে একেবারে তার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—তখন দেখা যায় যে, কষ্ট আছে বটে, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে যে শান্তিটুকু অযাচিত ভাবে পাওয়া যায়, তার মূল্যও বড় কম নয়।

পরের দিন যখন আমি জাগলুম, তখন আমার মনের ঠিক তেমনি অবস্থা। দু'মাস ধরে যে আশা ও নিরাশা, আনন্দ ও উদ্বেগ আমার সারা চিত্ত ভরে থেকে জীবনটা একবারে অশান্তিময় করে তুলেছিল, আজ সে-সবের অবসান হয়েছে। ভাগ্য আমার আজ নিশ্চিতভাবে নিরূপিত হয়ে গেছে; সুতরাং কি হবে, একথা ভাববার আর কোন প্রয়োজন নেই। সুখের আশা ও দুঃখের আশঙ্কা দুইই তখন আমার মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে,—মন তখন একটা নির্ব্বিকার শান্ত বৈরাগ্যের ভাবে ভরপুর!

সেই সম্পূর্ণ আশাহত, উদাসীন চিত্তে সর্ব্বপ্রথম আমার বীণার কথা মনে হল। আজ দু'মাস ধরে নিয়ত যার নাম জপ করে যার রূপ ধ্যান করে নিশিদিন অধীর আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে কাটিয়েছি, তার কথা মনে করে আজ আর আমি কোন আনন্দ পেলুম না। বরং মনে হল, আমার এ দুর্ভাগ্য অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে তার তরুণ সুকুমার জীবন জড়িত করে তাকে তার জীবনের সকল আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রাখবার আমার কি অধিকার আছে? এমন অদ্ভুত ও অসঙ্গত বাসনা কি করে এতদিন আমার মাথায় ঢুকেছিল,—আজ আমি তা ভেবে-পেলুম না।

তাকে মুক্তি দিতে হবে! হয় ত দু'দিন তার একটু কষ্ট হতে পারে, তার পরে সে এ-সব কথা ভুলে গিয়ে আবার জীবনে সুখী হবে। মাত্র তিন মাসের পরিচয় আমাদের! এই পরিচয়ে সারা জীবনের মত এই জীবন্মৃত অন্ধের পাশে সব সুখ-শান্তি হারিয়ে কাটানো,—

এ কখনো বীণার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়! চিরদিনের সুখপালিতা সে,—কখনো কোন কষ্টে অভ্যস্তা নয়! তার প্রতি এত বড় অবিচার,—এ আমি কখনো করতে পারবো না।

তখনি বসে বসে বীণাকে একখানা চিঠি লিখলুম। আমার সমস্ত কথা বিবৃত করে পরে লিখলুম, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল,—আমার এ অবস্থার পর আর তার কোন প্রয়োজন নেই। অনর্থক তোমার জীবন এমন ব্যর্থ হয়ে যাবে, আমি তা চাই না। সেইজন্যে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব ভঙ্গ করে দেবার জন্যে এই চিঠি লিখছি। আমার আশা আছে,—তুমিও সব দিক বিবেচনা করে দেখে এ প্রস্তাবে সম্মতি দেবে।

সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত ও বেদনামুক্ত হৃদয়ে আমি বীণার সম্বন্ধে সব দাবী-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, এই ত্যাগ-পত্র লিখে ফেললুম। আজ আর তার জন্যে আমার মনের কোন কোণে একটুও ব্যথা বাজলো না।

এখন আবার নিজের কথা ভাববার সময় হল। হাসপাতালে আর আমার থাকবার প্রয়োজন নেই: সুতরাং এখন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু কথা এই যে, এখন আমি যাই কোথায়? আমার ঘর কোথা?

ঘরের কথা মনে হতে, আমার এ নিঃস্পন্দ অসাড় প্রাণও আবার যেন চঞ্চল হয়ে কণ্ঠাগত হয়ে উঠলো! সংসারে আমার বাড়ী-ঘর ধন-ঐশ্বর্য্য জমীদারী—সবই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে; কিন্তু এ-সবের মধ্যে কোথায় যে আমার একটু আশ্রয় হতে পারে, তা ভেবে পেলুম না।

আত্মীয়-স্বজনের ভিতর বিধবা মা ও দুটি ভগ্নী। তারা দুজনেই বিবাহিতা, যে-যার ঘরে স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করছে। তাদের

কাছে গিয়ে তাদের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে একটা দুর্ব্বহ বোঝা চাপাতে ইচ্ছা হল না

আর মা? তিনি আমাদের দেশের বাড়ীতে আছেন। তবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প। একে ত একটু বড় হবার পর থেকেই আমি তাঁর কাছ-ছাড়া। যদি-বা মাঝে মাঝে ছুটি হলে তাঁর কাছে দাঁড়াতে গেছি,—তাতে বিশেষ আমোল পাই নি। তিনি তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা-অর্চ্চনা, ভাঁড়ার, ঠাকুর-ঘর নিয়েই ব্যস্ত। আমরা সহরে থেকে থেকে যে রকম অনাচারী হয়ে উঠেছি,—কখন্ যে কোন্ অসাবধান মুহূর্ত্তে তাঁর শুচিতার সংসার ছুঁয়ে ফেলে নষ্ট করে দেবো, সেই ভয়েই তিনি সর্ব্বক্ষণ শশব্যস্ত! তাঁর এই ভাব দেখে ক্রমে আমিও যথাসাধ্য অন্তরে অন্তরে কাটিয়ে তাঁকে শান্ত মনে থাকবার অবসর দিয়েছি বটে, তবে এর ফলে আমাদের মধ্যেকার স্নেহের বন্ধন শিথিল হয়ে, দু'জনেই যে দু'জনের কাছ থেকে বহু দূরে চলে গেছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই আজ সব-হারা হয়েও মার কাছে একটু আশ্রয় পাবার কথা মনে করে বিশেষ কোন শান্তি পেলুম না। অনেক ভেবে ভেবে শেষ এক জনের কথা আমার মনে পড়লো। সে আমার অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু কিরণ।

ছোটবেলা থেকে আরম্ভ করে কলেজের শেষ পর্য্যন্ত আমরা দু'জনে বরাবর একসঙ্গে পড়েছি, একত্র থেকেছি। আমাদের মধ্যে সেই অবিচ্ছিন্ন সদ্ভাব এখনো পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে। আমি চিরদিনই অত্যন্ত চঞ্চল, আমোদপ্রিয় ও খামখেয়ালি প্রকৃতির। কিরণ ছোট বয়স হতেই শান্ত, গম্ভীর ও মিতভাষী। সে মুখে বেশী কথা বলে না; কিন্তু তার মনের বল অসীম। সে একান্ত সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। বয়সে সে আমার সমবয়স্ক হলেও, কাজে সে

কতকটা আমার অভিভাবকের মত ছিল। আমার প্রতি তার স্নেহও ছিল তেমনি অগাধ,—নিজের ছোট ভাইয়ের মতই সে আমায় ভালবাসতো। পঠদ্দশায় তার ওপর সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভর করে আমি বেশ নিশ্চিন্ত আমোদে দিন কাটিয়েছি। আজ আবার এই পরিশ্রান্ত অবসন্ন মন তার সবল হৃদয়ের স্নেহের আশ্রয়ে কিছু দিন একটু শান্তিতে কাটাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

সেই দিনই তাকে চিঠি দিলাম। তার পরে আবার যাত্রার পালা আরম্ভ হল। শরীর মন আর বয় না। এ ভাগ্য-তাড়িত হতভাগ্যের যাত্রা কোথায় গিয়ে কত দিনে শেষ হবে?

কিরণ আমাকে ঠিক পূর্ব্বের মত গভীর স্নেহে গ্রহণ করলে। প্রথম সাক্ষাতেই সে আমায় তার বুকে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তার পরে গাঢ় স্বরে বল্লে, তোমার যে ক্ষতি হয়েছে,—বন্ধুর জীবনব্যাপী স্নেহ দিয়েও যদি তার কিছুমাত্রও পূরণ হয়, তবে তার ত্রুটি হবে না। এখন থেকে আমরা দু'জনে বরাবর একসঙ্গেই থাকবো। আর কোথাও তোমাকে যেতে দেব না।

বহু দিন পরে আমার অবসাদগ্রস্ত ক্লিষ্ট অন্তর এই স্নেহের স্পর্শে যেন কথঞ্চিৎ শীতল হল।

আবার সেই পাটনা! পাঁচ মাস আগে কিরণের কাছে বেড়াতে এসে, এইখানেই বীণাকে প্রথম দেখেছিলুম। আজ আবার সব শেষ হবার সময়ও অদৃষ্ট-সূত্রে সেইখানেই এসে দাঁড়িয়েছি! এ কথা মন থেকে কিছুতেই যেতে চায় না! সব আশাই ত ছেড়েছি—তবে আর কেন?

এখানে আসার দু'দিন পরে সকালে চা খাবার পর কিরণ বেরিয়ে গেছে,—আমি একলা টেবিলের ধারে বসে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত,—

কার মৃদু পায়ের শব্দ, সে সময় আমার কাণে গেল। ডাকলুম, কে, বেহারা? উত্তর পেলুম না। কে তবে? কিরণ কি এখনি ফিরে এলো! বল্লুম, কিরণ? উত্তর নেই। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কে একজন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে,—তার মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ আমার কাণে আসছে,—তবু সে কথা বলে না কেন? এবার আমি ব্যাকুল ভাবে বল্লুম, কে ওখানে? কিরণ কি? কথা বলছো না কেন? এবার অত্যন্ত মৃদু কম্পিত স্বরে উত্তর হল,—কিরণ এখনো ফেরে নি। আমিই শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। এ কি ব্যাপার? কি এ? আমার একান্ত পরিচিত সেই মধুর স্বর শুনে আমি পাগলের মত চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম,—বীণা? তুমি? তুমি আমায় দেখতে এসেছ? এই কথা বলেই, শব্দ লক্ষ্য করে, তার হাত ধরে আমার কাছে টেনে আনলুম। তার পর হঠাৎ আমার এত দিনের সঞ্চিত বেদনা ও অভিমান অশ্রুর আকারে অবাধে তার মাথায় ঝরে পড়তে লাগলো!

[১০]

সেদিনের মোটর-দুর্ঘটনার কিছুদিন পরে মিঃ ঘোষের অন্তঃপুরে রান্নাঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া ক্ষেমঙ্করী ঠাকুরাণী তরকারী কুটিতেছিলেন। নিকটে বসিয়া পুরাতন দাসী বামা বাগান হইতে সদ্য-আহরিত রাশী-কৃত কুমড়াশাকের পারিপাট্য সাধনে ব্যস্ত ছিল।

মিঃ ঘোষ তাঁহার একমাত্র শিশু কন্যা নির্ম্মলাকে লইয়া প্রায় উনিশ-কুড়ি বৎসর হইতে পাটনায় বাস করিতেছিলেন। দেশের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। দু'পাঁচ বৎসর অন্তর কখনো

কিছু বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে রাজসাহীতে যাইতেন। পাটনা সহরে মিঃ ঘোষ সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁহার উদার ও সদানন্দ প্রকৃতির গুণে ও অসাধারণ দানশীলতায় সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। পরের উপকারে তিনি সদা সমুৎসুক ও দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজের জীবনে বা তাঁহার সংসারের মধ্যে বিশেষ কোন আড়ম্বর ছিল না। নির্ম্মলা একটু বড় হইলে, মিঃ ঘোষ তাহাকে কলিকাতায় বোর্ডিংএ রাখিয়া আসিলেন। পাটনার বাড়ীতে তাঁহার আর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। সেই দেশীয় ভৃত্যবর্গের উপর নির্ভর করিয়া তিনি একাই দিন কাটাইতেন। কেবল যখন দীর্ঘ অবকাশে বোর্ডিং হইতে নির্ম্মলা বাড়ী আসিত, তখন তাঁহার নিরানন্দ নিঃসঙ্গ ভবন উৎসবে ও আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিত। নির্ম্মলা যখন বি-এ পাশ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পাটনায় ফিরিয়া আসিল, তখন মিঃ ঘোষ তাহার সঙ্গে থাকিবার জন্য দেশের বাড়ী হইতে তাঁহার ভগিনী ক্ষেমঙ্করী ও বামা ঝিকে পাটনার বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

নূতন দেশে আসিয়া চারিদিকের অজানা সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের সহিত পিসীমা এখনও নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই; তাই তাঁহার মেজাজটা প্রায়ই অপ্রসন্ন থাকিত। এদেশে বাংলার আজন্ম-পরিচিত বাঙালার নিত্য-প্রয়োজনীয় অর্দ্ধেক জিনিস পাওয়াই যায় না। মানুষগুলার যেমন অদ্ভুত পোষাক, তেমনি তাহারা নোংরা। কথা যে কি বলে, তার যদি মাথা-মুণ্ড কিছু বোঝা যায়! সব-শুদ্ধ যেন একটা কিম্ভূত-কিমাকার কাণ্ড! এ রকম আজগুবী দেশের প্রতি দাদার এমন অসামান্য অনুরাগের যে কি কারণ থাকিতে পারে, বিস্তর গবেষণা করিয়াও পিসীমা তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বামা ঝিও এ বিষয়ে তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিত।

একটি সুবৃহৎ পেঁপের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে সামনের স্তূপাকার শাকের দিকে চাহিয়া পিসীমা বলিলেন, "ফুলগুলো ছিঁড়ে নিয়ে আলাদা রাখ,—দুটো বেশম দিয়ে ওদের ভেজে দেবে। আর খুব নরম দেখে ডগার দিক থেকে দুটি শাক রেখে আর সব ফেলে দে। মালীকে দুটো ডগা কেটে দিতে বল্লুম, তা সে একেবারে ঝাড়ে-মূলে জঙ্গল তুলে দিয়ে গেল,—একটা কথা বোঝে কি ছাই! একে ত এ দেশের শাক-পাতা কিছু মিষ্টি নয়, সব যেন নুন-খরা,—ও আর কতই খাওয়া যায়?"

বামা বলিল, "মিষ্টি হবে কেমন করে? এ কি আর আমাদের দেশের মাটির জিনিস? এখানকার মাটি যে একেবারে রুখখু! শুকনো! ঐ যে বলে শোন না, কাঠখোট্টার দেশ! সে ঠিক কথা,—যেমন মানুষগুলো, তেমনি জিনিস-পত্তর! আমার ত বাছা, এখানকার কিছুই ভাল লাগে না! সেদিন তাই দিদিমণিকে বল্‌ছিলুম, বলি হ্যাঁগা দিদিমণি! তোমরা দেশে-ঘরে যাবে কবে? এমন রাজ-ঐশ্বয্যি ছেড়ে এখানে কি সুখে পড়ে আছ? তা দিদিমণি শুধুই হাসে! বলে, তোর বুঝি এখানে মন টিঁকছে না?"

পিসীমা একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মন টেঁকে না, সে তো সত্যি কথাই। তা উপায়ই বা কি? মা-মরা মেয়েটাকে ফেলে যাবই বা কোথায়? ওরা যত দিন থাকবে, ততদিন আমাদেরও থাকতেই হবে। এই ত এতটুকু বয়স থেকে কোথায় কোন্ দূরদেশে বাপ রেখে এলো,—এতটা কাল পরের কাছেই মানুষ হলো,—একটু আদর-যত্ন পেলে না। এখন যদি-বা কতকাল পরে বাড়ী-ঘরে এলো, এখন কি ওকে একলা ফেলে আর কোথাও তিষ্ঠুতে পারি?"

বামা বলিল, "তা সত্যি পিসীমা! তোমাদের সংসারে ঐ ত

একটা মেয়ে,—কত্তাবাবুর কেমন যে ন্যাকাপড়ার বাতিক! এতকাল ধরেও ব্যাটাছেলেদের মত দিদিমণি পাশ করছে তো পাশই করছে। অ্যাদ্দিন বিয়ে হলে ওর পাঁচটা ছেলে-মেয়ে হয়ে সংসার-সাজানো ভরপূর হয়ে উঠতো। তা না—খালি পড়া আর পড়া! তা এবার ত সে-সব শেষ হল, এবার কত্তাবাবুকে বলে ওর বিয়ে-থাওয়া দাও বাছা! তোমাদের বাড়ী এতটা কাল কাটলো,—কবে আছি কবে নেই,—দিদিমণির বিয়েটা দেখে মরি! তোমাদের বড় ঘর, তাই যা কর, সবই মানায়! আমাদের দেশে, ঘরে অত বড় মেয়ে আইবুড়ো থাকলে জাতে ঠেলে রাখতো!”

পিসীমা এ কথায় ঈষৎ আহত হইয়া বলিলেন, “আমাদেরি কি আর আগেকার কালে ও-সব হবার যো ছিল? ও-সব এখনকার সময়ে হয়েছে। এই ত আমাদের বিয়ে হয়েছিল, সাত বছর বয়সে,—মনেও পড়ে না, কবে বিয়ে হয়েছিল,—এই যে নির্ম্মলা! উঠেছ? আজ কেমন আছে হাতের ব্যথাটা?”

নির্ম্মলা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। এ কয় দিনে তাহার হাতের বেদনা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এখনো হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

পিসীমার কথার উত্তরে সে বলিল, “ভাল আছি পিসীমা! বোধ হয় আর দু' এক দিনের মধ্যেই ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেবে। ব্যথা অনেক কমে গেছে!”

পিসীমা সস্নেহ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তাই হোক বাছা! সেরে গেলেই বাঁচি! সেদিন যে কাণ্ডটা করে বাড়ী ফিরলে—আমি ত ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলুম! আজকালকার যত সব নতুন নতুন সভ্যতা—ততই সব আজগবি বিপদ আপদ সঙ্গে

সঙ্গে লেগেই আছে! সাধে কি আমি ঐ মটোরগাড়ীগুলো দেখতে পারি নে? ওগুলো একেবারে মানুষ-খুন-করা গাড়ী!”

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, “পিসীমা তোমাদের সময়ে কি কেউ কখনো দৈবাৎ পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙতো না?”

পিসীমা বলিলেন, “তা ভাঙবে না কেন বাছা? দৈবি-সৈবি কালে-ভদ্রে অমন এক-আধটা হতে পারে! এ যে দিনের মধ্যে ঐ পোড়া গাড়ীতে দুটো দশটা খুন হচ্ছেই—হচ্ছেই। এমন কি আর সেকালে ছিল? তা মরুক গে ও-কথা! দাদা আজ এখনো উঠলেন না যে? তিনি ত এত বেলা পর্য্যন্ত কোন দিন ঘুমোন না?”

নির্ম্মলা মিঃ ঘোষের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে চাহিয়া বলিল, “এখনো ত ওঠেন নি দেখছি! আজ ক'দিনই তাঁর উঠতে বেলা হচ্ছে! বোধ হয় রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। সেই সেদিনকার পর থেকে বাবার শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই পিসীমা! জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন না, তবে আমার মনে হচ্ছে—”

পিসীমা বলিলেন, “আহা—তা আর হবে না? বেশি চোট না লাগুক—সর্ব্বশরীরে একটা নাড়া পেয়েছ ত? বয়স হয়েছে—এখন একটুতেই শরীর খারাপ হতেই পারে। তা তেমন যদি বেশি কিছু মনে হয়, তো তার একটা ব্যবস্থা করো মা! দাদা ত সদানন্দ ভোলানাথ মানুষ, পরের জন্য প্রাণ দেবে, তবু নিজের কিছু হলে কিছু করতে জানে না!”

নির্ম্মলা পিসীমার নিকট হইতে আসিয়া তাহার ঘরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। আজ কয়েক দিন হইতে সে মিঃ ঘোষের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল। এতকাল তাহার জীবনে চিন্তা বা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন করে নাই; তাই সে সামান্য কারণেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে!

মিঃ ঘোষের চিন্তা ছাড়া আর একটি বিষয় মধ্যে মধ্যে তাহার মনে উদিত হইত। সে চিন্তা অসিতের। যদিও অসিত স্পষ্টভাবে এখানে আসিবে এমন কোন কথা দেয় নাই, তবু কেমন করিয়া যেন তাহার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল, সে নিশ্চয় আসিবে। প্রতিদিনই মনে মনে সে তাহার আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কোন ভৃত্যকে একটু ব্যস্ত-ভাবে আসিতে দেখিলেই, তাহার মন আনন্দে ও উদ্বেগে দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিত! নিশ্চয় সে অসিতের আসার খবর দিতে আসিতেছে! কিন্তু প্রতিবারই সে হতাশ হইত। অসিত বা পরেশ কেহই এ পর্য্যন্ত তাহাদের সংবাদ লইতে আসে নাই।

নির্ম্মলা নিজের মনে এই সকল চিন্তায় তন্ময় হইয়াছিল, সহসা পিছন হইতে লীলার কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া সে মুখ ফিরাইল,—"তোর কি খবর মিলি? খুব বড় রকম একটা অ্যাডভেঞ্চার করেছিস্ না কি?"

লীলা প্রতিদিন প্রভাতে অশ্বারোহণে বেড়াইতে বাহির হইত, আজও সে সেই বেশেই আসিয়াছে। তাহার শ্রমখিন্ন ললাট ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত—হাতে ঘোড়ার চাবুক!

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, "একেবারে বীরবেশে যে দেখছি! সাধে কি আর মিসেস্ দত্ত তোকে তুরুক-সওয়ার বলে? সব সময়ে মর্দ্দানী!"

লীলাও হাসিল, বলিল, "মিসেস্ দত্ত উচ্ছন্ন যাক্! সে কি বলে, না বলে, তা জানবার কোন আগ্রহ আমার নেই,—তোর নিজের কথা কি তাই বল্! হাতে বড় বেশি আঘাত লেগেছে শুনলুম! কেমন আছিস্ এখন?"

নির্ম্মলা কৃত্রিম অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তাই শুনে বুঝি

এই পোনের দিন পরে খবর নিতে এসেছিস্? অত আর দরদে কাজ নেই তোর! বয়ে গেছে তোকে আমার কোন কথা বলতে!" কথা বলিতে বলিতে দুই জনে ঘরে আসিয়া বসিল। প্রভাতের অম্লান সূর্য্যকিরণে তখন কক্ষতল পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লীলা একটু অপ্রস্তুতভাবে নির্ম্মলার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতের দিকে চাহিয়া বলিল, "তা সত্যি ভাই! আমার আরো আগে তোকে দেখতে আসা উচিত ছিল! কিন্তু রোজই আসব আসব মনে করেও কিছুতে বেরুতে পারি নি,—ক'দিন থেকে যে গোলমাল চলছে বাড়ীতে! তা রোজই খবর নিয়েছি কিরণের কাছে—যে তুই ভালই আছিস! না হলে কি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারতুম? সত্যি রাগ করেছিস না কি মিলি?" লীলা দুই হাতে নির্ম্মলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নির্ম্মলা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তুই ত আচ্ছা পাগল দেখছি! একটা ঠাট্টাও বুঝতে পারিস্ না? খামকা এমনি মুখের চেহারা করে তুললি, যেন আমি রাগ করলে তোর একবারে মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে! অথচ এদিকে ত দ[illegible]গিরি কত!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "তা ভাই! আমি দস্যি হতে পারি, তবে মনটা আমার বড় সরল। আমি যাদের ভালবাসি, তাদের ভালবাসা পূর্ণমাত্রায় সব সময়ে পেতে চাই,—না হলে আমার চলে না। তা ছাড়া, একে ত দুনিয়ায় কারো সঙ্গেই আমার বনে না,—বন্ধুর মধ্যে এক তুই আর কিরণ,—তোরাও রাগারাগি করলে আমি আর যাই কোথা বল্?"

নির্ম্মলা বলিল, "যাক্, এখন তো রাগারাগির পালা সাঙ্গ হয়ে

মিটমাট হয়ে গেল,—এখন তোদের বাড়ীতে কি গোলযোগ বেধেছে যে বল্‌ছিলি? কি হয়েছে? আমি ত আজ দু-হপ্তা বাইরে যাই নি,—কোন-কিছু খবর-টবর জানি না,—নতুন কিছু আবার ঘটেছে না কি?"

লীলা অবজ্ঞার সহিত বলিল, "নতুন আবার হবে কি? ওই যে অরুণের খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কি না? তাই মায়ের আর বীণার যত সব বন্ধু-বান্ধবরা সহানুভূতি প্রকাশ করতে আসছেন! বীণার দুঃখে তাঁদের আর ঘুম আসছে না। অথচ বীণার দুঃখটা যে কি, তা তো আমি কিছু দেখতে পাই না! দিব্বি খাচ্ছে দাচ্ছে, ফুর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে। তবে লোকজন কেউ এলেই তার মুখটা বিষণ্ণ হয়, আর চোখ দুটো ছল ছল করে আসে বটে! এই সব ভণ্ডামী দেখলে আমার হাড়ে জ্বালা ধরে! মা তো চব্বিশ ঘণ্টা ভেবেই অস্থির—কি করে বীণা এ আঘাত সামলে উঠবে! এর মধ্যে মজার কথা এই—যে-লোকটা সত্যি সত্যি চোখ হারিয়ে জন্মের মত সব সুখ থেকে বঞ্চিত হল, তার কথাটা কেউ একবার ভুলেও মুখে আনে না! সাধে কি আর আমার বনে না কারো সঙ্গে?"

নির্ম্মলা অনেকক্ষণ কোন কথা বলিল না। বারাণ্ডার কার্ণিসের উপরে বসিয়া কপোতের ঝাঁক অশ্রান্ত গুঞ্জনধ্বনি করিতেছিল। প্রভাতের স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে বাতাসে টবের ফুলগাছগুলা মৃদুমন্দ দুলিতেছিল!

নির্ম্মলা সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া এতক্ষণ পরে অন্যমনে বলিল, "সত্যি ভাই! বীণা-দির যে কি রকম প্রাণ—আমি তাই ভাবি! অরুণ বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ হয় নি,—সামান্য পরিচয় মাত্র হয়েছিল। তবু যখন তাঁর কথা মনে পড়ে, তখন যেন মনটা কেমন

উদাস হয়ে যায়। এত রূপ, এমন গুণ, এমন মহৎ জীবন একটা—সব ব্যর্থ হয়ে গেল! কিন্তু বীণা-দি তাকে অত ভালবেসে তার এমন বিপদের দিনে তাকে কি করে এক কথায় ভুললে? তাই এক এক সময় আমার মনে হয়,—ভালবাসাটা কি এতই স্বার্থপর? মানুষ কি শুধু নিজের সুখ ও সুবিধার জন্যেই ভালবাসে? তোর কি মনে হয়, লীলা?"

লীলার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে আবেগভরে বলিল, "আমার বিশ্বাস—যথার্থ ভালবাসা কখনো এত হীন হতে পারে না। তবে ভালবাসার নাম নিয়ে অনেক মেকি জিনিসও সংসারে চলছে তো? তাতেই এই সব বিকারগুলো অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে। এ সব খাঁটি জিনিস নয়।"

নির্ম্মলা বলিল, "শুধু অরুণ বাবু নয়,—ঐ চৌধুরী, চিনিস্ তো? হালে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে। সে বেচারা যে কি ভালই বাসে বীণা-দি'কে! যদি তার প্রাণ দিতে হয় বীণা-দির জন্যে, তাও বোধ হয় সে হাসিমুখে দিতে পারে। মানুষে মানুষকে বুঝি এত ভালবাসতে পারে না। কিন্তু বীণা-দি সব জেনে-শুনেও তাকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা ও খেলা করে! মানুষের প্রাণ নিয়ে এমন নিষ্ঠুরতা—ছিঃ! আমার এত খারাপ লাগে!"

লীলা বলিল, "তা আমাদের খারাপ লাগলেই বা আর কি করছি বল্? সে নিজে যা ভাল বুঝবে, তাই তো করবে? আর চৌধুরীই বা অমন করে' মরতে যায় কেন? ওরাই তো কুকুরের মত সর্ব্বদা পিছনে পিছনে ফিরে বীণার আস্পর্দ্ধা আরো অত বাড়িয়ে দিয়েছে! আমার ত ঐ অপদার্থগুলোর উপর কোন সহানুভূতি নেই—বরং দেখলে বিষম বিতৃষ্ণা ধরে।"

নির্ম্মলা একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু আমার তো মনে হয় ভাই, চৌধুরী সত্যি অপদার্থ না হতেও পারে। আমার শুধু মনে হয়—ও-বেচারা একেবারে আপনাকে হারিয়ে ভালবেসেছে! বীণা-দি ওর সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক, ওর তাকে ভাল না বেসে আর অন্য উপায় নেই! ও কি বুঝতে পারে না, ওকে কত তাচ্ছিল্য, কত অবজ্ঞা প্রতিদিন সে করছে? তবুও নিজেকে কেন সংযত করতে পারে না? সে শক্তি নেই ওর! এইখানে যে মানুষ কত দুর্ব্বল, কত অসহায়—তা ওর অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়।"

লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "যে আজ্ঞে মাষ্টারমশায়! এ সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মেছে দেখছি! চৌধুরী যা খুসি করুকগে, এখন নিজের কথা একটু বল্ দেখি! কি হয়েছিল সেদিন?"

"সে তো কিরণ বাবুর কাছেই সব শুনেছিস্—আর কি বোলবো বল্? কিরণ বাবু লাফিয়ে পড়েছিলেন, তাই তাঁর লাগে নি। বাবারও বড়-একটা কিছু হয় নি। আমারি হাতটা একেবারে মুচড়ে গিয়েছিল,—তাতেই হাড়ে অত আঘাত লেগেছে! তা এখন অনেক কমে গেছে—ভালই আছি।"

"আর তোদের সেই অরণ্যচারী বন্ধুদের কথা কিছু বল্? কিরণের সঙ্গে ত আর তাদের দেখা হয় নি—সে তাদের কথা কিছু বলতে পারলে না। তা এত জায়গা থাকতে তারা সেখানে থাকে কেন ভাই? কেমন যেন একটু বোধ হয় না? তোর তাদের কেমন লাগ্‌লো?"

নির্ম্মলার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তা আমি কি করে বোলবো? তবে একটুকু মনে হয়, তাঁরা দুজনেই

অত্যন্ত ভদ্র ও উন্নত-প্রকৃতি ;—যতক্ষণ আমরা ছিলুম, যতদুর সাধ্য—আমাদের যত্ন করেছেন। আর ছিলুম তো ঘণ্টাখানেক,—তাও হাতের বন্ধনাদিতে প্রাণ তখন অস্থির, সে সময় আর কি-ই বা জানতে পারি বল্ ?”

লীলা এ কথায় বিস্মিত হইয়া বলিল, “কেন ? আর কি তাঁদের সঙ্গে তোর দেখা হয় নি ? এত দিনের মধ্যে তোদের খোঁজ খবর নিতে তাঁরা কি একবারও আসেন নি ?”

নির্ম্মলা এ প্রশ্নে কেন যে নিজেকে বিব্রত বোধ করিল, তাহা সে নিজেই বুঝিল না। কুণ্ঠিত ভাবে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, “কই আর এসেছেন ? বাবা, কিরণ বাবু, সকলেই ত বারবার অনুরোধ করেছিলেন আসার জন্যে। আমিও একবার বলেছিলুম। কিন্তু তাঁরা ত কেউ আসেন নি।”

লীলা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “ভারি আশ্চর্য্য ত ! কিন্তু এটা ভাই তাঁদের অন্যায় ! অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও তাঁদের একবার খবরটা নেওয়া উচিত ছিল।”

এ চিন্তা নির্ম্মলার অন্তরে অন্তরে সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে পীড়া দিতেছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে উদাসীনভাবে বলিল, “অন্যায় আর কি ? হয় ত তাঁরা এখানে নেই,—হয় ত আর কোন কারণ থাকতে পারে। যাঁদের কথা কিছুই জানি না, তাঁদের বিষয় বিচার করতে না যাওয়াই ভালো।” তার পর সে একটু হাসিয়া বলিল, “বিশেষ, এ থেকে বোঝা যায়, তাঁরা মানুষের মত মানুষ,—সাধারণ পুরুষ জাতির মত একটা মেয়ের মুখ দেখলেই মূর্চ্ছা যান না, কিংবা পরিচয় করবার একটা সুযোগ পেলেই তাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ক্ষেপে ওঠেন না। এটা ভাল নয় কি ?”

লীলা হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "ভাল হয় ত হতে পারে। কিন্তু তুই তাদের জন্য এত ওকালতি করে মরছিস কেন বল্ দেখি? কিছু গোলযোগ বাধাস্ নি তো?" সহসা নির্ম্মলার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া সে থামিয়া গেল; বলিল, "না ভাই মিলি! রাগ করিস্ নি! আমি ঠাট্টা করছিলুম! জানোয়ার দেখে দেখে আমার তো বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, একজন সত্যিকার মানুষ দেখতে পেলে আমিও তোর চেয়ে তাঁকে কিছু কম শ্রদ্ধা করবো না। কিন্তু আজ উঠি ভাই! অনেক বেলা হল! তুই তো এখন ভাল আছিস্—বিকেলে আমাদের ওদিকে যাস্ না! বাড়ী বসে বসে কি করিস্! খেলতে না পারিস্, একটু বেড়িয়ে গল্প টল্প ক'রে চলে আস্‌বি। কেমন, যাবি আজ?"

নির্ম্মলা বলিল, "দেখি ভাই! বাবা যদি যান, তা হলে যেতে পারি। না হলে তাঁকে একলা ফেলে—"

"কেন? কেন? কাকা যাবেন না কেন? কোথায় তিনি? ভাল আছেন তো?"

"ভাল বিশেষ নেই। ক'দিন থেকেই তাঁর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। ওঠেন নি এখনো।" লীলা উঠিয়া বলিল, "তা হলে আজ আর তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। তোরা বিকেলে যাস্ তো—ভাল, নয় তো আমি আবার আসবো!"

[১১]

কিরণ তাহার কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার শুলঘরের বারাণ্ডায় লীলা একা দাঁড়াইয়া আছে।

"এই যে! কতক্ষণ এসেছো? দেখা হলো অরুণের সঙ্গে?" হাসিমুখে নিকটে আসিয়া কিরণ প্রতিদিনের মত তাহার হাত ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। লীলা কিন্তু আজ আর তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। কিরণকে দেখিয়াই তাহার বুকের মধ্যে অত্যন্ত কাঁপিতেছিল। তাহার মুখ একেবারে রক্তশূন্য, সাদা! সে মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে দৃষ্টি নামাইয়া কম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিরণ! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এসো—একটা নিরালা জায়গায় বসে সব বোলবো!"

কিরণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। লীলার তেজোময় মূর্ত্তিই তাহার চির-পরিচিত,—লজ্জা ও সঙ্কোচে-ভরা নতশির, এ রূপ তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। তাহার হাসিমুখ শুকাইয়া গেল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সে বলিল, "ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে—লিলি?"

মুখ নীচু করিয়া লীলা বলিল, "আমি একটা বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি! তুমি যে আমায় কি বলবে, আর সকলেই বা কি বলবে, আমি তাই ভাবছি।"

কিরণ অস্থির হইয়া উঠিল। লীলা অন্যায় কাজ করিয়াছে। এ কি সম্ভব? এমন কি কাজ করিতে সে পারে, যাহার জন্য সে নিজে এমন কুণ্ঠিত ও কাতর হইয়া পড়িয়াছে? অত্যন্ত আকুল হইয়া সে বলিল, "এমন কি অন্যায় করেছ তুমি? এসো—এইখানে বসে সব বল দেখি? কি হয়েছে?"

দুজনে বারাণ্ডার শেষ প্রান্তে একটা বেঞ্চের উপর বসিল। অদূরে একটা অশ্বথ গাছের মোটা ডালে দড়ীর দোলনা ফেলিয়া মালীর পুত্র গিরিধারিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে দুলিতেছিল। লীলা তাহার ম্লান নেত্রের কুণ্ঠিত দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল,

"আমি সত্যই বড় অন্যায় কাজ করেছি, কিরণ! কিন্তু কেন যে করেছি, সে সবই তোমায় বুঝিয়ে বলছি—সব কথা শুনে তুমি আমার অবস্থাটা বুঝে দেখো। আজ সকালে অরুণের সঙ্গে আমার দেখা করতে আসবার কথা ছিল—সে তো তুমি জানই। আমি নিজেই ইচ্ছে করে এ দুঃসাহসের কাজ করতে সঙ্কল্প করেছিলুম,—কারো বারণ বা যুক্তি কিছুই শুনি নি। কিন্তু যখন তোমার বাড়ীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম, তখন কেমন একটা অজানিত কুণ্ঠা ও সঙ্কোচে আমার বুকের ভেতর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমি ভাবছিলাম, জীবনে কোন দিন যাকে চোখেও দেখি নি, যার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধই নেই, সেই একজন অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি, এমন অদ্ভুত খেয়াল কোথা হতে আমার মাথায় ঢুকলো! আজকের এ খেয়ালের শেষ ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তখন মনে হচ্ছিল, কেন তোমার বারণ শুনলুম না? তার পর আর একটা কথা এই যে, আমাদের প্রথম পরিচয়টা কি ভাবে হবে? আমি যে কি বলে নিজের পরিচয়টা দেব—তার অনেক রকম মহড়া দিতে দিতে যাচ্ছিলুম। হেসো না তুমি—আমি সব কথাই বলছি তোমায়, ভাবলুম বলবো—'আমি বীণার বোন—লীলা। আপনি আমায় কখন দেখেন নি, তবু আপনি এখানে এসেছেন শুনে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। পরে হয় ত আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে।' আবার ভাবলুম—এই রকম বলি—'আমার অনধিকারপ্রবেশের জন্য মাপ করবেন। বীণার কাছ থেকে আপনার জন্য একখানা চিঠি এনেছি।' প্রথম পরিচয়টা যে কি ভাবে দেবো, সেটা অনেক বার অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখস্থ করতে করতে যাচ্ছিলুম। ভাঙা-গড়া

সমানে চলছিল, কারণ, কোনটাই মনের মত হচ্ছিল না। যা হোক, বাড়ীর কাছাকাছি আসতে একটা কিছু স্থির করে ফেলা গেল। কিন্তু তখন আর একটা বিপদ এই হল যে, যতই তোমার বাড়ীর কাছে আসি, ততই ব্যাপারটা এত অদ্ভুত ও লজ্জাকর মনে হতে লাগলো, যে আমি ভাবতে লাগলুম, ফিরে যাই—আর গিয়ে কাজ নেই।"

বলিতে বলিতে লীলা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। বাগান হইতে পাখীদের গান শোনা যাইতেছে। গাছের পাতা কাঁপাইয়া শির-শির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। তাহার মৃদু হিল্লোলে বাগানের পুষ্পিত লতা ও দীর্ঘ ঘাসের শ্রেণী কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুলিতেছিল। কিরণ কোন কথা না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া ছিল। সে স্থির করিতে পারিল না—এবার তাহাকে কোন্ কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

অনেকক্ষণ পরে লীলা আবার বলিতে লাগিল, "হয় ত ফিরে গেলেই ভাল করতুম। কিন্তু তুমি ত আমার স্বভাব জানোই—যা ধরবো, তা আমায় করতেই হবে, না হলে আমার নিজের কাছ থেকে নিজেরি নিষ্কৃতি নেই। তাই সব লজ্জা সঙ্কোচ চেপে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে এসে পৌছলুম। একজন সহিস এসে আমার ঘোড়াটা ধরতে, আমি তাকে অরুণের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে আমায় তার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে বারাণ্ডায় উঠে, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালুম। সে তখন টেবিলের ধারে বসে মাথায় হাত রেখে হয় তো কিছু ভাবছিল।

"আমি খুব আস্তেই ঘরে ঢুকেছিলুম, কিন্তু আমার সেই মৃদু পায়ের শব্দ তার কাণ থেকে এড়ায় নি। সে চমকে উঠে কে এসেছে জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো—'কে—বেহারা?' আমি তখন

থতমত খেয়ে গেলুম। বুকের ভিতর তখন এত কাঁপছিল যে, কোন কথা বলতে পারলুম না! সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বল্লে—'কে ওখানে? সাড়া দিচ্ছ না কেন?' কিন্তু আমি তখন কি বোলবো? আমি যা-কিছু মুখস্থ করে এসেছিলুম, সে সবই ভুলে গেলুম। শুধু আত্মবিস্মৃত হয়ে নিঃস্পন্দের মত তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তার তরুণ যৌবনের শোভা-সম্পদে-ভরা মুখ, আর সেই মুখে—সেই বড় বড় কালো চোখে কি শূন্য লক্ষ্যহীন দৃষ্টি! সে যখন—কে এসেছে, জানবার জন্যে তার অন্ধ নয়নের ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাইছিল, তখন একটা অব্যক্ত যাতনায় আমার চোখ ফেটে জল ঝরতে লাগলো! এদিকে আমায় নীরব দেখে সে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে বলে উঠলো, 'কিরণ, তুমি কি এখনি ফিরে এলে! কথা বোলছো না কেন?' এবার আমি থতমত খেয়ে বলে ফেল্লুম, 'কিরণ এখনো ফেরে নি, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি?' আমি এই কথা বলবামাত্র সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠলো, 'এ কি? বীণা! তুমি আমায় দেখতে এসেছ!' এই কথা বলেই চক্ষের নিমেষে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো!"

কিরণ এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিল। সে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "সে কি! তোমাকে বীণা বলে সে কি করে ভুল করলে? এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

লীলা বলিল, "সেই ভুলেই তো এত কাণ্ড ঘটলো! সে আমায় কাছে বসিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো! আমার আগে থেকেই মন বিপর্য্যস্ত হয়ে ছিল। তারপর এই আকস্মিক ব্যাপারে আমি এমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম যে, তাকে কোন কথা বলবার বা বাধা দেবার আমার কোন শক্তি থাকলো না। খালি মনে হচ্ছিল—অরুণ

এ কি করল! তার পরে ক্রমশঃ আমার মনে পড়তে লাগলো, বীণার ও আমার আকৃতি, গঠন ও গলার স্বর প্রায় একই রকম। অন্ধকারে থাকলে বাড়ীতে প্রায়ই একজনকে আর একজন বলে লোকে ভুল করতো। দরজার বাইরে থেকে কথা বল্লে—কে লীলা, আর কে বীণা অনেক সময় বোঝা যেত না!"

কিরণ অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, "যাক্‌গে সে কথা। তারপরে তুমি নিজের পরিচয় দিয়ে তার সে ভুলটা ভেঙে দিয়েছ তো? তা হলেই হলো। তারপর কি বলছিলে বলো—কি হল তার পর?

লীলা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "সেই কথাই তো বলছি, তুমি শুনে যাও। তার পরে আমি নিজে একটু প্রকৃতিস্থ হতেই, তার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে বসলুম। তাকে নিজের পরিচয় দেব বলে তার মুখের দিকে চাইতেই হঠাৎ আমার স্বর বন্ধ হয়ে এলো!

"আমি দেখলুম, আমাকে বীণা বলে ভুল করে তার মনে কি বিপুল আশা ও আনন্দ আবার জেগে উঠেছে! যখন প্রথম তাকে দেখি, তখন দেখেছিলুম, যেন সে-মুখে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না,—হতাশা ও বেদনায় মণ্ডিত সে কি বিষণ্ণ, কি মলিন সে মুখ! কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মধ্যে যে কি পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, সে আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না, কিরণ! সে যেন নতুন জীবনে, স্ফূর্ত্তিতে, নতুন উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠলো! সে নিজে নিজেই পাগলের মত বকছিলো—'ওঃ! তুমি তা'হলে আমায় ভোল নি বীণা? আবার তবে তুমি আমার কাছেই ফিরে এলে? তুমি বোধ হয় আমার সে চিঠিখানা পেয়ে কত ব্যথা পেয়েছ, আমাকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ভেবে হয় তো কত কেঁদেছ! কিন্তু সত্যি বলছি বীণা, সে চিঠিখানা আমি

লিখেছিলুম, শুধু শুষ্ক কর্ত্তব্যের খাতিরে, আর ঘোর নিরাশায়। তোমাকে এ অবস্থায় নিজের সঙ্গে জড়িত করে কষ্ট দিতে কিছুতেই ইচ্ছে ছিল না, তাই। না হলে মন যে আমার তোমায় কাছে পাবার জন্য কি তৃষিত, কি আকুল হয়েছিল, সে আমি তোমায় কি করে বোঝাবো? তুমি আবার আমার কাছে ফিরে এসেছো, এতে যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে, সে অন্তর্যামী যিনি—তিনিই জানছেন!'

"সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে এই রকম পাগলের মত বকে যাচ্ছিল। আমি তাকে কি করে তখন বলি, 'ওগো! তোমার ভুল হয়েছে! বীণা আর তোমায় চায় না, সে তোমার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে, তার কাছে আর কিছুর আশা করো না তুমি!' যে জীবনের সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে,—এই ক্ষীণ আশার আলোটুকু তার কোন্ প্রাণে আমি নিবিয়ে দেব? আমি জানি, আমার অন্যায় হচ্ছে, তবু আমি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি, কিরণ! আমি তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেছি, যে, সে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বীণা বলেই জেনেছে ও সেই আনন্দে বিভোর হয়ে আছে!"

"লিলি!" কিরণ সহসা উদ্দীপ্ত ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া লীলার মুখের দিকে চাহিল।

লীলা একবার তাহার দিকে চোখ তুলিয়াই তখনি মাথা হেঁট করিল। তাহার মুখ তখন একেবারে রক্তশূন্য, বিবর্ণ। কেবল তাহার পাতলা লাল ঠোঁট দুটি অত্যধিক আবেগে কাঁপিতেছিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া কিরণ অত্যন্ত কঠোর স্বরে বলিল, "আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, তুমি কি করে এমন কাজ করলে?"

লীলা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিয়া উঠিল, "না—না; কিরণ! তুমি আমার উপর রাগ করতে পাবে না! আমি মায়ের মুখের সামনে

এর জবাবদিহি করতে পারবো, বাবার মুখের উপর তর্ক করতে পারবো, কিন্তু তুমি—তুমি—আমার একমাত্র বন্ধু,—আমার বড় প্রিয় তুমি; আমার উপর তুমি রাগ করে থাকবে, সে আমি কোন মতে সহ্য করতে পারবো না!"

কিরণ লীলার এ আকুলতায় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সে বলিল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না—কি করে তুমি এমন নির্লজ্জ কাজ করলে? একবার ভেবে দেখলে না,—সে কত বড় দুঃখী—কত বড় অসহায়, ভাগ্যবঞ্চিত! সে কারু খেয়াল বা খেলার পাত্র নয়। এত বড় প্রতারণা তাকে করতে পারলে, তুমি? তোমার নিজের মুখে শুনেও এ-কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না যে আমার! তুমি এমন কাজ করলে?"

লীলা তাহার সজল চোখ দুটি তুলিয়া করুণ দৃষ্টিতে কিরণের মুখের দিকে চাহিল; বলিল, "আমি তোমায় বড় উত্যক্ত করেছি কিরণ! তোমার তিরস্কার এখন আমার সহ্য করতেই হবে।"

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিল। কিরণ ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও দারুণ বিরক্তিপূর্ণ হৃদয়ে লীলার এই বিসদৃশ আচরণের কথা ভাবিতেছিল। আর লীলা তাহার নিজের হৃদয়ের এ দীনতা দেখিয়া নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে! সে যে চিরদিন নিজের ইচ্ছামত চলিয়া নিজের খেয়ালমত কাজ করিয়া, নিজের দর্পে চলিয়া আসিতেছে,—সে ত কোন দিন কাহারও বিরাগ বা অসন্তোষের কিছুমাত্র ধার ধারিত না,—আজ তাহার এ কি হইল? কিরণের সুমুখে সে যে মুখ তুলিতে পারিবে না, তাহার বিরক্তির ভয় যে তাহাকে এমন আকুল করিয়া তুলিবে, তাহাই কি সে পূর্ব্বে ভাবিতে পারিয়াছিল?

মৃদু দোলায় অলস নিশ্চিন্তভাবে গিরিধারীকে দুলিতে দেখিয়া

তাহার বন্ধু সুখনের মনে অনিবার্য্য কৌতুকস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে পিছন দিক হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া সহসা প্রাণপণ বলে গিরিধারীকে এক ঠেলা দিয়া বিষম জোরে দোলাইয়া দিল।

গিরিধারী তখন অতি আরামে দুলিতে দুলিতে চক্ষু মুদিয়া বয়স্কদিগের অনুকরণে একটি প্রচলিত ঝুলনের গান গাহিতেছিল—'পিয়া গাঁয়ে পরদেশীয়া, না লিখে পাতি রে—হয়ি'!'

অকস্মাৎ প্রবল দোলায় সবেগে দুলিয়া উঠিয়া, সে পতনের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, তাহার বিরহ-গীতি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই, তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'মায়ী-রে মায়ী!'

সুখন হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া, হাততালি দিতে দিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে মালীর কুটীর হইতে মালীগৃহিণীকে—'কউন্ গুলাম কা বেটা রে' বলিতে বলিতে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে আসিতে দেখিয়া, সে বেচারা অকাল রসভঙ্গে সহসা বিপরীত দিকে চম্পট দিল।

গিরিধারীর চীৎকারে সচেতন হইয়া কিরণ বলিল, "কথাটা ভাল করে" ভেবে দেখ লীলা! দয়া, সহানুভূতি, মমতা—এ সবই খুব ভাল জিনিস। কিন্তু সব জিনিসেরই সীমা আছে। মাত্রা ছাড়ালে ভাল জিনিসেরও কোন মর্য্যাদা থাকে না। তুমি যে পথে চলেছ, তা অত্যন্ত অসম্মানকর। তোমার নিজের সম্মানের পক্ষে। তা ছাড়া, অরুণের প্রতি এটা যে কত বড় অত্যাচার, তা তুমি বুঝতে পারছ না? যে অনিবার্য্য নিরাশা ও ব্যথা তাকে সহ্য করতেই হবে, সেটা প্রথম থেকে অভ্যাস করাই ভালো। দুদিনের জন্য তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মিছে নতুন করে তাকে কষ্ট দেবার কি সার্থকতা আছে—আমি ত কিছু বুঝি না।"

লীলা পুষ্পিত চন্দ্রমল্লিকার গাছে বাতাসের খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল, "আমি শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখেছি কিরণ! আমার সম্মান যাতে নষ্ট না হয়, আর তার প্রতিও কোন অন্যায় যাতে না হয়, তুমি আসবার আগে আমি সে-সব কথাই ভেবে দেখেছি।"

"অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত সে তোমাকে বীণা বলেই জানবে, আর তুমি তাকে বিয়ে করবে—এই তো?" কিরণের স্বর আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

লীলা বলিল, "আমার এখনো আশা আছে,—আর কিছু দিন ভেবে দেখলে বীণা তার মত বদলাবে। ততদিন আমি এই ভাবেই এসে মাঝে মাঝে তাকে দেখে যাব। আর যদি কিছুতেই বীণা না বোঝে, তা হলে অরুণকে বিয়ে করতেও আমার কোনও আপত্তি নেই। কারণ, আমি তাকে ভালবাসি!"

"ঐখানেই তোমার ভুল! তুমি কখনো তাকে ভালবাস না।"

"নিশ্চয়ই! আমি অনেক ভেবে বুঝে দেখেছি, আমি তাকে ভালবাসি, যথার্থই ভালবাসি।"

"কখনও না!" অত্যন্ত রাগিয়া কিরণ বলিল, "তোমার দয়া ও সহানুভূতি—এই দুটোকেই ভালবাসা বলে চালাতে চাচ্ছ, আর নিতান্ত নির্ব্বোধের মত একটা কাজ করছো! আমি কখনো এ-সব কাণ্ড ঘটতে দেব না।"

লীলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে কিরণের মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি কাতর মিনতি-ভরা। সে বলিল, "কিরণ! তুমি আমার এত দিনের বন্ধু হয়ে আজ আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করবে?"

"আমি তোমার বন্ধু—তাই তুমি না বুঝে যে অন্যায় কাজ করেছ, সময় থাকতে তার প্রতিকার করবার অধিকার আমার আছে। আমি

অরুণকে সব বুঝিয়ে বলবো। তার কষ্ট হবে বলে সে সময় তুমি তাকে কোন কথা বলতে পার নি, এ কথা শুনলে সে আর কিছু মনে করবে না। সে মানুষ,—মানুষের মতই তাকে তার নিরাশার কষ্ট মাথা পেতে নিতে ও সহ্য করতে দাও ; তুমি নিজে থেকে কেন বুঝছো না—এ কাজটা কত খারাপ হচ্ছে ?”

লীলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, “আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারছি না। তোমার মধ্যস্থতার ফলে যে বেচারা এত কষ্ট পেয়েছে, তাকেই আবার নতুন করে যাতনা সহ্য করতে হবে। তুমি জানো—তার দুর্ভাগ্য আমার কাছে তোমাদের মত তুচ্ছ বিষয় নয়! তোমাকে কিংবা আর কাউকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাকে আমি দুঃখ দিতে পারবো না!”

বলিতে বলিতে লীলার মুখের স্বাভাবিক জ্যোতিঃ ফিরিয়া আসিল। সে তেজে গর্ব্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া স্থির চক্ষে কিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, “জানো তুমি—আমি নিজেই নিজের প্রভু,—আর কারু মত বা ইচ্ছা অনুসারে চলা আমার স্বভাব নয়! অরুণের কাছে আমি নিজে একদিন সব স্বীকার করবো। আর সব শুনেও সে যদি আমায় চায়, তা হলে তাকে সুখী করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবো। আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজে স্থির করে নিয়েছি,—আর কারু তাতে কথা বলবার কি অধিকার? তোমার কাছে শুধু আমি এই চাই যে, আমার বলবার আগে তুমি তাকে কোন কথা ভাঙবে না। এখন যদি তুমি আমায় বঞ্চনা করো—আমি যাবজ্জীবন তোমায় ঘৃণা করবো। জানো ত? আমি তোমায় কত ভালবাসি?”

“আমি জানি না! জানবার দরকারও নেই! তুমি যদি তোমার ইচ্ছামত চলো, আমার বলবার অধিকার কি!”

কিরণ রাগে মুখ অন্ধকার করিয়া বারাণ্ডায় পায়চারী করিতে লাগিল।

লীলা এক মুহূর্ত্ত তার সেই বিমুখ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আজ তার এ কি পরাজয়ের দিন! তাহার মনের বল, দর্প—সবই যে ভাসিয়া যাইতে চলিল! কিরণ রাগ করিয়া দূরে থাকিলে, সে যে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না!

লীলা আবার তার সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া কিরণের কাছে গেল। বলিল, "কিরণ! তুমি রাগ করে যাই বল, না,—আমি তোমায় সত্যই ভালবাসি,—তোমার কাছে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারি নি। আজও তোমায় সব খুলে বল্লুম। এখন যদি তুমি অন্যায় জিদ করে অরুণকে কষ্ট দাও, তা হলে জীবনে কখনো আমি তোমার মুখ দেখবো না। কিন্তু এখন,—এখন আমার এই সঙ্কটের সময় তুমি কি আমার একটা কথাও রাখবে না, কিরণ? এমনি করে এত সহজে আমায় দূরে সরিয়ে দেবে?" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে লীলার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিরণ তখনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বল, কি বলবে?"

"শুধু বিশ্বাস কর,—আমি চুরি করে বীণার প্রাপ্য ভালবাসা তার কাছ থেকে নিতে আসি নি। তার কষ্ট ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই এ কাজ করেছি। যতদিন না আমি নিজে থেকে তাকে সব কথা বলি, তত দিন তুমি চুপ করে থেকো। আমি মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যাবো। তাতে আমার বা তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। বল আমার কথা রাখবে?"

কিরণ অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "তোমার এ কথায় আমার সমস্ত মন থেকে বিদ্রোহ জেগে উঠছে! আমি শুধু এইটুকু বলতে

পারি যে, এ ব্যাপারের সবটারই আমি প্রতিবাদ করি। তুমি প্রতারক, ঠক,—তুমি স্বেচ্ছাচার করছো। তুমি এখন আর সে লীলা নেই, কাজেই তোমার সঙ্গে আমার আর আগেকার সে ভাব থাকতে পারে না। এ রকম স্বেচ্ছাচার কেউ সহ্য করতে পারে না।”

এবার লীলাও অত্যন্ত রাগিল। সে বলিল, “স্বেচ্ছাচার কি রকম! যা ইচ্ছে তাই বলতে সুরু করেছ যে দেখছি?”

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সমান উত্তেজিত ভাবে কিরণ বলিল, “তা নয় তো কি? তুমি আজ যে কাজ করেছ, কোন ভদ্রকন্যা কখনো করা ছেড়ে তা ভাবতেও পারে না। তুমি একজন অচেনা পুরুষের সঙ্গে নিজে উপযাচক হয়ে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করেছ,—এ কথা মনে করে আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি! শেষে হয় তুমি তাকে বিয়ে করে এই কুৎসিত ব্যাপারের শেষ করবে, আর নয় ত দেখবে—তুমি একটা নিতান্ত আত্মসম্মান-জ্ঞান-শূন্য সাধারণ স্ত্রীলোকের অধম। যে খেলা তুমি খেলছো, তার শেষ ফল ও পরিণাম এই!”

লীলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে খানিক চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তার পর জোর করিয়া মুখ তুলিয়া সহজভাবে বলিল, “চুলোয় যাক ও কথা! তুমি কি ভাববে না ভাববে, সে ভাবনায় আমার কোন দরকার নেই। এখন বল—তুমি আমার কথা রাখবে কি না?”

কিরণ অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এত কথা—এত তর্ক—এত অপমান—তবুও সে তাহার জেদ ছাড়িবে না? কি অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে! অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে বলিল, “কাজেই—না রেখে উপায় কি!”

[১২]

একটা অজ্ঞাত বিষাদের ভার হৃদয়ে লইয়া লীলা বাড়ী ফিরিল। কিরণকে সে গ্রাহ্য করে না, সে কথা তো সে তাহার মুখের উপরই শুনাইয়া দিয়া আসিল, তবু তাহার মনের ভার যায় না কেন? একটা প্রবল অশ্রুর উচ্ছ্বাস কেবলই বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে!

বাড়ীতে লীলার সুখ-দুঃখের সঙ্গী কেহ ছিল না। সে সকলের নিকট হইতেই দূরে থাকিত;—তার প্রিয় কুকুরটিই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। লীলার যাহা কিছু বক্তব্য থাকিত, সে সবই সে তাহার জিম্‌কে শুনাইত। জিমও এ সময় গম্ভীরভাবে কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিত।

বাড়ী ফিরিয়া লীলা আহত হৃদয়ে নিজের ঘরে গিয়া তাহার টেরিয়ারকে কোলে তুলিয়া লইল। সে কিরণের উপর রাগ করিয়া তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিবার জন্য জিমের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "যাক্, তুমি যে আমার কাছে আছো, এই ভালো—কিরণ উচ্ছন্নয় যাক্ গে! কেনই বা তার জন্যে ভেবে মরা? কি বলো? সে না হলে কি আমার আর দিন চলবেই না?"

জিম এ কথায় তাহার সম্মতি জানাইবার জন্য একবার ঘক করিয়া ডাকিয়া লেজ নাড়িল। লীলা বলিতে লাগিল, "তার কথা আমি আর মনে আনতে চাই না, আমার আর একটি নতুন বন্ধু হয়েছে জানো? তোমায় নিয়ে যাব এক দিন তার কাছে! সে বড় ভালো! বুঝেছ ত? সে তোমায় খুব ভালবাসবে! তুমিও তাকে ভালবেসো—কেমন?"

জিম্ লীলার হাত চাটিয়া এ কথায় সায় দিল। তার পর একটি দীর্ঘ হাই তুলিয়া কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

লীলা মুখে যাই বলুক, সমস্ত দিন লজ্জা তার মনে গুরু ভারের মত চাপিয়া রহিল। সে যথার্থই একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে! এ কথা সে আগে বুঝিল না কেন?

কিরণের সম্মুখে সে তাহার সহিত যথেষ্ট তর্ক করিয়াছে। তাহার এ কাজে যে কোন দোষ নাই, সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই যে সে এ কাজ করিয়াছে, তাহা সে বার বার প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু এখন একলা ঘরে বসিয়া নিজের মনে সে আজ সকালের ব্যাপার যতই আলোচনা করিতে লাগিল, ততই নিজের প্রতি লজ্জা ও ধিক্কারে সে যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল।

সে যে দিকটা হইতে এ রকম ভাবে এই কাজটার সম্বন্ধে বিচার করিতেছে, সামাজিক হিসাবে অপর কেহই সে ভাবে ইহাকে দেখিবে না। সমাজের লোকে কোন বিষয়ের উদ্দেশ্য দেখিয়া বিচার করে না। তাহারা শুধু বাহিরের কাজটাই দেখে, আর দেখে, সমাজে যে সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কাজটা ঠিক সেই ব্যবস্থা মত হইয়াছে কি না। লীলা ত এত দিন এই সব তুচ্ছ বিধি, ব্যবস্থা, সংস্কার সব উড়াইয়া দিয়া নিজের মতে সদর্পে চলিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার সব দিক হইতে এ কি পরাজয়! সেই সংস্কারের লজ্জাই ত আজ তাহাকে এত পীড়া দিতেছে!

কিরণ সত্য কথাই বলিয়াছে। সে নিজে উপযাচিকা হইয়া একজন অপরিচিত যুবকের কাছে গিয়াছে এবং প্রতারণা করিয়া তার ভালবাসা ও আদর গ্রহণ করিয়াছে! লীলা একলা ঘরে আরক্ত

হইয়া দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইল! যে [illegible]ব, কি বলিবে সে? তাহার মা যদি শোনেন?

লীলা শিহরিয়া উঠিল! কি খেয়াল যে তখন তাহার মাথায় চাপিয়াছিল! কি করিয়া সে এমন অসম্মানের কাজ করিতে পারিল! তাহার মা তাহাকে সর্ব্বক্ষণ নির্লজ্জ ও অভব্য বলিয়া শাসন করেন; কিন্তু সেই নির্লজ্জতার সীমা যে কতদূর সে অতিক্রম করিতে পারে, ও করিয়াছে, তাহা তিনি হয়ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না! লীলা চিরদিন বীণা ও তাহার মত অন্য সমস্ত মেয়েদের নির্জ্জীব পুতুল বলিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিয়া বেড়াইত, আজ তাহার ফল ফলিল! তাহারা এমন কাজ করা দূরের কথা—কখনো মনেও আনিতে পারে না! এ কথা প্রকাশ হইলে সে কেমন করিয়া সমাজে মুখ দেখাইবে? আজ সর্ব্বপ্রথম নিজের উদ্দাম ও একরোখা স্বভাবের কথা মনে করিয়া লীলা লজ্জা ও বেদনা অনুভব করিল।

কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ফিরিয়া আসিবার আর কোন উপায় নাই! এক যদি বীণা ফেরে, তবেই সব ঢাকা পড়িয়া যায়! কিম্বা তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া অরুণ যদি তাহাকে ক্ষমা করে! লীলা ত তাহার বঞ্চনার মূল্য শেষ পর্য্যন্ত দিতে সম্মত আছে!

অরুণের কথা মনে আসিতেই লীলার মনের সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত লজ্জা ধীরে ধীরে দূর হইয়া গেল। অরুণের সেই হর্ষে, পুলকে, আনন্দে উজ্জ্বল মুখের ছবি মনে পড়িয়া তাহার নিজের মনও একলা বসিয়া বসিয়া এই নির্জ্জন ঘরে কোন্ অজানিত ভাবের প্রভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিল! সে অরুণকে ভালবাসে! আজ সে তাহার জন্য নিজের অন্তরে যে ভাব অনুভব করিতেছে, আগে ত কখনও আর কোন পুরুষের জন্য সে এমন করিয়া ভাবে নাই।

অন্ধ অক্ষম অরুণকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া সে তাহার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের সহিত নিজেকে মিলাইয়া তাহার ভার বহন করিয়া সংসার-পথে চলিয়াছে,—কল্পনানেত্রে এ দৃশ্য দেখিয়া লীলার চিত্ত অপার আনন্দে ও করুণায় ভরিয়া গেল! আহা!. সে দুঃখী, সে অসহায়! আজ বিপদের দিনে তাহার চারিদিকের বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সহানুভূতি, প্রেম—সব বন্ধন এক মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িয়াছে! আজ সে সংসারে একলা—নির্ব্বান্ধব, অসহায়! লীলা নিজের ইচ্ছায় তাহার কাছে গিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহার হৃদয়ের অটল ও একনিষ্ঠ প্রেমের আশ্রয়ে সে আবার অরুণের নিরাশ অন্ধকার জীবনে আশা ও প্রেমের আলো জ্বালাইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবে! ইহাতে আর কাহারও কোন কথা বলিবার কি অধিকার?

লীলার অন্তর হইতে কেবল একটি মাত্র কথা বার বার ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছিল! সে নিজের মনে চক্ষু মুদিয়া অস্পষ্ট স্বরে মনের সেই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া লইয়া বলিল, "অরুণ আমার! সত্যই একান্ত আমার সে! সমাজের শাসনে বা অন্য কোন কিছুর জন্যে কোন দিন আমি তাকে ত্যাগ করতে পারবো না! আমি যা করেছি, তার জন্যে কোন দিন লজ্জা বোধ করব না। সকলের কাছে অকুণ্ঠ ভাবে এ কথা দরকার হলে স্বীকার করবো!"

'অরুণ আমার!' এ কথা স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়া লইবামাত্র লীলা নব-উন্মেষিত প্রেমের আবেগে ও পুলকে শিহরিয়া উঠিল! তাহার হৃদয়ের রক্ত খরবেগে বহিল। তাহার মনের সমস্ত লজ্জা ও ধিক্কার এক মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! এবং এই প্লাবনে তাহার এতক্ষণের লোকলজ্জা, পিতামাতার ভয়, কিরণের ক্রোধ ইত্যাদির চিন্তা কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না!

সেদিন অপরাহ্ণে লীলা টেনিস্‌কোর্টে বীণা ও আর দুইটি বন্ধুর সহিত টেনিস্ খেলিতেছিল। তাহার নিজের মনের সব সংশয় ও দ্বিধা ঘুচিয়া মন নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু কিরণকে এমনই করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলেই সব গোল মিটিয়া সে নিশ্চিন্ত হয়। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগে সে নিজের আহত অভিমানের গর্ব্বে কিরণকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিল!

লীলা খেলার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইয়া উঠিতেছিল। একটি পরিচিত প্রিয় পদধ্বনি, একটি পরিচিত কণ্ঠের হৃদ্য স্বর শুনিবার জন্য তাহার মন সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে! কিন্তু বেলা যে ক্রমেই শেষ হইয়া আসিল, কিরণ ত এখনো কই আসিল না!

সকালে কিরণ যখন কোনমতেই তাহার সহিত একমত হইল না, বরং তাহাকে কঠোর তিরস্কার করিয়া অত্যন্ত অপমানজনক অনেক কথা শুনাইয়া দিল, তখন বাড়ী আসিয়া রাগে ও অপমানে লীলা তাহার উপর বিষম বিমুখ হইয়া উঠিল! সে যদি এত সহজে তাহার এত দিনের বন্ধুত্বের অবসান করিয়া দিতে পারে, তবে লীলারই বা এত গরজ কিসের? তাহারি যেন আর কিরণকে না হইলে দিন চলিবে না! ইহার পরে কিরণ যদি আবার দুদিন পরে সাধিয়া নিজে তাহার কাছে আসে, তবু সে আর তাহার নাম করিবে না!

তাহার পর দিনের বেলা—যখন সে তাহার নিজ-কৃত কার্য্যের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল, তখন একবার তাহার মনে হইল, কিরণ যাহা বলিয়াছে, তাহাই সত্য, দোষ তাহারই! সে দোষ করিয়া আবার অনর্থক তাহার উপর রাগ করিতেছে! তাহার রাগ করিবার কোন অধিকার নাই! কিন্তু তাহার পরেই অরুণের প্রতি নব অনুরাগের স্রোতে এ সব চিন্তা ও অস্থিরতা ভাসাইয়া দিল! সে আর কিছু

তখন ভাবিতে পারিল না! কিন্তু বৈকালে লীলা নিজে নিজেই ভাবিল, সে যাহা করিয়াছে তাহাতে দোষ ত বিশেষ কিছু নাই; তবে তাহা লইয়া যে বৃথা কিরণের সঙ্গে তাহার মনান্তর স্থায়ী হইয়া থাকিবে, সেটা ভাল নয়! তাহাদের এত দিনের বন্ধুত্বের বন্ধন—এ কি এক কথায় উড়াইয়া দিতে পারা যায়? কিরণ যদি একবার আসে, তাহা হইলে ব্যাপারটা এখনি মিটিয়া যায়! লীলা তাহার জন্য অস্থির হইয়া ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু কিরণ আসিল না। অবশেষে অধৈর্য্য হইয়া লীলা ক্লাবে আসিল। কিরণ রাগ করিয়া তাহার কাছে না আসুক, ক্লাবে খেলিতে নিশ্চয় আসিবে তো? সেখানেই লীলা তাহাকে সমস্ত বিষয় জানাইবে ও বুঝাইয়া বলিবে! কিরণের বিশ্বাস, লীলা অরুণকে ভালবাসে না! সেই বিশ্বাসেই সে অত রাগ করিয়াছে! এই কথাটা তাহাকে কোন রকমে একবার বুঝাইতে পারিলেই সব সন্দেহ মিটিয়া যায়! কিরণ তাহাকে যে সব কঠোর কথা বলিয়াছে, সে সবই ভুলিয়া লীলা একবার তাহার দেখা পাইবার জন্য আকুল হইয়া ফিরিতে লাগিল।

খেলা শেষ হইল, কিরণ তখনো আসিল না। অন্ধকার হইয়া আসিতে সকলে একে একে ঘরের ভিতর উঠিয়া গেল। অনেকে বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগও করিতেছিল। লীলা তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া নিঃশব্দে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনের উদ্বেগ অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। কিরণ কি তবে সত্যই আর আসিবে না? সে কি তবে সত্যই লীলার সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিল?

ঘরের ভিতর যাইতে লীলার প্রবৃত্তি ছিল না। যেদিন সে গান গাহিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাহার গুণমুগ্ধ অসংখ্য ভক্ত ক্লাবে জুটিয়া

গিয়াছিল। তাহাদের অজস্র চাটুবাদে বিরক্ত হইয়া সে সাধ্যমত আর ক্লাবে আসিত না, আসিলেও তাহাদের পরিহার করিয়া চলিত।

বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া লীলা একমনে কিরণের সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনের কথা ভাবিতেছিল। যখন সে লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসে, তাহার পর হইতে এক দিনও কিরণের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ হয় নাই। প্রতিদিন প্রভাতে লীলা অশ্বারোহণে বেড়াইতে বাহির হইত, কিরণ অর্দ্ধপথে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিত। তাহার পরে দুইজনে একসঙ্গে কত—কতদূর পর্য্যন্ত ঘোড়া ছুটাইয়া বেড়াইত। এ অঞ্চলে যেখানে যতদূরে নিভৃত নির্জ্জন বেড়াইবার স্থান আছে, সবই তাহাদের দুজনের পরিচিত। এক এক দিন এক এক স্থানে বনভোজনের আয়োজন করিয়া তাহারা দুইজনে কত দীর্ঘ দিন গানে, গল্পে-আমোদে কাটাইয়াছে! কত দিন কিরণ কোন ছায়াশীতল কুঞ্জবনে বিবিধ বিচিত্র আহার্য্যের প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখিত, লীলা বহুদূর ভ্রমণের ফলে প্রবলা ক্ষুধা সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া সেগুলির বিধিমত সদ্ব্যবহার করিয়া বাড়ীতে কিছু খাইতে পারিত না। মিসেস্ রায় তাহার অবস্থা দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত বলিতেন, তাহার যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তখনি তাহার জন্য একটা টনিকের ব্যবস্থা হইয়া যাইত। বিকালে কিরণের সঙ্গে দেখা হইলে সেই কথা বলিয়া দুজনে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত! কত দিনের কত গল্প, কত গভীর বিষয়ের আলোচনা, কত সুখময় দিন, কত সুখময় সান্ধ্য আমোদের প্রীতিপূর্ণ স্মৃতি লীলার হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে! আজ তবে সে সবই শেষ হইল!

একটা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা যেন শত শত সূচীর মত লীলার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল! যাহার সহিত এক মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদ অসহ্য ও অসম্ভব

বলিয়া মনে হইত, আজ এক দিনের একটা সামান্য ঘটনায় সে অতি সহজে লীলার জীবন-পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। লীলার নবীন প্রেমের নবলব্ধ আনন্দ তাহার এখনকার ব্যথা-কাতর চিত্তকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারিল না! অতীতের ছোট বড় নানা স্মৃতি তাহার ব্যথিত চিত্ত মথিত করিতে লাগিল।

[১৩]

অনিবার্য্য হৃদয়ের আবেগে সে-রাত্রে বিছানায় পড়িয়া লীলা স্থির করিল, কাল সকালে সে বসন্তপুরে কিরণের বাড়ী গিয়া, তাহার সঙ্গে নিজেই দেখা করিয়া ব্যাপারটা মিটমাট করিয়া আসিবে। অরুণকে দেখিতে এখন মাঝে মাঝে তাহাকে ত সেখানে যাইতে হইবে, অথচ সে যাহার বাড়ী যাইবে, তাহার সঙ্গেই এমন অসদ্ভাব হইয়া থাকিবে, এ কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার! যেমন করিয়াই হউক, কিরণের সঙ্গে ভাব না করিলে কিছুতেই তাহার চলিবে না। বিশেষ, প্রথম প্রথম লীলার নিজের মনে মনেই এ বিষয় লইয়া কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু এখন যখন সে এ সম্বন্ধে শেষ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছে ও তাহার নিজের সমস্ত দ্বিধা কাটিয়া গিয়াছে, তখন কিরণ কেন একটা অমূলক ধারণা মনে বদ্ধমূল রাখিয়া এমন দূরে দূরে থাকিবে। এর বিহিত করিতেই হইবে।

প্রত্যূষে উঠিয়াই লীলা ঘোড়া ছুটাইয়া বসন্তপুরের দিকে চলিল। বেলা হইলে কিরণ বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে! কিন্তু দেখা হইলে লীলা আগে কি বলিবে? এখন তো আর আগের মত ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরা যায় না! যদি তাহাকে দেখিয়া কিরণ মুখ ফিরাইয়া

চলিয়া যায়! লীলা নিজের মনে কত কথাই তোলাপাড়া করিতে করিতে যাইতেছিল।

সহিস তাহার অশ্ব আস্তাবলে লইয়া গেলে, বেহারা জানাইল, তাহার প্রভু বাড়ী নাই। বাহিরে যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছেন —মিস্ বাবা আসিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনার যেন কোন ত্রুটি না হয়। সুতরাং তাঁহার সেবার জন্য তাহারা প্রস্তুত রহিয়াছে। পাছে লীলার সঙ্গে দেখা হয়, তাই সে এত সকালে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিরণ নাই। লীলা স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ তাহার আর কোন কথা ভাবিবার বা কোন কিছু করিবার শক্তি রহিল না।

কিরণ সত্য সত্যই তবে তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিল! সে আর কোন দিন তাহার সহিত দেখা পর্যন্ত করিবে না! লীলা অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিল,—এ আঘাত তাহার বুকে বড় বিষম বাজিল। প্রভাতের নির্ম্মল আকাশ তাহার সমস্ত শোভা-বৈচিত্র্য লইয়া তাহার চোখের সামনে ম্লান হইয়া গেল! লীলার মনে হইল, তাহার এখানকার দেনা-পাওনা সব নিঃশেষে চুকিয়া গিয়াছে। আর কিছু তাহার করিবার নাই।

বেহারা বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিবার পর লীলার নিঃস্পন্দ দেহে ও মনে চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে শুনিল, ঘরের ভিতর হইতে অরুণ ডাকিতেছে,—"বীণা! বীণা!"

লীলা চমকিয়া উঠিল। অরুণের স্বরে তাহার মনের নির্জ্জীবতা নিমেষে ছুটিয়া গেল। সে এখানে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল!

টেবিলের ধারে চৌকিতে বসিয়া অরুণ অত্যন্ত অধীর ভাবে লীলার আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার চোখে মুখে কি আকুলতা! একটা অধীর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ তাহার দৃষ্টিহীন অসহায় মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মুখ দেখিয়াই লীলার মনের সমস্ত অশান্তি ও বেদনা নিমেষের মধ্যে দূর হইয়া গেল।

সে অরুণের কাছে দাঁড়াইতেই, অতি মৃদু অতি কোমল স্বরে অরুণ বলিল,—"এসেছ বীণা? তোমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ আমি কাল থেকে চিনে রেখেছিলুম। আজ যেমন তুমি গেটের কাছে এসেছ, তখনই আমি জানতে পেরেছি! তার পর থেকে কতক্ষণ ধরে যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি,—এক একটা মুহূর্ত্ত যেন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছিল!"

লীলার নিজের প্রতি অত্যন্ত ধিক্কার ও বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল! তাহার আজ কি হইয়াছে! নিরর্থক এই বেচারাকে এত কষ্ট দিয়া সে এতক্ষণ কোন্ চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিল!

অনুতপ্ত চিত্তে সে নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। বলিল, "আজ ত আমি কালকের চেয়ে সকালেই এসেছি অরুণ, বেশী দেরি হয়েছে কি?"

অরুণ তাহার কোমল হাতখানি নিজের দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—"তা হয় ত এসেছ! তোমাদের হিসেবে হয় ত দেরি হয় নি! আমার নিজের হিসেব যে আজকাল একবারে আলাদা ধরণের হয়ে গেছে। কাল তোমার যাবার পর থেকে আমি কি করে যে মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুণে গুণে আজকের এই সময়টির প্রতীক্ষা করে কাটিয়েছি, সে তুমি বুঝতে পারবে না বীণা, কোন চক্ষুষ্মান্ লোকেই তা পারবে না! এসো! আরো কাছে এসো

আমার! আমার চোখ নেই ত, যে, তোমায় আমি দেখবো? আমার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে, আমার সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি শুধু তোমার সান্নিধ্য অনুভব করতে চাই!"

দুইজনে পরস্পরের হাত ধরিয়া বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। হৃদয় যখন ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত ও পূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন মুখে সে ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা থাকে না, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তিও হয় না! অরুণ তাহার একমাত্র প্রিয় বস্তুকে নিকটে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা, লীলার মনও তখন অরুণের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসায় পূর্ণ। সে তখন ভাবিতেছিল, অরুণ তাহার ভবিষ্যৎ স্বামী, তাহার কাছে এ ভাবে আসায় তাহার কোন দোষ নাই! সে যে কাল এখান হইতে যাইবার পর কিরূপে অরুণকে হারাইয়া কিরণের চিন্তায় বিভোর হইয়া কাটাইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া সে অবাক্ হইতেছিল। কতক্ষণ পরে অরুণ ডাকিল, "বীণা!"

"অরুণ!—অরুণ!"

"কবে আমি তোমায় একেবারে আমার কাছে পাব? তোমাকে আমার বলবার অধিকার কবে আমার হবে?"

লীলা সস্নেহে তাহার উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র মুখের দিকে চাহিল, "এত ব্যস্ত কেন অরুণ? এই ত তুমি আমারি কাছে রয়েছ! এখনো কি আমার কথায় তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"সে জন্য নয় বীণা! তোমার কথায় আমার কোন সন্দেহ নেই। স্বর্গের দেবী তুমি, মিথ্যার দিক দিয়ে তুমি যেতে পারো না, তা আমি জানি। কিন্তু আমি যে আর থাকতে পারছি না। যখন জানতুম—তোমাকে পাবার আমার কোন আশাই নেই, তখন অনেক কষ্টে মন সংযত করেছিলুম, সংসারে মানুষ যখন তার সব আশা ভরসা হারিয়ে

একবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়,—তখন তার মনের অবস্থাও হয়ে যায় সেই রকম, কিছুতেই তার আর সুখ-দুঃখ বোধ থাকে না, সেই হতাশ অবস্থা তখন আমারও হয়েছিল, তাই অত সহজে তোমার উপর সব দাবি চুকিয়ে দিতে পেরেছিলুম। কিন্তু কাল থেকে যখন আবার বুঝেছি সংসারে এখনো আমার আশা করবার জিনিষ আছে, আর সে তুমি, যাকে আমি আমার প্রথম যৌবনের অদম্য উচ্ছ্বাসে প্রাণ ভরে ভালবেসছি, তখন থেকে মন যে আমার কি অধীর হয়ে উঠেছে, সে তোমায় বোঝাতে পারবো না! সারা দিন সারা রাত ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পর দু এক ঘণ্টার জন্যে তোমায় পাওয়া এইটুকুতে আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না। যদি আমায় এত ভালবেসেছ, তবে আর দূরে থেকো না বীণা! তোমায় ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও আমার অসহ্য বলে মনে হচ্ছে!"

"—তাই হবে অরুণ! আমি যত শীঘ্র পারি—এ কথা বাবাকে বোলবো, তারপরে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না! কিন্তু তার আগে যে আমার তোমাকে অনেক কথা বলতে হবে—এক দিন সময়মত সেগুলো শোন। তার পর শুনেও যদি—"

বাধা দিয়া অরুণ বলিল, "তুমি যে কথা আমায় বলতে চাও, যখনি বলবে তখনি শুনবো। তার আবার সময় অসময় কি? তবে আমার নিজের কথা এই যে, আমি এখন কিছুই বলতে বা কোন কিছু করতে চাই না। ইচ্ছা করে, কেবল নিঃশব্দে কিছু দিন তোমার কাছে পড়ে থাকি। তোমার মনে আছে হয় ত, আগে যখন আমি তোমার কাছে থাকতুম, তোমার প্রতি একটা উন্মাদ ভালবাসায় আমায় কি মুখর করে তুলতো! কিন্তু এখন? চোখ হারিয়ে সে সবই আমার গেছে! বাইরের জগৎ থেকে রূপ রস শোভা সম্পদ—যা কিছু

গ্রহণ করবার, সে সবই এখন আমার কাছে মৃত। এখন শুধু অনুভূতিই আমার সম্বল, সেইটুকু নিয়েই আমি বেঁচে আছি। আমি এখন আর কিছুই চাই না, শুধু এমনি করে তোমার হাতে হাত রেখে, তুমি যে আমার কাছে রয়েছ, এইটুকু জেনে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকি। জীবনে আর সব সুখ থেকেই সমাধি হয়েছে আমার! শুধু এইটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না বীণা। ও কি! কাঁদছো? কাঁদো কেন বীণা?"

অরুণের কথা শুনিতে শুনিতে বেদনা ও করুণায় লীলার হৃদয় ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে চোখের জল মুছিয়া বলিল, "অমন করে বোলো না তুমি! আমার বড় কষ্ট হয়! কেন তুমি এত হতাশ হয়ে পড়ছো? যখন আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো, তখন তুমি দেখবে—আমাদের সুখের কোন কিছুই নষ্ট হয় নি!"

নিজের রুমালে অরুণ সাদরে সস্নেহে লীলার চোখ মুছাইয়া দিল। বলিল, "তোমার এই চোখের জল আমার এ দগ্ধমরু জীবনে শান্তিবারি! এখনো আমার জন্যে একজনের মনে এত ভালবাসা, এত করুণা সঞ্চিত রয়েছে, তা জেনেই ত আমার মনে আবার বাঁচবার সাধ ও আশা ফিরে এসেছে! আমার সবই ত গিয়েছিল বীণা! তুমিই ত আবার আমায় ফিরিয়ে আনলে!"

লীলা মুগ্ধ-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ ও প্রেমের উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলাপে তাহার মনের আনন্দ ও আশা প্রকাশ পাইতেছিল। লীলা মনে মনে ভাবিল, তোমাকে সুখী করাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ হবে। স্বেচ্ছাচার করেছি বলে আমাকে যে যতই গালাগালি দিক্—আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়বো না।

কথায় গল্পে সেদিন দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। লীলা উঠিবার সময় টেবিলের উপর একখানা খাতা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "এ খাতাখানা তোমার না কি? তুমি এখন লিখ্‌তে পারো অরুণ?"

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "যখন একলা থাকি, তখন আঁচড় কাটি। একটা কিছু করে সময় কাটাতে হবে ত। তাকে আর লেখা বলতে পারা যায় না!"

লীলা খাতাখানি তুলিয়া কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার লেখা ত বাঁকা-চোরা হয় নি? অল্প একটু যা দোষ আছে, আমার মনে হয়, যদি তুমি বসে বসে আরো কিছুদিন অভ্যাস করো, তা হলে বোধ হয় আর এটুকুও থাকবে না, বেশ চলনসই লেখা হয়ে যাবে।"

অরুণ বলিল, "আমি ত বরাবরই অভ্যাস করছি। প্রথম প্রথম বড় বাঁকা-চোরা হ'ত। লিজি কত দিন আমার হাত ধরে ধরে লেখা অভ্যাস করিয়েছে। তার কথা সব তোমাকে আর এক দিন বোলবো বীণা! আমি যে আজ আবার এমন ভাবে দেশে ফিরে এসেছি, এ শুধু তারই সেবা ও যত্নের গুণে। এখনো হয় ত সে আমার কথা মনে করে কত কষ্ট পাচ্ছে।"

লীলা গভীর সম্ভ্রমের সহিত বলিল, "তোমার কাছে তাঁর কথা শুনে অবধি তাঁর প্রতি আমার যে কি শ্রদ্ধা হয়েছে, সে আর কি বোলবো? আমরা যখন একসঙ্গে থাকবো, তখন তুমি চিঠিতে পরিচয় করে দিও, আমি তাঁকে চিঠি লিখবো। কিন্তু অরুণ! তুমি কি সুন্দর লিখতে পারো! কি চমৎকার তোমার লেখবার শক্তি! তোমার লেখা পড়তে আমার এত ভাল লাগে!"

অরুণের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "সত্যি

বীণা? আমি কি এত ভাল লিখি, যে তোমারও পড়তে ভাল লাগে? তা হলে আমার লিখতে শেখা আজ সার্থক হলো বলতে হবে!"

লীলা বলিল, "সত্যিই বলছি—তোমার বেশ ক্ষমতা আছে লেখবার! দেখ অরুণ! আমার একটা কথা মনে আসছে! তুমি একখানা উপন্যাস লেখ না কেন? যদি কিছু দিন একটা টাইপিষ্ট রেখে টাইপ-রাইটিং শিখে নিতে পার, তা হলে ত লেখবার কোন ভাবনাই থাকে না। বিলেতে অন্ধরা সব টাইপ-রাইটিং-এর সাহায্যে অনর্গল লিখছে—দেখে এলুম। তারা কেউ অক্ষম অকর্ম্মণ্য নয়। তুমি যদি এটা কর, তোমার মনের সমস্ত চিন্তা, কল্পনা—তুমি এ রকমে প্রকাশ করবার সুযোগ পাবে। আর তখন এই দিকে তোমার মন এমনি রত থাকবে যে, বাইরের কোন অভাব বা চোখের অভাব তোমার মনেই আসবে না। উপস্থিত তুমি আর কিছু দিন লেখা অভ্যাস করে হাতেও লিখতে পারো। যা কিছু ভুল থাকবে, আমি মাঝে মাঝে এসে সেগুলো তোমায় পড়ে শোনাব। তখন তুমি আবার শুধরে দেবে। এই রকমে দুজনের চেষ্টায় বেশ চমৎকার একটা বই তৈরী হবে।"

অরুণের মুখ আশায় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তুমি আজ আমাকে একটা নতুন পথ দেখালে বীণা! আমি কখনো এ কথা ভেবে দেখে নি! বাইরে কাজ করবার যে শক্তি থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি, সেই রুদ্ধ শক্তি—যদি এটা সম্ভব হয়, তা হলে—আর এক দিক থেকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্র পাব আমি! আমি নিশ্চয় তোমার কথামত কাজ করতে চেষ্টা করবো! আজকে কিরণ বাড়ী ফিরলে তার সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা বলে দেখবো, সেই বা কি বলে।"

(১৪)

মিঃ রায়ের গৃহে সেদিন অপরাহ্নে একটা পার্টি উপলক্ষ্যে মহা উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, জমীদারবর্গ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। বিস্তৃত বাগানের এক দিকে ছোট বড় সামিয়ানার নীচে অতিথিগণের জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। অন্য দিকে, দূরে টেনিসকোর্টে টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলা চলিতেছিল। অস্তোন্মুখ স্যর্য্যের কিরণজাল সুবৃহৎ বট ও অশ্বত্থের ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাঠে ও লনে পড়িয়া চারিদিক রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। বাগানের অন্যদিকে সমবেত জনগণকে আনন্দ দিবার জন্য একদল বাদ্যকর তাহাদের ব্যাণ্ডে প্রচলিত সুর সকল আলাপ করিতেছিল।

বীণা সুচারু বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া তাহার পিতার অতিথিদের সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত। নীল রংএর বেনারসী সাড়ী তাহার সুগৌর কমনীয় তনু বেষ্টন করিয়া ঝলমল করিতেছে, সুঠাম শুভ্র বাহুর উপর স্বর্ণখচিত ব্লাউসের কারুকার্য্য তাহার গাত্রবর্ণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার অনাবৃত শুভ্র কণ্ঠে হীরক-জড়িত নেকলেস্—কাণে ছোট দুটি মুক্তার ইয়ারিং, সুগোল মণিবন্ধে রত্নময় স্বর্ণাভরণ ঝলমল করিতেছিল। সে মৃদু মিষ্ট হাসি ও শোভন ভব্যতার সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়া বেড়াইতেছিল। যখন যেদিকে সে যাইতেছে—সেইদিক হইতেই অস্ফুট প্রশংসার গুঞ্জন উঠিয়া তাহাকে সমধিক প্রীত ও গর্ব্বিত করিয়া তুলিতেছিল।

লীলা এ সব পার্টির পক্ষপাতী নয়। এই সংযত ভদ্রতা ও সব সময় হিসাব করিয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব; তাই সে যথাসম্ভব শীঘ্র নিমন্ত্রণ-সভা ত্যাগ করিয়াছে ও বীণার উপর আতিথ্যের ভার দিয়া

সে টেনিসকোর্টে তাহার খেলার সঙ্গীদের লইয়া খেলা জমাইয়া তুলিয়াছে।

সুপরিচ্ছদধারী খানসামারা চা, কেক ও অন্যান্য মিষ্টান্নপূর্ণ পাত্র লইয়া সকলের কাছে ঘুরিতেছিল। মিসেস্ রায়ের বন্ধু একটি মহিলা এক পেয়ালা চা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনার ছোট মেয়েটিকে তো দেখতে পাচ্ছি না?"

মিসেস্ রায় একদৃষ্টে বীণার অকুণ্ঠ সহজ গতি ও তাহার সকলের সঙ্গে সমান ভাবে সামাজিকতা রক্ষা করিয়া আলাপ করিবার ক্ষমতা মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন। গর্ব্বময় আনন্দে তাঁহার মাতৃহৃদয় উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল। লীলার প্রসঙ্গ উঠায় তাঁহার মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "লীলা বড় অস্থির ও খামখেয়ালী মেয়ে,—সে এই একটু আগে টেনিস খেলতে চলে গেছে। আর তার উপর এ সব ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতেও ত পারি না। সে যেমন আমার বীণা,—কোন কথা তাকে শিখাতে হয় না, সকল দিকে সমান!"

চায়ের পেয়ালায় একটি চুমুক দিয়া মিসেস্ দত্ত বলিলেন, "তা যা বলেছেন! আপনার এ মেয়েটি রূপে গুণে সমান। আমি ত তাই সবাইকে বলি, বীণার মত মেয়ে আমাদের সমাজে ত আর দেখা যায় না। ভাল কথা—বোসেদের বাড়ীর খবর শুনেছেন কিছু। সুধীর বোস—ডাক্তার? আজ ভোরে যে সেখানে মহাকাণ্ড হয়ে গেছে!"

মিসেস রায় বলিলেন, "কি হয়েছে? কই, আমি কিছুই শুনি নি ত?"

সেন-গৃহিণী এতক্ষণ তাঁহার বিপুল দেহভার একখানা ইজিচেয়ারে ন্যস্ত করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পিষ্টকের মধুর রসের আস্বাদনে ব্যস্ত ছিলেন। ডাক্তারের বাড়ীর কথা কর্ণে যাইবামাত্র, তিনি উৎকর্ণ

হইয়া উঠিয়া সচকিতে বলিলেন, “কেন? কেন? কি হয়েছে স্থধীর বাবুর বাড়ী? তিনি ত কাল সকালেও আমায় দেখতে আমাদের বাড়ী গিছলেন!”

মিসেস্ দত্ত একটু বিজ্ঞজনোচিত হাসির সহিত বলিলেন, “হুঁঃ! কাল সকালে! এখন বলে দু' এক ঘণ্টার মধ্যে কত যুগ উল্টে যাচ্ছে, আর আপনি বল্লেন, কাল সকালকার কথা! ব্যাপারটা ঘটেছে আজ ভোরে। কাল সকালে কি আর কেউ এ কথা জানতো? আজকাল দিন-কাল বড়ই খারাপ পড়েছে দিদি! বড়ই মন্দ সময় পড়েছে! কার ঘরে কখন যে কি ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না! এ যেন অষ্ট প্রহর মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে, কখন কার মাথায় পড়ে, এমনি সশঙ্কিত হয়ে থাকা!”

উপস্থিত মহিলাগণ এরূপ একটা আসন্ন বিপদের করাল ছায়ার সান্নিধ্যে মনে মনে উদ্বেগ ও ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন! ব্যাপারটা কি? নিশ্চয়ই একটা কিছু গুরুতর বিষয় ঘটিয়াছে! মিসেস্ দত্ত সহরের সব খবরই রাখিয়া থাকেন। তিনি যখন বলিতেছেন, তখন তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। একটি মহিলা শুষ্কমুখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা কি হয়েছে—ডাক্তার বাবুর বাড়ী? আপনি কি আজ সকালে সেখানে গিয়েছিলেন?”

মিসেস্ দত্ত একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, উপস্থিত সকলেরই মুখে আগ্রহ ও কৌতূহলের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে আরম্ভ করিলেন, “যাবার কি আর যো ছিল তখন সেখানে? একেবারে বাড়ীর চার পাশ তখন পুলিশে ঘিরে ফেলেছে,—ডেপুটি কমিশনার, স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর—যত সব পুলিশের বড় বড় অফিসার, আর লাল-পাগড়ীর দল—গিস্ গিস্ করছে! সে কি

কাণ্ড! রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য! ঐ যে নলিন, ডাক্তার বাবুর বড় ছেলে, এবার বি-এ পাশ করে বেরোল? আপনারা ত সকলেই তাকে দেখেছেন? কতদিন খেলতেও এসেছে এখানে! এদিকে ত অত ভদ্র—শিষ্ট শান্ত ছেলে—তা কে আর ভেবেছে বলুন—? অমন ছেলে এনার্কিষ্টের দলে মিশেছে!"

এনার্কিষ্ট! সকলে ভয়ে বিস্ময়ে একবারে স্তব্ধ! কিছুক্ষণের জন্য স্থানটি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। মিসেস্ রায় জজ-গৃহিণী,—জেলার সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের পত্নী,—তাঁহার কোন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা বা কোন বিষয়ে ব্যগ্রভাব শোভা পায় না! তিনি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু এ কথার পর তিনিও আর তাঁর অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সবিস্ময়ে বলিলেন, "নলিন এনার্কিষ্টের দলে মিশেছে? এ যে বড় আশ্চর্য্য ও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে! পুলিশ কি তার বিপক্ষে প্রমাণ পেয়েছে কিছু?"

"তা আর পায়নি? তারা তলে তলে সব সন্ধান রাখ্ছে কতদিন ধরে! না হলে খামখা গিয়ে ধরতে পারে? তারা বাড়ী সার্চ্চ করেই ত রিভালভার, বোমা, টোটা—কত কি সব পেয়েছে। শুনলু—নলিনের নামের খানকতক চিঠিপত্র যা পাওয়া গেছে, তা থেকে নাকি আরো সব ভয়ানক কাণ্ডের খবর বেরিয়ে পড়েছে। কাল সকালের কাগজে সব খবরই পাবেন এখন।"

মিসেস্ রায় চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "গোপনীয় কিছু যদি সত্যই প্রকাশ হয়ে থাকে, সে কি আর কাগজে বেরুবে! কাগজে শুধু মোটামুটি খবরটাই পাওয়া যায়। যাই হোক, ক্রমে ক্রমে দেশের কি অবস্থা হতে চললো? এই জনকতক মাথা-পাগলা ছোকরা,—এরাই সব গোটাকতক বোমা ফেলে, আর দুটো দশটা লোক মেরে, এত বড়

প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ রাজত্বটা উড়িয়ে দেবে, ভেবেছে না কি? এতে ইংরেজের কোন ক্ষতিই হবে না, মর্‌তে ওরা শুধু নিজেরাই মরবে বই তো নয়। আর এত অসন্তোষটাই যে কিসের, তাও ত আমি কিছু বুঝি না। ইংরাজের রাজত্বে আজ আমরা যে শান্তি, সুখ, মান, সম্ভ্রম পেয়েছি ও ভোগ করছি, এ সব পূর্ব্বে ছিল কখনো! আমি অবাক্ হয়ে ভাবি, এই সব ছেলেরা লেখাপড়া শিখে, মানুষ হয়ে কি করে এমন ভুল পথে যাচ্ছে?"

মিসেস্ দত্ত গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তবে আর একটু আগে আমি বলছিলুম কি? যত সব ভাল ভাল ছেলে,—যারাই দুটো চারটে পাশ করেছে,—সে সবই প্রায় এই দলে,—আজকালকার ছেলেদের মধ্যে এই এক কি হাওয়া ঢুকেছে! তাই ত বলি, আমাদের সবাইয়ের ছেলে-পুলেই ত পড়ছে শুনছে, বাইরে থেকে দেখতে শুনতে বেশ ভালই, কিন্তু কে যে ভিতরে ভিতরে কি কাণ্ড করছে—তা কিছুই বলা যায় না! যেদিন যে ধরা পড়বে, সেই দিন তার কথা সবাই জানবে। এই যে নলিনের কথা নিয়ে আজ সহরে হুলস্থুল পড়ে গেছে,—অন্যের কথা দূরে থাক্, তার মা বাপই কি এ সব ঘুণাক্ষরে জানতো! আজ বিকেলে খবর পেয়ে যখন তাদের বাড়ী গেলুম, তার মা তখন কেঁদে লুটোপুটি! তাকে দুটো কথা বলবো কি—নিজেই আমি কেঁদে মরি!"

মিসেস্ দত্ত কথা শেষ করিয়া রুমালখানি তুলিয়া নিজের শুষ্ক চক্ষু দুটি একবার মার্জ্জনা করিয়া ফেলিলেন।

মহিলাদের মধ্যে অনেকেই এ সংবাদে যথার্থই সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাঁহাদের মনে বার বার এই কথাটাই জাগিয়া উঠিতেছিল—কোন্ দিন বা কাহার ঘরে সুধীর বাবুর বাড়ীর কাণ্ডের পুনরভিনয় হয়।

মাঠের অন্য দিকের তাঁবুতে মিঃ রায় অন্যান্য রাজপুরুষ ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। দেশের সাময়িক অবস্থা, বর্ত্তমান যুদ্ধের বিষয় ও যুদ্ধের পর জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের চর্চ্চায় তাঁহাদের সভাও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

বীণা ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। বৈকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল অবান্তর গল্প শুনিয়া ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে।

সুযোগ বুঝিয়া সে একবার সভা ত্যাগ করিয়া মাঠে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণে ক্ষণে সে কাহার আশায় গেটের দিকে চাহিতেছিল।

টেনিস্‌কোর্ট হইতে মাঝে মাঝে উচ্চ চীৎকার-ধ্বনি ও হাসির শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। লীলার উপর তাহার বিষম রাগ ও হিংসা হইতে লাগিল। সে কেমন সহজে এ সব সামাজিকতা ত্যাগ করিয়া খোলা মাঠের হাওয়ায় খেলার আনন্দ উপভোগ করিতেছে! আর বীণা? বেচারা সমস্ত বিকালটা কতকগুলো বাজে লোকের সহিত বাজে কথা বকিয়া বকিয়া হায়রাণ! যেন যত গরজ তাহারই! লীলা শুধু স্ফূর্ত্তি করিতেই মজবুত! ঝঞ্ঝাট দেখিলেই অমনি সরিয়া পড়ে!

হেমন্তের স্বল্পাবশেষ বেলা ক্রমেই অবসান হইয়া আসিতেছিল। ম্লান রৌদ্রের রক্তিম আভা তখনো অট্টালিকার উচ্চ চূড়ায়, উন্নত তরুশিরে চিক্ চিক্ করিতেছে।

মাঠের খোলা হাওয়ায় দাঁড়াইয়া বীণা কিরণের কথা ভাবিতেছিল। সে আজ এখনো আসিল না কেন? সমস্ত বৈকালটা সে তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তবু তাহার দেখা নাই। আর এই চৌধুরী,

দত্ত, গাঙ্গুলী, সেন ইঁহাদের অযাচিত আলাপ ও স্তুতি প্রশংসার জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে! যাহাদের দরকার নাই, তাহারাই কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাছে আসে, আর যাহাকে সর্ব্বদা খোঁজা যায়, তাহার দেখা পাওয়া যায় না।

মাঠের অন্য প্রান্তে ব্যাণ্ডে একটি প্রেমের গানের গৎ বাজিতেছিল, বীণা এক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে সেই স্বরটি শুনিল। তার পর বিরক্তভাবে নিজের অঞ্চলে গাঁথা একটি গোলাপ ফুল খুলিয়া লইয়া তাহার আঘ্রাণ লইয়া নিজের মনে বলিল, 'সন্ধ্যা হয়ে গেল—সে আর এল না দেখছি।'

যতদিন হইতে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছে,—বরাবরই কিরণের এইরূপ উদাসীন ভাব! সে চিরদিনই সংযত ও গম্ভীর; তাহার স্বভাবে লঘুতা বা চাঞ্চল্য কখনো দেখা যাইত না। শারীরিক সামর্থ্যে ও সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠবে তাহার প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ ভরপূর! ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, পোলো ইত্যাদি খেলায় ও শিকারে তাহার মত দক্ষ যুবক সে জেলায় আর কেহ ছিল না। তাহার হৃদয় কোমল,—দয়া মায়া স্নেহে পরিপূর্ণ; কিন্তু সে অসীম মানসিক বলে বলীয়ান্। শিশুদের সে অত্যন্ত ভালবাসিত। যখন সে তাহাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেয়, তখন সেও যেন তাহাদেরই মত শিশু হইয়া পড়ে। কাছাকাছি দুই মাইলের ভিতর যত ছোট শিশু ছিল—কিরণ তাহাদের সকলের বন্ধু। তাহাদের প্রত্যেকের জন্মদিনে কিরণ বাড়ী বহিয়া তাহাদের জন্য উপহার লইয়া ফিরিত। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাইলে সে নিজের সব কাজকর্ম্ম একেবারে ভুলিয়া যাইত।

জেলার মধ্যে সে সর্ব্বজনপ্রিয় ও সুপরিচিত ছিল। তাহার উচ্চ শিক্ষা, অতুল ঐশ্বর্য্য, সংযত ভদ্র স্বভাব তাহাকে সকলের মধ্যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল।

মহিলাদের মধ্যেও তাহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহাদের প্রতি তার ব্যবহার সর্ব্বদা নম্র সৌজন্যে পূর্ণ ছিল। তবুও তাহার নামে চর্চ্চার ত্রুটি হইত না। সৌন্দর্য্যের প্রতি অনাসক্তিই এই চর্চ্চার অন্যতম কারণ। সে তরুণীদের সহিত অবাধে মিশিত, তাহাদের সমস্ত আবদার অনুরোধ রক্ষা করিয়া চলিত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রতি তাহার কোন পক্ষপাত দেখা যায় নাই।

বীণা এখানে আসিলে যখন প্রথম তাহার সহিত পরিচয় হয়, তখন সে মনে স্থির জানিত, কিরণের এত দিনের সমস্ত অনাসক্তি ও গর্ব্ব তাহার কাছে খর্ব্ব হইবেই। এ পর্য্যন্ত কোনখানে তাহার সৌন্দর্য্য ও শক্তির পরাজয় ঘটে নাই,—সেজন্য বীণা নিজেকে অজেয় বলিয়াই জানিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইল।

দিনের পর দিন যায়, কিন্তু কিরণের ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সে বীণার সঙ্গে অকুণ্ঠ ভাবে মেশে, তাহার অন্য ভক্তদের মত তাহার রূপেরও প্রশংসা করে, তাহার সঙ্গে গান গায়, গল্প করে,—কিন্তু তাহার মনের ভিতর বীণা প্রবেশ করিতে পারিল না।

তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহার মনে ঈর্ষা জাগাইবার জন্য বীণা কতবার তাহার সম্মুখে অন্য যুবকদের সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করিয়া দেখিয়াছে—কিন্তু কিরণ অচল, অটল। বরং সে কোন অপরিচিতকে দেখিলে নিজ হইতেই তাহাকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়।

বীণা কিরণের সম্বন্ধে যতই অকৃতকার্য্য হইতে লাগিল, ততই কিরণ যেন তাহার কাছে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ, মেয়েরা আর সব হয় ত সহ্য করিতে পারে,—কেবল তাহাদের প্রতি

ঔদাসীন্য তাহাদের অসহ্য। ইহাতে তাহাদের সঙ্কল্প ও প্রতিশোধস্পৃহা আরও বাড়িয়া ওঠে ; যেমন করিয়াই হোক্—অহঙ্কারীকে বশ করিতেই হইবে।

সেইজন্য কিরণকে শেষ পর্য্যন্ত জব্দ করিবার একটা একান্ত বাসনা বীণার মনে সর্ব্বক্ষণ জাগিয়া থাকিত। ইতিমধ্যে এক দিন সহসা অরুণের সঙ্গে তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, ও সর্ব্বপ্রথম কিরণই বন্ধুর সাদর অভিনন্দন অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে জানাইয়া গেল।

কিন্তু লীলা ফিরিয়া আসিতেই কিরণের যেন সমস্ত প্রকৃতি ওলট-পালট হইয়া গেল। তাহার সমস্ত গাম্ভীর্য্য, মেয়েদের প্রতি অনাসক্তি, ও উদাসীন ভাব—সব বদলাইয়া সে যেন একেবারে নূতন মানুষ হইয়া গেল।

দুই চার দিনের মধ্যেই তাহারা অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত দিন ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাবার সময় ছাড়া কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িত না। এক সঙ্গে বেড়ান, হাসি, গল্প, গানে তাহারা একেবারে মশ্‌গুল !

লীলার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা বীণার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিতেছিল। শুধু বীণা নয়—সমাজের সমস্ত মেয়েরাই কিরণের এইরূপ রুচি-পরিবর্ত্তন দেখিয়া রাগে ও হিংসার আক্রোশে জ্বলিয়া যাইত ! লীলাকে লইয়া চব্বিশ ঘণ্টা এত বাড়াবাড়ি ! লীলার আছে কি ?

অরুণের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর হইতে বীণা কিরণকে আবার নিজের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কোন দিনই তাহাকে সুবিধামত নিকটে পাইত না বলিয়া তাহার আক্রোশ ও গাত্রদাহের সীমা ছিল না। লীলা কি বেহায়া ও নির্লজ্জ !

অষ্টপ্রহর কিরণকে দখল করিয়া বসিয়া আছে! একবার তাহার সহিত একটা কথা কহিবারও উপায় নাই।

আজ হয় ত একটা সুযোগ মিলিতে পারে, বীণা আশা করিতেছিল। লীলা টেনিস্‌কোর্টে,—সে সন্ধ্যার আগে ফিরিবে না,—এই সময় যদি কিরণ আসে!

অনেকক্ষণ একা মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে বীণা নিরাশ চিত্তে আবার সামিয়ানার দিকে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। আজিকার দিনটা বৃথা! একটা অতৃপ্তি ও অবসাদে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল।

সেই সময় গেটের কাছে কাহার মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। বীণার মুহ্যমান মন আবার আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দেখিল—কিরণ মিসেস্ রায়ের সহিত কথা বলিতেছে।

১৫

কিরণ নিকটে আসিলে বীণা হাসিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল, "আপনাকে ত আর দেখাই যায় না, কোথায় ছিলেন এত দিন?"

কিরণ তাহার পাশের চৌকিতে বসিয়া পড়িল; বলিল, "আমার বাড়ীতে একজন অতিথি এসেছে—শুনেছেন বোধ হয়? সে ত বাইরে বেরোতে পারে না, তাই আমি আজকাল বাড়ীতেই থাকি।"

বীণা চাহিয়া দেখিল, এই কয় দিনে কিরণ যেন একটু ম্লান ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহার চোখে-মুখে কেমন একটা ক্লান্তি ও বিষণ্ণতার ছায়া।

কিরণ নিশ্চয় অরুণের সঙ্গে দিন রাত বদ্ধ ঘরের মধ্যে থাকিয়া তাহার সেবায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে একটু ব্যথা বোধ করিল, কিন্তু এখন তাহার এ সব কথা ভাবিবার সময় নাই। আজ তাহার অনেক কাজ!

সে বলিল, "আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে! কিন্তু তার আগে আমি একটা বিষয় বলতে চাই। আপনি ত আমাদের পরিবারের এত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু, তবু আমার সঙ্গে এত লৌকিকতা বজায় রেখে চলেন কেন? আপনার সঙ্গে ত আমাদের দুদিনের পরিচয় নয়।"

কিরণ একটু বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে হাসিয়া বলিল, "এত দিন পরে আজ এ কথা কেন মিস্ রায়? দোষটা কি শুধু আমারই? আপনিও ত আমায় সম্মান দেখিয়ে দূরেই রেখে দিয়েছেন!"

বীণার মুখ লাল হইয়া উঠিল, "না! না! আপনি যে—না—সে হয় না! আপনি অনেক বড়! আপনাকে ও-রকম ভাবে কথা বলতে আমার বড় লজ্জা করে! কিন্তু আপনার এবার থেকে আমাকে নাম ধরে ও তুমি বলে কথা বলতে হবে! অনেক দিন থেকেই এ কথা বলবো ভেবেছি—তা—সে আর সময় হয় না।"

কিরণ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিল, "আমি বলতে এখুনি রাজি আছি, কিন্তু একটি সর্ত্তে।"

বীণা মুখ তুলিল। কিরণের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিতেই সে তখনি চোখ নামাইয়া লইল। বলিল, "কি সর্ত্তে?"

"—তুমিও আমায় কিরণ বলে ডাকবে, আর তুমি বলে কথা বলবে—শুধু এই সর্ত্ত! জানো ত? আমি বড় একরোখা লোক,—যা একবার বলি, তাই করি!"

গম্ভীরপ্রকৃতি কিরণকে আজ এত লঘুভাবে কথা বলিতে ও হাসিতে দেখিয়া বীণা মনে মনে আশ্বস্ত হইল। এবার তবে হয় ত তাহার চেষ্টা সফল হইতেও পারে! সে বলিল, "যাই হোক— আজকে আপনার—না—তোমার, এমনভাবে লুকিয়ে থাকা বড় অন্যায়! তুমি না থাকলে সব আমোদই মাটি হয়ে যায়।"

"—আমার জন্যে? শুনেও সুখ আছে! কিন্তু যদি আমার জন্যে তোমার আমোদ নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে ওদের দশাটা কি হবে?" কিরণ বীণার মুগ্ধ উপাসকদের দিকে আঙুল দেখাইয়া হাসিতে লাগিল।

"যাও তুমি!" বীণা তর্জ্জন করিয়া বলিল, "ওদের কি হবে—না হবে—তা আমি কি জানি?"

"—আহা! বেচারারা! তুমি নিশ্চয়ই তাদের ভুলে যাওনি! ওই যে নতুন সিভিলিয়ান্‌টি—কি নাম—ভাল—দত্ত বুঝি? হাঁ! মিঃ দত্ত ত তুমি ব্রীজ্‌ খেলা ভালবাস না বলে সে খেলাই ছেড়ে দিলে!"

"—মিথ্যে কথা! সে রোজই লীলার সঙ্গে খেলে!" কিরণ হাসিয়া বলিল, "তার পর—ঐ চৌধুরী—বেচারার শরীর কত খারাপ—তবু ছুটি নিয়ে দেশে যেতে পারে না—সে কার জন্যে? আর ঐ ব্যারিষ্টারটি? তুমি সেদিন চৌধুরীর সঙ্গে হেসে কথা বলছিলে বলে' বেচারা পোলো খেলতে খেলতে আর একটু হ'লে খুন হয়েছিল আর কি!"

বীণা লজ্জা ও বিরক্তিতে লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, "আঃ! থামো না তুমি! কি যে সব বল! ওরা যদি ছেলেমানুষী বা পাগলামি করে, সে কি আমার দোষ? আমি ওদের ঘৃণা করি!"

"—তাই না কি? আমি ত জানতুম, কিছু দিন আগে তুমি অন্ততঃ একজনকে ঘৃণা করতে না!"

বীণা মুখ নত করিল। সে জানিত, তাহার বিবাহ-ভঙ্গের কথা লইয়া সকলেই আলোচনা করিতেছে। কিরণের এ বিষয়ে কি মত জানিতে তাহার আগ্রহ জন্মিল।

"—তুমি যার কথা বোলছো, সে আমি বুঝেছি! আমারো বলবার অনেক কথা আছে। এসো! উঠে একটু বেড়ান যাক্।"

তাহারা দুইজনে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে টেনিস্ কোর্টের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে ব্যাণ্ড বাজিতেছিল।

বীণা গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি শুনেছ বোধ হয়, অরুণের কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পেয়েছি। সে তার অবস্থার কথা সব আমায় লিখেছিল, আর আমাদের বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল। তুমি ত জান, আমাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ মোটে তিন মাস আগে হয়েছিল—তবু সে যদি নিজে এ প্রস্তাব না করতো, তা হলে আমি নিজে থেকে কখনো তাকে ছাড়তে পারতুম না। কিন্তু তার মন বড় উঁচু, সে নিজেই এ প্রস্তাব করে পাঠালে,—আমার ওপর এত বড় অবিচার করতে পারলে না সে। মা-ও এটা শ্রেয়ঃ মনে করলেন, কারণ আমি এ সব বিষয়ে বড় দুর্ব্বল। তার চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে—এ চিন্তা আমায় যেন পাগল করে তুলেছিল! আমি একেবারে বিপর্য্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম!"

কোর্ট হইতে লীলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তাহার সঙ্গীদের উচ্চ চীৎকার ও পরিহাস ও লীলার মধুর হাসির শব্দ কাণে আসিতেই কিরণ আত্মবিস্মৃতের মত উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বীণা কি বলিতেছে, সে কথা আর তাহার কাণে গেল না।

লীলা ব্যাট হাতে তখন ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। কিরণ মুগ্ধ অতৃপ্ত নেত্রে তাহার ঘর্ম্মাক্ত

রাগ-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কত দিন সে যেন লীলাকে দেখে নাই, কত দিন যেন সে তাহার স্বর শোনে নাই, এমনি পিপাসিত বুভুক্ষিত দৃষ্টি!

ফিরিবার মুখে লীলার দৃষ্টি কিরণের উপর পড়িল। তাহার মুখ সেই মুহূর্ত্তে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যের মনান্তর ও বিচ্ছেদের কথা ভুলিয়া সে আগের মতই ঘনিষ্ঠভাবে চীৎকার করিয়া বলিল, "এই যে কিরণ! কখন এলে?" সে কথা শেষ করিয়াই ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কিরণ তখনি গম্ভীর হইয়া গেল।

সে কোন কথা না বলিয়া টুপি তুলিয়া কেবল একটু হাসিল, ও তখনি বীণার সঙ্গে বাগানের অন্য দিকে ফিরিয়া গেল।

তাহাদের এ ভাব বীণার চক্ষু এড়ায় নাই। সে আজ কিরণকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে পাইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইল।

পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া কিরণ বলিল, "তা হলে অরুণকে তুমি সত্য সত্যই একেবারে ত্যাগ করলে? অবশ্য, আমার এ বিষয়ে বলবার কিছু নেই! আমি শুধু জিজ্ঞেস্ করছি!"

বীণা চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া তাহার মুখে নিজের গাঢ়-কৃষ্ণ চোখের স্থির দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল; বলিল, "তোমার বলবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। তুমি কি তার বিশ্বাসী বন্ধু নও? আমি এ সম্বন্ধ ভঙ্গ করে তাকে চিঠি দিয়েছি। সুতরাং আমাদের মধ্যে সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কিরণ! তুমি শুধু তার বন্ধু নও, আমাদের পরিবারেরও তুমি বিশেষ বন্ধু! তুমি সত্য করে বল, এতে আমার অন্যায় কিছু হয়েছে?"

কিরণ তখনি কোন উত্তর দিতে পারিল না, সে নীরবে ভাবিতে লাগিল। লীলা অরুণের সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে

তাহার মন ঘৃণা ও রাগে দগ্ধ হইতেছিল। এখন বীণা যদি মত বদলায়, তবেই সব দিক রক্ষা হয়। নয় ত সে ব্যাপারের শেষ যাহা দাঁড়াইবে, তাহা মনে ভাবিবারও তাহার শক্তি ও সাহস ছিল না। আজ সে বীণার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলিয়া তাহার মন ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে বলিয়াই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বীণা যখন তাহাকেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করিল, তখন সহসা সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া বীণা আবার বলিল, "আমি জানি, লোকে এ জন্যে আমায় যথেষ্ট নিন্দা করছে, কিন্তু আমার দোষটা কি? আমি সরলভাবে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে তাকে সত্য কথা জানিয়েছি, এই ত? মানুষের মনের ওপর ত কারো জোর চলে না। আমার মন যখন তাকে এ অবস্থায় স্বামী বলে স্বীকার করে নিতে পারলে না, তখন লোকলজ্জার খাতিরে সে অস্বীকারকে চেপে রেখে আমি যদি তাকে বিয়ে করতুম, ও তার ফলে আমাদের দুজনেরই জীবন নষ্ট হয়ে যেতো, সেইটাই কি ভাল হ'ত?"

কিরণ এবার কথা বলিল। তাহার ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ চিত্ত স্বার্থের জন্য অন্যায় কথা বলিতে পারিল না। সে বলিল, "যদি কেউ এ জন্যে তোমায় দোষ দেয়, সে তার ভুল। আমি কখনো তোমার এ কাজ অন্যায় হয়েছে বলতে পারি না। এটা মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষয়, এখানে কোন বাইরের জোর চলতে পারে না।"

বীণার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "জানি আমি! তুমি কখনো আমায় সারা জীবনের মত একটা ভুল করতে বলতে পারো না! এর মধ্যে আরো একটা কথা আছে। কিছু দিন থেকে আমি বুঝেছি, আমাদের এ সম্বন্ধটা ভুল হয়েছিল।"

"তাই না কি?" কিরণ একটু আশ্চর্য্যভাবে বীণার মুখের দিকে চাহিল।

বীণা মাথা হেঁট করিল। বলিল, "সত্যই তাই। আমাদের সম্বন্ধ বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল। তখন আমি নিজের মন বুঝতে পারি নি, এখন বুঝেছি—অরুণকে আমি কখনো এভাবে ভালবাস্‌তে পারি না।"

কিরণ বলিল, "তা হলে এটা ভেঙে গিয়ে সব দিক থেকেই ভাল হয়েছে বলতে হবে! তুমি যে এত ব্যাপার চেপে না রেখে একটা নিষ্পত্তি করে ফেলেছ, তাতে আমি খুব খুসি হলুম।"

কিরণ মুখে এ কথা বলিলেও তাহার অন্তর নিরাশ হইয়া গেল। সে জানিল—তাহার আর কোন আশা নাই। অরুণের নিকট হইতে লীলাকে ফিরাইয়া লইবার আর কোন উপায় রহিল না।

তাহারা বড় সামিয়ানার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। বিদ্যুতের উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত, ভিতর হইতে পিয়ানোর মধুর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

বীণা বলিল, "তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা কথা হয়ে গেল, ভালই হয়েছে। এত দিন এটা যেন আমার মনে একটা ভারের মত চেপে ছিল। তোমার কথা ভেবে আমার এত ভয় হ'ত—সে আর কি বোলবো!"

কিরণ বীণার কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমার জন্য ভয় হ'ত? তার মানে? আমি ত তোমার এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

"অর্থাৎ, আমি ভেবেছিলুম—যে তুমি—তুমি"—বীণার কথা বাধিয়া গেল। সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও লজ্জিতভাবে মুখ নত করিল।

তার পর একটু থামিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "আমি ভাবতুম, তুমিও হয়ত এর পরে আমার সম্বন্ধে একটা মন্দ ধারণা করবে। অন্য সবাই যেমন বল্ছে, হয় ত তোমারও মত সেই রকম হবে, তাই ভেবে আমার বড় ভয় হ'ত।"

কিরণ বিষণ্ণভাবে হাসিল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুকের ভিতর হইতে উঠিয়া ধীরে মিলাইয়া গেল। তাহার মতামতে কাহার কি যায় আসে? এই ত সেদিন লীলা তাহার সমস্ত অনুরোধ, যুক্তি-তর্ক সবই অগ্রাহ্য করিয়া কি ব্যবহারই তাহার সহিত করিতেছে!

সে বলিল, "তুমি এ-কথা এ রকম ভাবে ভেবে কষ্ট পেয়েছ, শুনে আমার বড় আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস ছিল—আমার ধারণা বা মতামতে কারো কিছু যায়-আসে না। এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য এত কষ্ট পেয়েছ কেন বীণা?" কিরণ এবার একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত বীণার মুখের দিকে চাহিল।

বীণা তাঁবুর সামনে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, কিরণের দৃষ্টি ও কথার কোমলতায় সে সলজ্জ সুখাবেশে সিঁদূরের মত রাঙিয়া উঠিল। এত দিনে বুঝি-বা তাহার চেষ্টা সফল হয়! তাহার সত্যই আজ অত্যন্ত লজ্জা হইতেছিল। তবু সে জোর করিয়া মুখ তুলিল। তাহার যাহা বলিবার আছে, তাহা আজই যে বলিতেই হইবে! সময় ও সুযোগ ত সব দিন আসে না!

"আমি যদি বলি,—আমার কাছে তোমার ধারণা বা মতামত অমূল্য—তা হলে—তা হলে কি তুমি খুবই আশ্চর্য্য হবে?" কথাটা শেষ করিয়াই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া একটা আলোর দিকে চাহিয়া রহিল।

কিরণ আজ কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সৌন্দর্য্যের বশ সংসারে সকলেই, বিশেষ যদি সেই রূপের প্রতিমা তাহার

মনের অনুরাগ নিজের মুখে কোন পুরুষকে জানায়। সে সময় মন সংযত করিয়া রাখা পুরুষের পক্ষে অসাধ্য। বীণার কথার মর্ম্ম বুঝিতে কিরণের বিলম্ব হয় নাই। সে আজ অরুণের সম্বন্ধে বীণার মনের ভাব বুঝিতে আসিয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে সে যে আভাস পাইল, তাহা সে কোন দিন মনে করে নাই। কথাটা সহসা শুনিয়া সে কিছু ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বীণাও কথাটা বলিয়া ফেলিয়া লজ্জিত ও কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। আর সকলের সহিত সে অসঙ্কোচে এমন আলাপ করিতে পারে, কিন্তু কিরণের সঙ্গে এ ভাবে কথা বলা—কি লজ্জাকর! আগে সে এতটা বুঝিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার শীতল বাতাস তাহার চূর্ণ কুন্তল উড়াইয়া শির-শির শব্দে বহিয়া গেল। অন্ধকার আকাশে দুই একটি করিয়া তারা ফুটিয়া তাঁহাদের দিকে স্তিমিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সহসা কিরণ সচকিত ভাবে নিজেকে সংযত করিয়া বীণার দিকে চাহিল। তাহার কথার উত্তরে সে শুধু খুব সহজ ও কোমল স্বরে বলিল, "আমার তুচ্ছ ধারণার যে সংসারে একজনের কাছেও কোন মূল্য আছে, তা জেনে বড় খুসি হলুম বীণা! তুমি এ-সব আর ভেবো না। আমি ত আগেই বলেছি—এখানে বাইরের লোকের মতামত চলতে পারে না, এ মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস।"

তাহারা দুইজনে জলযোগের জন্য তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল।

১৬

মিঃ ঘোষ তাঁহার ঘরের সাম্‌নের বারাণ্ডায় একা বসিয়া ছিলেন। আসন্ন সন্ধ্যার মৌন অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে চারিদিকে তাহার ছায়া বিস্তার করিতেছিল।

মিঃ ঘোষ শুষ্ক হৃদয়ে ভাবিতেছিলেন, বহু দিন পূর্ব্বের তাঁহার নিজের জীবনের কথা। অতীতের যে-সব ছোট-বড় নানা ঘটনার স্মৃতি মনের মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া আসিয়াছিল, সেদিনের একটি ঘটনায় সে-সব কাহিনী আবার উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার মানস-পটে জাগিয়া উঠিয়াছে।

পিতার মৃত্যুতে যে দিন তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইলেন, তখন তাঁহার বয়স নিতান্তই অল্প। সেদিন তাঁহার চারিদিকে যে-সব হীনবুদ্ধি কুটিল অনুচরবর্গ জুটিয়াছিল, তাহাদের প্রভাব এড়াইয়া নিজের মতে চলিবার মত মনের শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। সে সময়কার তরল মস্তিষ্কের ফলে সর্ব্বক্ষণ আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকায়, সেই সুযোগে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নামে প্রজাদের উপর যথেচ্ছাচার করিয়া তাহাদের শোষণ করিতেছিল। তাহাদের সুব্যবস্থার গুণে প্রজাদের কোন অভাব-অভিযোগ তাঁহার গোচরে আসিতে পারিত না, আসিলেও তাহারা তাঁহাকে সমস্ত বিষয় এমন সুকৌশলে বুঝাইয়া দিত যে, তিনি তাহাদের কূট চক্রান্তের বিষয় কিছুতেই ধরিতে পারিতেন না। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অধিকারে সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল।

তাঁহার বিষয় প্রাপ্তির প্রায় দুই বৎসর পরে এক দিন তিনি তাঁহার অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যানে সন্ধ্যার সময়ে একা বাঁধান চত্বরে বসিয়াছিলেন। সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী, ঘাটের চারিধারের তাল ও নারিকেল-শ্রেণীর ছায়া বুকে লইয়া ধীর সমীরণে কাঁপিতেছিল। চত্বরের দুই ধারে দুইটি পুষ্পিত চাঁপার গাছ। চম্পকের তীব্র-মধুর সুবাসে সেখানকার বাতাস ঘন ও মদির-সৌরভময় হইয়া ফিরিতেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গভীর হইয়া আসিয়াছে, সেই সময়ে

নিঃশব্দে এক দীর্ঘাকার পুরুষ পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের শাখান্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সহসা সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত ভাবে তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অনুচরবর্গ তখনো কেহ আসিয়া জোটে নাই। তিনি বলিলেন—"কে তুমি? বাড়ীর ভিতরের বাগানে কি সাহসে প্রবেশ করেছ?"

সে ব্যক্তি বলিল, "ভয় নেই হুজুর! আমি কোন কু-মতলবে এখানে আসিনি। আমি হুজুরের অধীন মণ্ডলগড় পরগণার রামগোবিন্দ দত্ত। দুঃখী প্রজাদের পক্ষ থেকে দুটো কথা নিবেদন করতে এসেছি। অনেক চেষ্টা করেও তো আপনার সঙ্গে নিরালায় দেখা করবার কোন সুবিধে করতে পারিনি, অগত্যা এই উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হলো।"

সেই দিন তাঁহার জীবনের মধ্যে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। তাহার পর হইতে মণ্ডলগড় পরগণা লইয়া কত বিরোধ, মামলা-মোকর্দ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিল। সর্ব্বশেষে তাঁহার সেই দুরপনেয় কলঙ্ক,—এক মুহূর্ত্তের মোহের তাঁহার সেই বিষম ভ্রম—যাহা তাঁহার সমস্ত জীবনকে একেবারে বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত করিয়া দিল।

মিঃ ঘোষ ভাবিতেছিলেন, পাপের বীজ একবার বপন করিলে তাহার পর শত চেষ্টায়ও আর তাহা নির্ম্মূল করিতে পারা যায় না। সময়ে সে পত্রে-পুষ্পে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবেই,—তাহা রোধ করা বুঝি মানুষের সাধ্যের অতীত। নতুবা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিনের দুর্ব্বলতায় তিনি যে অন্যায় করিয়াছিলেন,—যে সব বিষয় বহু দিন হইল সকলের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে,—এত দিন পরে আবার তাহা নূতন রূপ ধরিয়া কেমন করিয়া তাঁহারই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল?

অন্ধকার আকাশে একটি মাত্র তারা ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার মাথার উপর জ্বলজ্বল করিতেছিল।

মিঃ ঘোষ সেই সন্ধ্যা-তারার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া নিজের মনে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "ওঃ! ঠিক সেই তারই মত দীর্ঘ সুগঠিত আকার! ঠিক তেমনি ধীর অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি! আর তারি মত সেই অগ্নিময় মর্ম্মভেদী দৃষ্টি! সে ঠিক তার বাপেরই অনুরূপ প্রতিকৃতি! আমি মূর্খ—নিতান্ত অন্ধ আমি! তাই তাকে দেখেও কোন সন্দেহ আমার মনে জাগে নি! আমি একেবারে এ সব কথা ভুলে গিয়েছিলুম!"

তাঁহার পরিচয় পাইবামাত্র অসিতের নয়নে যে রুদ্রাগ্নির শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্মরণে আসিবামাত্র মিঃ ঘোষ সহসা শিহরিয়া উঠিলেন।

এখন সেই বহু দিন পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আসিয়াছে! তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ফল ভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু হায়! নির্ম্মলা? সে যে তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না! তাহার উপায় কি হইবে?

সেই সময় অন্ধকার বারান্দায় একটি অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। মিঃ ঘোষের দৃষ্টি সে দিকে পড়িবামাত্র তিনি সহসা চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এই! কে ওখানে? কে আসছে? তেওয়ারি! তেওয়ারি! বেহারা—"

"বাবা! বাবা! আমি! আমি যে! তুমি হঠাৎ এত ভয় পেলে কেন বাবা? আমি ছাড়া এখানে আর কে আসবে?" নির্ম্মলা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

"ওঃ! তুই? মিলু, তুই? আঃ! তাই ভাল! অন্ধকারে

আমি ঠিক বুঝতে পারি নি—সত্যিই বড় চমকে উঠে ভয় পেয়েছিলুম !” বলিতে বলিতে অত্যন্ত শ্রান্ত ভাবে মিঃ ঘোষ আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বাস প্রবলবেগে বহিতেছিল।

নির্ম্মলা সংশয় ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া, নিঃশব্দে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে মিঃ ঘোষের জীবনে ঘোর অশান্তি ও উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। অনেক সময় তিনি নিজের মনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন; নির্ম্মলা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পূর্ব্বের মত সুস্থ ও প্রফুল্ল করিতে পারিত না; ভয়ে ও উদ্বেগে সেও দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। অথচ কি যে এ অশান্তির কারণ, তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না।

শুধু সে লক্ষ্য করিয়াছিল, অতি অল্প কারণে মিঃ ঘোষ আজকাল চমকাইয়া উঠিতেন। সন্ধ্যার পর নিজে সমস্ত দরজা-জানালা পরীক্ষা করিয়া দেখা ও দ্বারোয়ানকে সাবধান থাকিতে উপদেশ দেওয়া তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্ব্বক্ষণ কিসের যেন একটা আতঙ্কে তিনি আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। বাড়ীর অন্য-কেহ তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করিলেও, নির্ম্মলার দৃষ্টি হইতে কিছুই এড়ায় নাই। কিন্তু কিসের এ ভয়? কেন এ উদ্বেগ? এত দিন ত এ-সব অশান্তির কোন আভাস ছিল না? তিনি কি সর্ব্বক্ষণ কোন অজ্ঞাত শত্রুর ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন? এত কাল পরে এমন শত্রু বা তাঁহার কোথা হইতে আসিল? নির্ম্মলা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিত, তাঁহার হয়তো মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগ হইয়াছে; কিছু দিন পরে হয়তো তিনি উন্মাদ হইয়া যাইবেন।

সকালে চা ঢালিতে ঢালিতে নির্ম্মলা বলিল, “বাবা! আজ

আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। আজ এখনি তেওয়ারিকে পাঠিয়ে আমি অনিল বাবুকে ডেকে পাঠাব। তোমার শরীর যে কত খারাপ হয়েছে, সে তুমি কিছুই বুঝছো না।"

"—ডাক্তার আমার কি করবে মিলু? আমার তো শরীরে কোন অসুখ নেই? আমি তো ভালই আছি মা?"

"—ভাল আর কই আছ? এই ক'দিনে তুমি কি-রকম শুকিয়ে গেছ—একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখ দেখি? খালি সব সময়ে কি ভাবছো,—আর থেকে থেকে চমকে ওঠো,—আর জিজ্ঞেস করলে শুধু বল—আমি তো ভাল আছি! সে দিন রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে তুমি ঠিক কালকের মত চেঁচিয়ে উঠেছিলে! আমি ঘুম ভেঙ্গে ছুটে গিয়ে দেখি—তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি-সব বকছো!"

"—তাই না কি? কই! আমার তো কিছু মনে নেই নির্ম্মল? কি বলছিলুম আমি—বল তো?" মিঃ ঘোষ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

নির্ম্মলা বলিল, "কি বলছিলে, তা আমি বুঝতে পারি নি। বিজ বিজ করে জড়িয়ে জড়িয়ে কি সব বল্লে, তার পর পাশ ফিরে আবার তখনি ঘুমিয়ে পড়লে। আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে চলে এলুম। তোমার তো এ-রকম কখনো কিছু ছিল না। নিশ্চয় এ-সব শরীর খারাপ হবার পূর্ব্ব-লক্ষণ! তোমার সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত। তা তো তুমি কিছুতে শুনবে না।"

মিঃ ঘোষ আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন, "ওঃ! তা হবে! কিছু স্বপ্ন-টপ্ন দেখে থাকবো হয় তো! সত্যি, আজ কয়েক দিন থেকে আমার মনটা ভাল নেই—নির্ম্মল! একটুতেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, নানা ভাবনায় মাথাটা ঘুলোতে থাকে। তাতেই তোরা ভাবছিস—

আমার শরীর খারাপ হয়েছে, কিন্তু সে সব কিছু নয়। কিন্তু তুইও তো মা! আর আজকাল আমার কাছে মোটেই আসিস্ না,—সব সময় আমায় একলা ফেলে নিজেও একা একা ঘুরিস্—তাতেই তো আমার আরও খারাপ লাগে!"

নির্ম্মলা অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "হ্যাঁ! তুমি এখন তাই বলবে বৈ কি? আমি সব সময় এসে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে চলে যাই,—তুমি যে কি ভাবতে থাক, তা তুমিই জানো—একবারও আমায় কাছে ডাক না। কালও তো আমি কতক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। মনে করলুম, তুমি দেখতে পেলে আমায় ডাকবে। শেষে তুমি আর ডাকলে না দেখে যেমন একটু এগিয়েছি, আর তুমি অমনি চেঁচিয়ে উঠলে। আজকাল তুমি আমার কথা আর কিচ্ছু ভাব না!" নির্ম্মলা চোখের জল গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া লইল।

মিঃ ঘোষ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার মাথাটা বুকে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "ও কি? কাঁদছো তুমি? কি পাগলামি দেখ? তোমার কথা ছাড়া আমার সংসারে আর কি ভাব্বার কথা আছে নির্ম্মল? সে তো তুমি জানই—তবু এত অভিমান? দু'দিন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম—তাই—না হলে তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে মা?" তাঁহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিল।

নির্ম্মলা একটু শান্ত হইলে মিঃ ঘোষ তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য বলিলেন, "আমাদের নতুন বাগানে তোমার পার্টির কি ব্যবস্থা করছো নির্ম্মল? তোমার হাত তো এখন বেশ সেরে গেছে,—আর মিছে দেরী করে কি হবে? এইবার এক দিন তার জোগাড়-যন্ত্র করা যাক, কি বলো?"

নির্ম্মলা আজ আর এ-প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। সে উদাসীন ভাবে বলিল, "না বাবা! এখন আর ও-সব হাঙ্গামায় কোন দরকার নেই। তার চেয়ে চলো—আমরা কোথাও কিছু দিনের জন্যে বেড়িয়ে আসি। তাতে তোমার শরীরও সুস্থ হবে, মনও ভাল থাকবে। এখানে বসে বসে তো তোমার অনেক দিনই কাটলো!"

মিঃ ঘোষ বলিলেন, "সে তো ভাল কথা! চল, কিছু দিন বাইরে ঘুরে আসা যাক্। আমার তাতে কিছু আপত্তি নেই! কিন্তু তা বলে তোমার বন্ধুদের এ আনন্দ থেকে কেন বঞ্চিত করবে মা? তারা তোমাকে অত করে ধরেছিল, এক দিন তাদের সবাইকে ডেকে আমোদ আহ্লাদ করো,—তার পর যাওয়ার কথা ভাবা যাবে, কেমন?"

মিঃ ঘোষ এত সহজে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় নির্ম্মলার হৃদয়-ভার অনেক লঘু হইয়া গেল। সে বলিল, "তা বেশ! আমি তা হলে আজ দুপুর বেলা বসে কাকে কাকে বলতে হবে, তার একটা লিষ্ট করে তোমায় দেবো। তার পর তুমি সব বন্দোবস্ত করো। ভাল কথা—অসিত বাবুরা তো এক দিনও এলেন না? সে বাড়ীটা ছাড়া আর তাঁদের কোথায় পাওয়া যাবে, সেটা তো তুমি সেদিন জেনে নিয়েছিলে, না? না হলে তাঁদের বলা হবে কি করে?"

যেখানে বেদনা—না জানিয়া নির্ম্মলা ঠিক সেই স্থানেই আঘাত করিল। মিঃ ঘোষের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। নির্ম্মলা তবে এখনো তাহাদের ভুলিতে পারে নাই! মাত্র দুই ঘণ্টা যাহাদের সহিত দেখা হইয়াছিল, আজ এক মাস ধরিয়া তাহাদের স্মৃতি কেন সে মনে মনে জাগাইয়া রাখিয়াছে? তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন, সে পরেশের বিশেষ নাম করে না, অসিতের সংবাদ জানিবার জন্যই তাহার মন উন্মুখ হইয়া আছে।

তিনি বলিলেন, "তারা বোধ হয় আমাদের সঙ্গে মিশতে রাজি নয় নির্ম্মল! এখানে আসবার জন্যে তাদের কত করে আমরা বলে এলুম, সে তো তুমি জানোই, তবু যখন তারা এক দিনও এলো না, বা কোন খোঁজ-খবর করলে না, তখন আবার নতুন করে তাদের সঙ্গে সদ্ভাব করতে যাওয়া আর আমাদের বোধ হয় উচিত হবে না, কি বলো?"

এ উত্তর নির্ম্মলার মনঃপূত হইল না। সে একটু ভাবিয়া বলিল, তাঁরা আমাদের সঙ্গে মিশতে চান না, এ কথা সত্য বলে আমার তো মনে হয় না বাবা! তবে যে আসেন নি এত দিন—তার হয় তো অন্য কারণ থাকতে পারে। সেটা যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ কি করে এমন একটা কথা বিশ্বাস করা যাবে? আর একবার তাঁদের গার্ডেন-পার্টির দিন নিমন্ত্রণ করে দেখা যাক্! বিশে[illegible] দিন যখন তুমি নিজেই তাঁদের এ কথা বলেছিলে! পরিচয় হ[illegible] সেদিন তাঁদের কাছে অত উপকার পাওয়া গেল, এখন না [illegible] কি ভাল দেখায়?"

ভাল যে দেখায় না, তাহা তো মিঃ ঘোষ বেশ ভালই জানেন, কিন্তু তাহা ছাড়াও আর যাহা কিছু তিনি জানেন, তাহা তো নির্ম্মলাকে বলা চলে না। সুতরাং কি বলিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন—তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মিঃ ঘোষ বলিলেন, "বলা উচিত হলেও তাদের বলবার কোন উপায় নেই নির্ম্মল। তাদের ঠিকানার কথা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিন্তু তখন অন্য কথা এসে পড়ায় সে-কথার আর উত্তর পাই নি। কাজেই…"

বাধা দিয়া নির্ম্মলা বলিল, "এটা কিন্তু ঠিক হোল না বাবা! আজ

বিকেলে, চলো—লিলিদের ক্লাবে যাওয়া যাক্। কিরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো, যদি তিনি কিছু জানেন।”

১৭

কিরণ বীণার সঙ্গে চলিয়া গেলে, লীলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেদিনের সমস্ত আনন্দ উৎসব খেলা আমোদ সবই যেন এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। জীবনের পরিপূর্ণ সুধাপাত্র যে এক নিমেষে এমন ভাবে শুকাইয়া যাইতে পারে, তাহা আগে কে জানিত ?

বিস্তর চেষ্টা করিয়াও লীলা তাহার বর্ত্তমান অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। তাহার আহত অভিমান মনে মনে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। কিরণ যদি অনর্থক রাগ করিয়া তাহাকে এত উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করিতে পারে, তবে তাহারি বা তাহাতে ক্ষতি কি ? সেও তাহার সহিত আর সম্বন্ধ রাখিবে না ! কিরণের বন্ধুত্ব হারাইলে জগৎ কিছু আর তাহার অন্ধকার হইয়া যাইবে না। সে ছাড়া সংসারে ভাবিবার ও করিবার কাজ যথেষ্টই আছে। কিন্তু মনের ভিতর হইতে এ সংকল্পে সে কোথাও কোন বল পাইল না। কিরণের কঠিন মুখ ও এই বিষম উপেক্ষা তাহার অন্তরে শেলের মত বাজিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে ছুটিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া আসে, কিন্তু সে সেখান হইতে এক পাও নড়িতে পারিল না। শুধু স্তব্ধ হৃদয়ে সন্ধ্যার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হইতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কিরণের সঙ্গে আর লীলার দেখা হয় নাই। সে যখন অরুণকে দেখিতে বসন্তপুরে যাইত, কিরণ তাহার আগে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। সন্ধ্যায় ক্লাবে খেলিতে আসাও কিরণ ছাড়িয়া দিয়াছিল। যেখানে যখন লীলার সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা, কিরণ সযত্নে সে-সব স্থান পরিহার করিয়া চলিয়াছে। তাহার এই স্পষ্ট বিরাগে লীলা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। তবু এত দিন তাহার আশা ছিল, সে কিরণের সঙ্গে দেখা হইলেই তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিবে; কিন্তু আজ যখন তাহাদেরই নিমন্ত্রণে তাহাদের বাড়ী আসিয়া লীলার আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া কিরণ বীণার সঙ্গে ফিরিয়া গেল, তখন তাহার আশা করিবার আর কিছুই রহিল না।

অথচ একটা কথা লীলা কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। কিরণ তাহার উপর রাগ করিয়া অন্তরে থাকার যে বেদনা তাহার মনে সর্ব্বক্ষণ কাঁটার মত বিঁধিয়া ছিল, অরুণের কাছে গেলেই সে-সব তাহার মন হইতে তখনি ঝরিয়া যাইত। সে যতক্ষণ অরুণের নিকট থাকিত, হাসি, গল্প, গানে সে প্রফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। অরুণের প্রতি অগাধ ভালবাসায় তাহার মন তখন পরিপূর্ণ,—কিরণের কথা তখন তাহার মনেও পড়িত না, কিন্তু যেমন সে অরুণকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিত,—সে গৃহের চারিদিকে কত দিনের কত পরিচিত দৃশ্য, কত দিন পূর্ব্বের সুখময় স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত, তখন আবার তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ব্যথা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত,—খেলায় আমোদে, পড়াশুনায় কিছুতেই সে শান্তি পাইত না,—তাহার মন অনুক্ষণ কিরণের জন্য কাঁদিয়া ফিরিত। এ কি বিষম এক সমস্যায় সে পড়িল! কিরূপে বা কোথায় এ সমস্যার সমাধান হইবে, কিছুই সে ভাবিয়া পাইত না।

লীলার খেলার সঙ্গীরা এতক্ষণে খেলা ও বিশ্রাম শেষ করিয়া জলযোগের জন্য দলে দলে তাঁবুতে ফিরিতেছিল। তাহাদের কলরবে লীলা সচেতন হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

কিছু দূরে বীণা ও কিরণ তাঁবুর সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল। লীলা দেখিল, বীণা আজ কি সুন্দর বেশে সাজিয়াছে! তাহার কালো চোখের সলজ্জ ও সানুরাগ দৃষ্টি কিরণের মুখের উপর! কিরণ কি কথা বলিতেছে, তাহা লীলা শুনিতে পাইল না, তবে কিরণের মুখেও পূর্ব্বের মত বীণার সম্বন্ধে উদাসীন ভাব নাই!

এ দৃশ্য লীলা বেশীক্ষণ দেখিতে পারিল না। সে মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে একেবারে নিজের ঘরে আসিয়া অন্ধকারেই বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে ক্ষান্ত ঘরে আলো দিতে আসিয়া, তাহাকে এমন সময়ে বিছানায় দেখিয়া বলিল, "এ কি গো, দিদিমণি! এমন সময়ে বিছানায় শুয়ে যে? কিছু অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

লীলা একটু অন্যমনা হইবার জন্য বলিল, "না, অসুখ করেনি—এমনি একটু শুয়ে আছি। খেলতে খেলতে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল তাই। তুই একটু বোস্ দেখি এখানে। গল্প কর, শোনা যাক্!"

ক্ষান্ত গল্পের নামে আশ্বস্ত হইয়া তখন মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিল। বলিল, "তা মাথা আর ঘুরবে না? দিবে-রাত্তির এই দস্যিগিরি! হাজার হোক বলি মেয়েমানুষ ত? চব্বিশ ঘণ্টা অমন পুরুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে বেড়ালে শরীর থাকে কখনো? তা থাক, একটু শুয়েই থাক—জীরেন হোক একটু।"

লীলা বলিল, "তোর এখন কাজ কিছু আছে না কি?"

ক্ষান্ত হাত নাড়িয়া বলিল, "কাজের কথা আর বোলো না বাছা!

পোড়া কাজের কি আর শেষ আছে? যতই করে যাচ্ছি, ততই বাড়ছে! সে মরুক গে যাক্, তুমি একলাটি পড়ে আছ বুঝি একটু এইখানে! হ্যাঁ গা দিদিমণি! একটা কথা মনে হলো—বলি, তুমি ত এত জায়গায় যাও,—এখানকার ডেপুটি বাবুর বউকে দেখেছ কখনো?"

"না, কেন বল তো?" লীলা বুঝিল, ক্ষান্ত আজ একটা নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।

"তাই বলছিলুম—এখানকার সকলেই তাকে জানে কি না! বড় চমৎকার লোক! দেখতেও বেশ সুন্দর! আর সব মেয়েমহলে ডেপুটির স্ত্রী আছেই! তবে তোমরা আর দেখবে কি করে! ডেপুটি বাইরে খুব সাহেব—কিন্তু বাড়ীর ভিতরে সব গোঁড়া হিন্দুয়ানী! তোমাদের মত এমন খিরিষ্টানী কাণ্ড সেখানে হবার যো-টি নেই! বাবুরা বাইরে যা-খুসি করুক—মেয়েরা ঠিক থাকলেই হল! তাদের মেয়েরা পালকী ছাড়া এক-পা হাঁটে? তা মরুকগে সে-কথা! এখন যা বলছিলুম—সেই তাদের বাড়ী এক ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে!" ক্ষান্ত একটু ছোট বাক্স হইতে একটা পান বাহির করিল। একটি কৌটা হইতে দোক্তা লইয়া পানে মিশাইয়া পানটি আলগোছে মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "ডেপুটি বাবুর ভাই বিলেত গেছে—জানো? কি পড়া শিখতে! তার যে বৌটি, সে যে কি সুন্দরী, সে আর তোমায় কি বোলবো! এমন রূপ আমি কখনো দেখিনি—যেন একেবারে মা ভগবতী! যখন বিয়ে করে তাকে রেখে যায় তখন সে ছোট ছিল; এখন বেশ বড়টি হয়েছে! নাম তার জোছনা, তা ঠিক জোছনার মতই ফুটফুটে মেয়েটি।"

লীলা বলিল, "তুই লোকের ঘরের খবর এত সব জানিস্ কি করে? যত রাজ্যের খবর কি তোরই কাছে আসে?"

"—অবাক্ কথা! আমি না জানলুম কি করে! এ সহরে কার ঘরের কথা আমি না জানি? আর তাদের বাড়ী ত আমার বোন কাজ করে! আমি একদিন বোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেই বউটিকে দেখে এসেছিলুম! আহা! সেই রূপের জন্য ছুঁড়ির কি খোয়ারটাই হলো গো! আমার বোন তাকে বড় ভালবাসতো—সেই এখন মরছে কেঁদে কেঁদে!"

লীলা ব্যগ্র হইয়া বলিল,—"কেন? কি হয়েছে তার?"

ক্ষান্ত উৎসাহের সহিত হাত নাড়িয়া বলিল, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! একদিন হলো কি, সব ছেলেরা চাঁদা তুলে সহরে সরস্বতী পূজো করেছিল। সেইখানে ঠাকুরের স্মুমুখে তারা রাত্রে একটা থিয়েটার করলে। সহরের যত সব বড় বড় ঘরের মেয়েরা সবাই গিছলো সেখানে। ডেপুটির বউও তার ছোট জাকে নিয়ে দেখতে গেছে। তখন কি জানে ছাই, যে, এমন কাণ্ড হবে? না, তা জানলেই বা কেউ সে পোড়া থিয়েটার দেখতে যায়? তাই সব এখন ওরা বলছে—যাওয়া কেন? না গেলে ত এমন হতো না! আমি বল্লুম, মর্! তা আগে থেকে কি লোকে হাত গুণে জান্‌বে? সবাই ত আর জান্ নয়? এই যে সব এত মেয়েরা গেল—তা কারুর কিছু হলো না—আর—"

লীলা অধীরা হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে তাই আগে বল্ না? তোর জ্বালায় কি আপদেই যে পড়েছি আমি! যেখানে এক কথা বললে চুকে যায়, সেখানে কেন যে তোরা এত গজর গজর করে মরিস্, তা আমি বুঝতে পারি না! সে বউটার হল কি?"

"—সেই কথাই ত এতক্ষণ ধরে বলছি গো! তা তোমার কি আর শোনবার তর আছে ছাই! সব তাতেই তেরিয়া মেজাজ! যেন

দিবে-রাত্তির ঘোড়ার উপর জিন চড়িয়েই বসে আছ! পাঁচ কথা গুছিয়ে না বল্লে বুঝবে কি করে বল দেখি? তা সেই ত সব থিয়েটার দেখতে গেল,—শেষ হতে একেবারে সক্কাল! তখন মেয়েরা যে-যার গাড়ীতে উঠছে! ডেপুটির স্ত্রীও তার জা'কে নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ছিল! সেই সব ভীড়ের মধ্যে কোথায় না কি এক মুখপোড়া বদমাস্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যত সব মেয়েদের দেখছিল! পড়্‌বি ত পড় সেই মুখপোড়ার নজর একেবারে জোছনার ওপর! আমার বোন ওদের সঙ্গেই ছিল, সে বলে তার চোখ যেন বাঘের মত, মেয়েটাকে যেন সে একেবারে গ্রাস করছিল। ছুঁড়ির যে কি হবে—আমি ত তাই ভেবে এখন কেঁদে মরছি! বামা ত রাতদিন কাঁদছে আর কাঁদছে, সে কান্নার আর বিরেম বিশ্রেম নেই! ডেপুটির ভাই দেশে ফিরলে যে আবার কি একটা খুনোখুনি কাণ্ড বাধবে, আমার ত এখন থেকে বুক কাঁপছে!"

"—মরগে যা বকে বকে! যত সব বাজে কথা! কি যে হয়েছে, তা এ পর্য্যন্ত শুনলুম না! খালি গল্প বানানো—খালি মিছে কথা!"

ক্ষান্ত বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল।—"মিছে কথা বই কি! ক্ষেন্তি গয়লানি মিছে কথা বলবার লোক নয়, তা সবাই জানে! আমি যদি মিছে কথা বলে থাকি—এই ডণ্ডে যেন আমার মাথায় বাজ পড়ে! বলে—বাজারময় এ-কথা ঢি-ঢি পড়ে গেছে, আর আমি ওনার কাছে মিছে কথা বলছি! শোন তবে! সেই বদমাস লোকটা তাদের গাড়ীর পিছনে পিছনে গিয়ে ওদের বাড়ী-ঘর দেখে গিয়েছিলো! দিন কতক পরে জোছনা ভাত খেয়ে নিজের ঘরে দুয়োর দিয়ে ঘুমুচ্ছে,—রোজই সে এমনি ঘুমোত,—দিনে ঘুমোন অভ্যেস তার!

সেদিন সন্ধ্যে হল—তবু সে দুয়োর খোলে না। তখন সব ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল,—কিছুতেই ত তার সাড়া পেলে না। দুয়োর ভেঙ্গে দেখে ঘর খালি, জোছনা নেই—তাকে জানলা ভেঙ্গে নিয়ে চলে গেছে! জানলার গরাদে সব ভাঙ্গা—বোঝ একবার ব্যাপারখানা!"

লীলা রুদ্ধ-নিশ্বাসে গল্প শুনিতেছিল। সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "সে গেল কোথায়? কে তাকে নিয়ে গেল?"

ক্ষান্ত গম্ভীর মুখে বলিল, "কেউ সে-কথা জানে না। শুধু আমি আর আমার বোন জানি—সেই লোকটা তাকে নিয়ে পালিয়েছে।"

"—তোরা কি করে জান্‌লি?"

"—সে অনেক কথা! এক টেলিগেরাপ পিয়ন, সে একটা লাল বাইসিকেলে চড়ে সহরে অনেক অনেক দূরে টেলিগেরাপ বিলি করে বেড়ায়। তারি মুখে সন্ধান পাওয়া গেছে! আমার বোন একদিন বাজারের বটগাছতলায় শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল,—সেইখানকার এক মিন্‌সে দোকানীর সেই পিয়নটা ভাগ্নে হয়,—তারাই দুজনে ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি এ-কথা বলাবলি কচ্ছিল,—ডেপুটির কানে গেলে আবার হাঙ্গামা বাধবে ত? এখান থেকে অনেক দূরে আরামবাগ বলে একটা জায়গা আছে,—সেই লোকটা সেখানকার জমীদার। তার নামের একটা টেলিগেরাপ বিলি করতে গিয়ে পিয়ন দেখে এসেছে,—জোছনা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে সব জড়োয়া গয়না। ভাল দামী রেশমি সাড়ি পরে তাকে আরো কত সুন্দর দেখাচ্ছে!"

লীলা অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে বলিল, "এটা বড় মন্দ ঘটনা ক্ষান্ত! মেয়েটা এমন একটা খারাপ লোকের কবলে পড়লো, তার অনেক দুর্দ্দশা আছে দেখছি!"

—"তা'তো আছেই! তার স্বামী ফিরে এসে সব শুনে মেয়েটাকে আর ঐ লোকটাকে—দুজনকেই খুন করবে! তা ছাড়া সকলেই বলছে, সে লোকটাও না কি বড় পাজি,—তার স্ত্রী তার অত্যাচারে বিষ খেয়ে মরেছে!"

"—কবে এমন হোলো?"

"—সে প্রায় মাস দুই আগে! তবে আমি ত এত দিন তোমার অসুখের জন্যে বাইরে কোথাও যাই নি, তাই শুনতে পাইনি কিছু! আমার বোন এখন সেখানেই আছে। সে জোছনার সন্ধান পেয়েই সেই দিনই সেখানে চলে গেছে। তা লোকটা এদিকে ভাল, বামাকে তার কাছে থাকতে দিতে কিছু গোল করেনি। আজ বামা সহরে গোটাকতক জিনিষ কিনতে এসেছিল কি না, তাই তার মুখে আমি আজ সবই শুনলুম।"

লীলা নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া জোছনার কথাই একমনে ভাবিতে লাগিল। বেচারা জোছনা! নিতান্তই ছেলেমানুষ সে! জীবনের কঠোরতা কিছুই জানে না। হয় ত বা সে সেই লোকটার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। এখন সে যদি সে বিশ্বাস রাখিয়া চলে, তবেই ভাল! নয় তো সে অভাগা মেয়েটার কপালে না জানি কত দুর্দ্দশাই আছে!

সে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "আচ্ছা ক্ষান্ত! তোর বোন তো সেখানে থাকে—সে সেই লোকটার কথা কি বলে? সে জোছনাকে কি সত্যিই ভালবাসে? তাকে আদর-যত্ন করে তো?"

ক্ষান্ত অবজ্ঞাভরে তাহার কালো কালো ঠোঁট দুটি উল্টাইয়া বলিল, "আঃ পোড়াকপাল! ও-সব লোকের আবার ভালবাসা! ঝাঁটা মারতে হয় তাদের ভালবাসায়? তোমরা তো এ-সব কথা

কিছু জানো না দিদিমণি ! না হয় দু'-দশখানা বইই পড়েছো ! আমার তো সংসারের কাণ্ড-কারখানা দেখে দেখে মাথার চুল পেকে গেল ! ওরা কি কখনো কারুকে ভালবাসতে পারে ? ওদের দুদিনের আমোদ দুদিনেই ফুরোয় ! তারপর যে-কে-সেই ! আর এ লোকটা তো আবার শুনি এখানকার লোক নয় ! ও বাংলা দেশে থাকে ! সেখানকার মস্ত জমীদার ! এখানেও ওদের বাড়ী-ঘর আছে, মাঝে মাঝে এসে থাকে, আবার চলে যায়। তার চাকর-বাকরদের কাছ থেকে বামা তার সব কথাই শুনেছে ! এই অল্প দিনই এখানে এসেছে এবার ! এসেই এই কীর্ত্তি ! দুদিন বাদে নিজে আবার ফিরে যাবে,— আর ছুঁড়িটা রাস্তার ধারে পড়ে থাকবে—এই আর কি ! ও-সব কাজের শেষ ফলটা তো এই রকমই হয় কি না !"

লীলা বলিল, "কিন্তু এ কথাটা যখন আমি শুনলুম, তখন যাতে সে মেয়েটির কোন কষ্ট না হয়, আমি তার ব্যবস্থা করবো। তোর বোন তো সেখানেই আছে,—তাকে বলিস্, যখন তার কোন কষ্ট হবে, তখন আগে এসে যেন তোর কাছে খবর দেয়।"

ক্ষান্ত হৃষ্টচিত্তে বলিল, "তা সে দেবে। মেয়েটার একটা হিল্লে হলে সে তো বাঁচে ! সে দিন-রাত তার খোয়ারের কথা ভেবে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে। এবার যেদিন এদিকে আসবে, সেদিন তাকে বলে রাখবো।"

লীলা আবার নিজের অন্তরে অন্তরে কিরণের অভাব তীব্রভাবে বোধ করিতে লাগিল। তাহার সখা, বন্ধু, সহায়, কিরণ,—সে যে সকল বিষয়ে, সকল কাজে ছোট শিশুটির মতো তাহারই সবল আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিত ! আজ যে জোছনার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে— কে আজ তাহাকে এ বিষয়ে সুপরামর্শ দিবে ? যাহাকে না হইলে

ফাটিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতে চাহিত। সে আনন্দের দুর্জ্জয় বেগ সে আর মনের ভিতর রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত না।

সে কিরণকে বলিল, "তুমি আমাদের সঙ্গে গল্পে যোগ দাও না কেন? সত্যি—সে যে কি, কি বলে যে আমি তার বর্ণনা করবো—কি করে বল্লে যে তার সব কথা ঠিক ভাবে বলা হয়, তা আমি ভেবেই পাই না! এমন সতেজ স্বাধীন মন! এমন প্রেমে ও করুণায় ভরা হৃদয়! আর তার শিক্ষাই বা কত উচ্চ! সব বিষয়ে ঠিক আমাদের মত—কিম্বা আরো ভাল ভাবে কথা বলবার বিচার করবার কি শক্তি! সে বলে বোঝান যায় না! তাই আমার মনে হয়—তুমিও থাকলে কত ভাল লাগে! তিন জনে আমরা কেমন আমোদে সময় কাটাতে পারি!"

কিরণের হতাশ হৃদয়ের তীব্র জ্বালা তাহার মুখে যেন কালি ঢালিয়া দিল! সে অত্যন্ত নিরুৎসাহভরে বলিল, "আমার যে সময় হয় না ভাই! সকালবেলায় আমার যে অনেক কাজ থাকে, তা ত জানো তুমি!"

তার পর সে সাহস করিয়া বলিল, "তুমি কি আগের চেয়ে তার এ কয় মাসে কোন পরিবর্ত্তন বুঝতে পার?" বীণার সঙ্গে লীলার যে কোথায় প্রভেদ, অরুণ তাহা ধরিতে পারে কি না, জানিতে তাহার বড় কৌতূহল ছিল।

তাহার কথায় অরুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ! অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে! বলেছি ত! সে যে কি, তা আমি বলে বোঝাতে পারি না! প্রথম প্রথম তখন আমরা দুজনেই বোধ হয়—কেবল বাইরের রূপ—আর একটা উদাস ভালবাসায় বিহ্বল হয়েছিলুম, অন্তরের পরিচয় পাবার—বা নেবার কারু কি তখন অবসর ছিল? কিন্তু

এখন? তুমি হয় ত আশ্চর্য্য হবে—বীণা যে কত সুন্দরী—সে-কথা আর আমার মনেও আসে না! তার অতুল রূপের এখন যদি কিছুই না থাকে—তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি তার মনের পরিচয় পেয়েছি এখন! সে মন—সুন্দরের চেয়ে সুন্দর—লক্ষগুণে সুন্দর! সে যে কি—তা আমার মনই জানছে!"

কিরণের মনে হইল—তাহার হৃৎপিণ্ড কে যেন শাণিত ছুরি দিয়া কাটিতেছে! মর্ম্মন্তুদ বেদনায় সে দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া জানালার বাহিরে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

অরুণ একটা নীল চশমা রুমাল দিয়া মুছিতেছিল। সে বলিল, "আমি এখানে আসবার আগে এই চশমা এখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য লিখে এসেছিলুম। এত দিন পরে এটা পাওয়া গেল। আমার মনে হয়, এই চশমাটায় আমার একটু উপকার হতে পারে। আলো লাগলে চোখ দুটো এত বেদনা করে!"

"আলো লাগলে?" কিরণ নিজের ব্যথা ভুলিয়া বিস্মিতভাবে মুখ ফিরাইল। "আমি ত জানতুম, তুমি মোটেই দেখতে পাও না!"

"আগে তাই মনে হ'ত। এখন কিছুদিন থেকে মনে হয়, সকাল হলে যেন আমার চোখের উপর থেকে গাঢ় অন্ধকার সরে যায়, আর চোখ টন্ টন্ করতে থাকে। হয় ত এটা একটা শুভ লক্ষণ! অবশ স্নায়ু-গুলো হয় ত এত দিনে আবার সজীব হয়ে উঠেছে! বম্বে হাঁসপাতালের ডাক্তাররা আমায় কি বলেছিল জান?"

কিরণ সে বিষয় কিছু জানিত না। কারণ, পূর্ব্বে অরুণ এত গম্ভীর ও বিমনা হইয়া থাকিত যে, সে নিজের সম্বন্ধে কখনো কোন কথাই বলিত না। সে বলিল, "তুমি ত আমায় কিছু বল নি? কি বলেছিল?"

অরুণ প্রসন্ন মুখে বলিল, "তারা বলেছিল—আমার চোখের তারার কোন ক্ষতি হয় নি, শুধু 'ওপটিভ নার্ভে' শক লেগে এ রকম হয়েছে। যদি আমি শরীরে ও মনে বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল থাকতে পারি, তা হলে সময়ক্রমে এই স্নায়ু আবার সবল হয়ে উঠতেও পারে। তারা আরও বল্লে, এ আশা এত সামান্য যে, এর উপর নির্ভর করে তোমায় আমরা কোন কথা দিতে পারি না। তবে মানসিক স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তি থাকলে এ-রকম হওয়া অসম্ভব নয়। দুঃখ, সংশয়, ব্যথা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য—এ-সব আমার দৃষ্টি ফিরে পাবার বিষম বিঘ্ন। যদি কোন দিন চোখ সুস্থ হবার পরও এ-সব বিঘ্ন জীবনে আসে, তা হলে চোখের শির একেবারে অবশ হয়ে যাবে ও চিরদিনের মত অন্ধ হয়ে যাব।" বলিতে বলিতে অরুণ নিজের কথায় নিজেই ভয় পাইয়া শিহরিয়া উঠিল।

কিরণ মনের মধ্যে একটা স্বস্তি ও আনন্দ বোধ করিল। সে অরুণকে যথার্থই ভালবাসিত। তাহার এ শোচনীয় অবস্থায় সে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিল। তবে আবার তাহার দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবার আশা আছে! সে বলিল, "আজ এ-কথা শুনে কত যে খুসি হলুম, সে আর কি বলবো! তুমি ত এতদিন কোন কথা বল নি!" তার পর একটু নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, "আর কারুকে—অর্থাৎ তাকে কি এ-সব বিষয় বলেছ?" অরুণের কাছে সে এখন আর লীলার নাম সহজে বলিতে পারিত না।

অরুণ চশমাটা ভাল করিয়া মুছিয়া চোখে পরিল। একবার এদিকে ওদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "চোখটায় একটু আরাম পাওয়া গেল! যে ব্যথা করছিল! তার পর সে কিরণকে বলিল, "বীণার কথা বোলছো? না, তাকে আমি কিছুই বলি নি! মিছে আশা দিয়ে লাভ কি ভাই? যদি কোন দিন আমার অদৃষ্টে অসম্ভবও সম্ভব হয়,

তখন ত সকলেই জানতে পারবে! আমি ত এখনো এটা ভাবতেই পারি না! সত্যি কি এমন দিন আমার হবে, যেদিন আমি আবার তার সেই সুন্দর মুখখানি দেখতে পাব? এই যে এত কষ্ট করে দিনের পর দিন লিখে যাচ্ছি, এ-সব লেখা আর সবাইয়ের মত নিজেই দেখে পড়তে পার্‌বো? এও কি আবার সম্ভব হবে? মনে ত আশা করতে ভয় হয়!"

কিরণ ব্যথিত হৃদয়ে অরুণের আশা-নিরাশায়-কাতর উদ্বেগ-চঞ্চল মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। সে নিজেও এ-কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছিল না। যে চোখ এতদিন এত চিকিৎসা, এত যত্নের ফলেও একেবারে দৃষ্টিহীন হইয়া গেল, আবার সে সহজ ও সুস্থ হইয়া দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবে, এখন ত এটা অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞগণ যখন বলিয়াছেন, তখন হইতেও পারে! কিন্তু সে সান্ত্বনার কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। ব্যথাপূর্ণ চিত্তে নীরব হইয়া রহিল।

অরুণ কিছুক্ষণ পরে নিজেই একটু শান্ত হইয়া বলিল, "তাই বলছিলুম, কদিন থেকে যেন একটু আলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে! যদি সুফল হয়, সেও শুধু বীণার জন্যেই! সে-ই আমার মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছে! নিরাশায়, দুঃখে মনস্তাপে আমি ত যেতেই বসেছিলুম—আমার শরীরের স্নায়ুগুলো সবই অবশ হয়ে মরে গিয়েছিল, এই যে আবার নবজীবন পেয়েছি, এ শুধু স্নায়ুর অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকরী ক্ষমতা! এমন করে আমার ভিতর শক্তি সঞ্চার কে করলে? সেই-ই ত! চোখ ফিরে পাই—সে ত খুবই ভাল—না পেলেও এখন আর আমার বিশেষ দুঃখ নেই! আমি এখন জীবনের একটা নূতন দিক দেখতে পেয়েছি! বীণা কতকগুলো নূতন ধরণের বই আনতে

দিয়েছে, আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়বো, দুজনে মিলে বই রচনা করবো। আমি যা লিখছি—সে এসে সে সব দেখে শুধরে দেয়—এর পরে আমি বোলবো, সে লিখবে,—সে দিন-রাত আমারি কাছে কাছে থাকবে! আমার মনটা এ-সব সুখের চিন্তায় এত হাল্‌কা হয়ে গেছে ভাই! আমি যেন তাকে পেয়ে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছি!”

লীলার কথা বলিতে বলিতে অরুণ আনন্দের উচ্ছ্বাসে, সুখে একেবারে বিহ্বল ও দিশহারা হইয়া পড়িল।

“কিরণ! তুমি আমার একমাত্র প্রিয় বন্ধু! আমি যে এত দুঃখের ভিতরেও এত বড় শান্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে খুব সুখী হয়েছ? কষ্ট না পেলে দুর্লভ জিনিষকে পাওয়া যায় না ভাই! এক এক সময় তাই ভাবি—যদি চোখ না হারাতুম, তা হলে বুঝি এমন করে তাকে আমি পেতুঁম না। সে পাওয়া—শুধু স্ত্রী-পুরুষের সাধারণ মিলনের মত মৃত। আর এ যে কি—তোমায় এ সুখ কি করে বোঝাবো! তুমিও সুখী হয়েছ ত ভাই?”

“নিশ্চয়ই!” কিরণ কথাটা সহজ প্রফুল্ল ভাবেই বলিতে গেল—কিন্তু তাহার কণ্ঠে সে সুর বাজিল না। অরুণের নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়া কিরণ নিজের ঘরের জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। আজ আর তাহার কাজে যাওয়া হইল না।

কিছুদিন হইতে সে নিজের মধ্যে একটা অতৃপ্তি, একটা পূর্ণতার অভাব বোধ করিতেছে। কোনরূপে, কোন কাজ দিয়া, পড়া শুনা করিয়া কিছুতেই তাহা পূরণ করিতে পারিতেছে না। তাহার সব কাজ-কর্ম্ম, নিজেকে অন্যমনা রাখিবার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করিয়া দিয়া সর্ব্বক্ষণ একটা বিরাট ব্যর্থতা তাহাকে ভিতরে ভিতরে রিক্ত ও নিরানন্দ করিয়া তুলিতেছিল।

সে নিজে চিরদিনই শরীরে ও মনে সুস্থ এবং সবল—নিজের অভাব মিটাইয়া লইবার ক্ষমতা তাহার নিজের ভিতরেই যথেষ্ট ছিল। এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে বাহিরের কাহাকেও তাহার প্রয়োজন ছিল না। স্বভাবতই সে সকল বিষয়ে নিরাসক্ত। সে সকলের সহিত অবাধে মিশিত, খেলিত, আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিত, কিন্তু কিছুর ভিতর সে কখনো ঘনিষ্ঠভাবে প্রবেশ করিত না—তাহার এই নির্ব্বিকার অটল অচল ভাব কেহ ভাঙিতে পারে নাই।

লীলা প্রথম তাহার প্রশান্ত হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ তুলিল। বসন্তের হাওয়া লাগিবা মাত্র যেমন নিরানন্দ বনস্থলী নিত্য-নূতন শ্যাম-শোভায় ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া উঠে, তেমনি লীলার সংস্পর্শে আসিয়া গম্ভীরপ্রকৃতি কিরণ সহসা পুলকে, আনন্দে চঞ্চল ও মুখর হইয়া উঠিল। একটি অনির্ব্বচনীয় নূতন রসে তাহার অন্তর-বাহির যেন অভিষিক্ত হইয়া গেল।

এই নূতন ভাবে বিভোর হইয়া তিনটি মাস যে কিরণ কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটাইয়াছে, তাহার কোন হিসাব ছিল না। সমাজে সকলে তাহাদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া চর্চ্চা করিয়াছে, লীলা বাড়ীতে মায়ের কাছে এ জন্য যথেষ্ট শাসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের দুই জনের কোন ক্ষতি হয় নাই। তাহারা কখনো কাহারো বাধা না মানিয়া দুই জনে নিজ নিজ মতে এত দিন চলিয়াছে! তাহাদের এ সম্বন্ধ যে চিরদিনের সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মত, বা ইহা চর্চ্চার বিষয় হইতে পারে, ইহা তাহারা মনে আনিতে পারিত না। লীলার সম্বন্ধে কিরণের প্রকৃত মনের ভাব কি, তাহা কিরণ নিজেই জানিত না,—কখনো ভাবিয়া দেখে নাই, অবসরও ছিল না লীলা নিজেও তাই। তাহারা শুধু জানিত, তাহারা পরস্পর

দুইজনের বন্ধু, ইহার অধিক এ পর্য্যন্ত কোন কথা তাহাদের মনে উঠে নাই।

প্রতিদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া কিরণের মনে হইত, লীলার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে হইবে। সে তাড়াতাড়ি নিজের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া পোষাক পরিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িত, পাছে বিলম্ব হইয়া যায়। দ্বিপ্রহরে বাড়ী ফিরিয়া স্নানাহার ও বিশ্রাম সারিতে সারিতে কেবলই মনে হইত, দিনটা কি অসম্ভব দীর্ঘ, যেন ফুরাইতে চায় না। বিকালে তাহাকে আবার লীলার বাড়ীতে যাইতে হইবে। তাহার পর সেখান হইতে ক্লাবে গিয়া খেলা, গান-বাজনা ইত্যাদি সব সাঙ্গ করিয়া তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া রাত নটার সময় সে বাড়ী ফিরিত। যতক্ষণ সে রাত্রে জাগিয়া থাকিত, পরের দিন সকালের প্ল্যান্ ঠিক করিতেই তাহার কাটিয়া যাইত। এইরূপ আত্মবিস্মৃতির মধ্যে বিভোল বিহ্বল ভাবে চলিতে চলিতে সহসা এক দিন কিরণ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া নিজের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

সে লীলার সঙ্গে অরুণের প্রথম পরিচয়ের দিন। সে দিনের কথা আগুনের অক্ষরে তাহার হৃদয়ে যেন খোদিত হইয়া গেছে।

সে-কথা প্রথমে শুনিয়া তাহার ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত লীলার বঞ্চনা ও প্রতারণায় ঘৃণা ও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর তাহার মনে হইল, তাহার এত দিনের একান্ত নিজস্ব ধন যেন অতি সহজে তাহার অজ্ঞাতে অপরের করায়ত্ত হইয়া গেল! কিরণ চমকিত ভীত হইয়া উঠিল।

পথভ্রান্ত পথিক যেমন চলিতে চলিতে অকস্মাৎ সম্মুখে বিষম বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, কিরণ তেমনি এই আঘাতে এত দিনের স্বপ্নের ঘোর হইতে সচেতন হইয়া নিজের অন্তর জানিবার চেষ্টা করিল।

সে দেখিল, তাহার চিত্ত লীলাময়। এই কয় মাসে লীলা তাহার অন্তর-বাহির পূর্ণ করিয়া অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। কিরণ বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া গেল। এত দিন সে কি ঘুমাইয়া ছিল?

সে লীলাকে বুঝাইল,—অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়া তাহার কার্য্যের অসারতা ও অন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু লীলা কিছুতেই ফিরিল না। তখন দুর্জ্জয় ক্রোধ ও অভিমানে সে লীলার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিল।

আজ এক সপ্তাহ সে লীলাদের বাড়ী যাওয়া, ক্লাবে যাওয়া, সবই বন্ধ করিয়াছে। সকালে লীলা অরুণের কাছে আসিবার আগে সে ব্যস্ত হইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সে চলিয়া যাইবার আগে কোন দিন বাড়ী ফেরে না। কিন্তু এত সাবধান থাকিয়াও ফল কি হইয়াছে? বাহিরে সে লীলা হইতে অন্তরে থাকিয়াছে, কিন্তু এই কয়েকদিনের ভিতর এক মুহূর্ত্তও সে তাহার চিন্তা ছাড়িতে পারিয়াছে কি? তাহার অন্তর এই কয়দিনে কি তৃষিত, কি বুভুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা মুখে স্বীকার না করিলেও মনে ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লীলা ত অক্লেশে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপরের হইয়া গেল, এখন তাহার উপায় কি?

জানালায় দাঁড়াইয়া শূন্যমনে কিরণ বাগানের উচ্চশির নারিকেল-কাননের দিকে চাহিয়া ছিল। দুদিনের জন্য লীলা নিজে তাহার হৃদয়ের দুয়ারে অতিথি হইয়া আসিয়াছিল, দুদিন হাসিয়া খেলিয়া, তাহাকেও আনন্দ দিয়া সে আবার নিজেই সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে তাহার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবার আছে? সে পূর্ব্বেও যেমন নিঃসঙ্গ, একা ছিল, আজও আবার তাহাই! তবে মনের এ রিক্ততা, এ ব্যাকুলতা কেন? কেন সে আবার তাহার পূর্ব্বের সেই সহজ

জীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছে না! পূর্ব্বের সবই ত এখনো বজায় রহিয়াছে! তাহার কাজকর্ম্ম, তাহার বন্ধু-বান্ধব, শিকার, খেলা, সবই ত তেমনি রহিয়াছে, তবে তাহার এ শুষ্কতা, এ শূন্যতা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল? লীলার জন্য কি? কিন্তু সে ত তাহাকে ছাড়িয়া বেশ আনন্দেই দিন কাটাইতেছে!

তখন ধীরে ধীরে তাহার মনে লীলার সেদিনের সেই লজ্জা ও ভয়ে কাতর পাণ্ডুবর্ণ মুখের ছবি ফুটিয়া উঠিল। সেই শক্তিতে, দর্পে, তেজে-ভরা মুখ! সে মুখ সেদিন তাহার বিরক্তির আশঙ্কায় কি কাতর ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল! সে সেদিন কিরণের কাছে যত মিনতি জানাইয়াছিল, একে একে সেই সব কথা তাহার মনে পড়িয়া ছুরির মত তাহাকে বিঁধিতে লাগিল। সে রাগে অন্ধ [illegible] তাহাকে কত কত কঠোর কথা বলিয়াছে, তাহাকে 'স্বেচ্ছাচারিণী,' [illegible]নাকারিণী', বলিয়া গালি দিয়াছে, তবু—তবুও সে তাহার কাছে [illegible] নত, কত কুণ্ঠিত হইয়াছিল! লীলার সেদিনের অভিমান ও ব্যথা [illegible] সজল দৃষ্টি মনে হইয়া কিরণকে আকুল করিয়া তুলিল।

"লিলি!" "আমার লিলি!" সে নিজের মনে মনেই অস্ফুটস্বরে বার বার তাহার এই প্রিয় নামটি মন্ত্রের মত আবৃত্তি করিতে লাগিল। "আমি তোমাকে কখনো কষ্ট দিতে পারি?" তাহার মন তখনি ব্যগ্র হইয়া লীলার নিকটে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু হায়! লীলা অরুণের! অরুণ লীলার! সে মাঝখানে কে? যে একদিন সর্ব্বস্বের অধিকারী ছিল, সে কি আজ শুধু বন্ধুত্বের সান্ত্বনায় নিজের সর্ব্বনাশ নিজে দাঁড়াইয়া দেখিতে পারে? লীলার কাছে আর যাইয়া ফল কি?

কিরণ আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। সে অধীর ব্যাকুল ভাবে ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল। সে কি করিতে পারে? লীলা

না বুঝিয়া শুধু করুণার বশে যে কাজ করিয়া বসিয়াছে, তাহার শেষ ফল—অরুণের সঙ্গে তাহার বিবাহ! মনের জ্বালায় অস্থির হইয়া কিরণ বীণার কাছে একবার শেষ চেষ্টা করিতে গিয়াছিল,—যদি সে ফেরে, তবেই সব দিক রক্ষা হয়! কিন্তু সেখানেও সে নিস্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে! এখন আর কোন উপায় নাই! কুক্ষণে অরুণ বসন্তপুরে আসিয়া অতিথি হইয়াছিল! সে-ই তাহার সমস্ত দুঃখ ও নিরাশার মূল হেতু! কিরণ আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল! আহা! অসহায়! অন্ধ দুঃখী, অরুণ! যে একদিন তাহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিল, আজ সে তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী! অথচ সে জানে না, তাহার এই উচ্ছ্বসিত প্রেমের কাহিনী কিরণের মনে কি দাবদাহ জ্বালাইয়া তুলিয়াছে!

কিরণ ভাবিতে লাগিল, যেদিন সে লীলাকে হেয়, বঞ্চনাকারিণী বলিয়া গালি দিয়াছিল, সেদিন লীলার যুক্তি এই ছিল যে, তাহার এই কার্য্যের উদ্দেশ্য—অন্ধ অরুণকে আবার আনন্দে আশায় বাঁচাইয়া তোলা। তাহাকে ছলনা করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। তাহার এ উদ্দেশ্য যে কেমন সফল হইয়াছে, অরুণের স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, মুখে, পরিপূর্ণ আনন্দে উজ্জ্বল রূপেই তাহার প্রমাণ! সে তাহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছে! তাহাকে নবীন জীবনে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে! এমনি তাহার আশ্চর্য্য শক্তি! এমনি তাহার প্রবল ব্যক্তিত্ব! প্রতিভায় ও শক্তিতে অতুলনীয়া এই লীলাকে কিরণ আবার তুচ্ছ ভাবিয়া গালি দিয়াছিল!

লীলা যাহা বলিয়াছিল, সে তাহা কার্য্যে দেখাইয়াছে! সে শেষ পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত, সে-কথাও সে বলিয়াছিল। কার্য্যেও তাহাই হইবে, কিরণ এ-ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত কেবলি ভাবিতে লাগিল।

লীলার আশা সে কখনো ছাড়িতে পারিবে না, অথচ লীলাকে ফিরিয়া পাইবারও কোন উপায় দেখিতে পাইল না। তাহার সমস্ত চিত্ত নিরাশায়, বেদনায়, ক্ষুব্ধ, পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে কি করিবে, কাহার উপরে রাগ করিবে, কি প্রতীকার করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

যে লীলা তাহার জীবনাধিক প্রিয়, আজ সে স্বেচ্ছায় অন্যকে বরণ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে! এবং যে তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহার সকল সুখ-শান্তি অপহরণকারী, সে তাহারই প্রিয় বন্ধু একান্ত অসহায়, অন্ধ অরুণ!

তাহার নিজেরই বাড়ীতে, তাহারই সম্মুখে তাহার বন্ধুর এই প্রেম-লীলা চলিয়াছে। সে কেবল এখানে শ্রোতা মাত্র—তাহার প্রতিকারের কোন উপায় নাই! ধৈর্য্যের সহিত এই কাহিনী শুনিতে হইতেছে!

কিরণ কোন দিকে সান্ত্বনার অবলম্বন পাইল না। সে শুধু বিশ্রামহীন ভূতগ্রস্তের মত অস্থিরচিত্তে উদ্দেশ্যশূন্য ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

১৯

"মিঃ চৌধুরী! সামনের হপ্তায় কল্যাণপুরের মহারাজার ওখানে একটা খুব জমকালো উৎসব হচ্ছে—আপনি যাচ্ছেন ত?" মধুর হাসির সহিত মিশাইয়া বীণা তরুণ ব্যারিষ্টার নীরদ চৌধুরীর দিকে ফিরিয়া কথাটা বলিল।

চৌধুরী আজ বড় বিমর্ষ ও চিন্তাকুল। সে ছিল বীণার একটি পরম স্তাবক ভক্ত। কিন্তু বীণা কোন দিন তাহার দিকে ফিরিয়াও

চাহিত না—বরং তাহার মনের ভাব জানিয়া কৌতুকচ্ছলে তাহার সহিত খেলা করিয়া আমোদ পাইত। সে কখনো তাহার প্রতি অনুরাগের লক্ষণ দেখাইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিত, কখনো তাহারই সম্মুখে অন্য যুবকদের সঙ্গে হাসিয়া, গল্প করিয়া, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহাকে ঈর্ষাকুল ও কাতর করিয়া তুলিয়া নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করিত।

যেদিন বীণা কিরণের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে নিজের মনের আভাস দিয়াছিল, তাহার পর হইতে কিরণ আর ক্লাবে বা তাহাদের বাড়ী আসে নাই। বীণা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিরণের উদাসীন চিত্ত জয় করিতে পারিল না। তাহার প্রত্যাখ্যাত হৃদয় দারুণ অভিমানে ও প্রতিহিংসার জ্বালায় জ্বলিতেছিল। সে তাহার আহত হৃদয়ের জ্বালা হতভাগ্য চৌধুরীর উপর অত্যাচার করিয়া কতকটা মিটাইতে চেষ্টা করিত।

কাল সমস্ত সন্ধ্যাটা বীণা চৌধুরীকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া মিঃ দত্তের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কাটাইয়াছে; চৌধুরীর বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সে তাহার সহিত একটা কথাও বলে নাই। সেই দুঃখে সে আজ নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। বীণার নিষ্ঠুর ব্যবহারে সে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইত, তবু তাহাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিবার সাধ্য তাহার ছিল না। বীণার উজ্জ্বল রূপের শিখায় মুগ্ধ পতঙ্গের মত সে সর্ব্বক্ষণ তাহারই পাশে আকৃষ্ট হইয়া ফিরিত।

সে আজ বীণার সঙ্গে যথেষ্ট পার্থক্য রাখিয়া চলিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল। কাজেই, কথাটা শুনিয়াও বিশেষ মনোযোগ না দিয়া সে উদাসীন ভাবে বলিল, "এখন ত বলতে পারি না, যাওয়ার সুবিধা হবে কি না; দেখা যাক!" সে মুখ ফিরাইয়া বিশেষ

মনোযোগের সহিত একটা ছবি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

বীণা তাহার ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, "দেখা যাক্ আবার কি? যেতেই হবে আপনাকে! কোন একটা ভাল জায়গায় বা কোন আনন্দ উৎসবে একা যেতে আমার মোটেই ভাল লাগে না! বন্ধুবান্ধবদেব সঙ্গে একত্র না থাকলে কি আমোদ হয়? বিশেষ আপনাদের মত ঘনিষ্ঠ বন্ধু!"

চৌধুরী ছবি হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বীণার মুখের দিকে চাহিল,—তাহার দৃষ্টি ব্যথা ও অভিমানে ভরা। সে বলিল, "একা আপনাকে নিশ্চয়ই থাকতে হবে না মিস্ রায়! সেখানে আপনার পরিচিত ও অনুগত অনেকেই আস্‌বেন! আমার তো সেখানে কোন মূল্যই নেই জানি, মিছে গিয়ে আর কি হবে?"

বীণা এবার সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে আবার চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার চোখে-মুখে তখন একটা বিষণ্ণ ছায়া। সে বলিল, "আপনি প্রায়ই ঐ কথা বলেন। যাঁরা দু' এক ঘণ্টার জন্য আসেন, ভদ্রতার খাতিরে হয় ত তাঁদের সঙ্গে একটু বেশি মিশতে হয়, একটু বেশি যত্ন নিতে হয়। তার জন্যে কি যাঁরা বিশিষ্ট বন্ধু, ঘরের লোকের মত, তাঁরা কি পর হয়ে যান? সকলেই ত বাইরের লোককে বেশি আদর-যত্ন করে—তার মধ্যে ভদ্রতা ছাড়া আর কিছু নেই, আপনি এটা বোঝেন না কেন?"

চৌধুরী এ-কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেল। বীণার কথায় বোঝায়—সে চৌধুরীকে নিতান্ত বাহিরের ভদ্রলোক হিসাবে দেখে না, সে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু! হয় তো—হয় তো—সে তাহাকে মনে

মনে ভালও বাসে! চৌধুরীর মনের দুঃখ ও অভিমান ক্রমেই লঘু হইয়া আসিতেছিল।

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া বীণার চোখে আনন্দ ও কৌতুকের আভা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব চাপিয়া সে বিষণ্ণ ভাবেই বলিল, "আপনি এই সব ভেবে একটা মিথ্যে ধারণা করে কষ্ট পান, দেখলে আমার মনেও বড় আঘাত লাগে। যা হোক, সেদিন যাচ্ছেন কি না বলুন। যদি না যান্—বেশ তো, আমিও কখনো যাব না,—মার কাছে মিছে একটা ওজর করে বাড়ীতে একলা পড়ে থাকবো!" বীণা অভিমানে মুখ ফিরাইয়া যেন উদ্যত অশ্রু গোপন করিবার জন্য অন্য দিকে চাহিল।

চৌধুরী আকুল হইয়া উঠিল। ইহার পর প্রতিজ্ঞা রাখা বা বীণার সম্বন্ধে উদাসীন থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "না! না! আপনি রাগ কর্বেন না। আমি নিশ্চয়ই যাবো! আপনি যখন বললেন, তার উপর আর কথা আছে! তারা একটা বাগান এমন সুন্দর ভাবে সাজিয়েছে! ভারি চমৎকার! খাওয়ার পালা সাঙ্গ হলে আমরা দুজনে বাগানটায় খানিক বেড়িয়ে আসবো—কেমন?"

বীণা মুখ ফিরাইয়া একটু ম্লান ভাবে হাসিল। বলিল, "কাল পর্য্যন্ত আপনার এ ভাব থাকলে ত? হয় ত সেখানে গিয়ে আর পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবদের দেখলেই আপনার মেজাজ বদলে যাবে!"

চৌধুরী অতৃপ্তনেত্রে বীণাকে দেখিতেছিল। বহু দিন বীণা তাহার সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলে নাই। তাহার মনের সকল অশান্তি দূর হইয়া, তাহাকে বীণার প্রতি একটা প্রবল মোহে ও আবেগে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে আর আত্ম-সম্বরণ করিতে

না পারিয়া বলিল, "সত্যিই কি আপনি আমার সম্বন্ধে এই রকম ভাবেন মিস্ রায়? আমার দূরে থাকায় কি আপনার মনে সত্যিই ব্যথা লাগে? আমার পক্ষে এ যে অসম্ভব আশা বলে মনে হচ্ছে!" চৌধুরী নিকটে আসিয়া বীণার হাত ধরিল। অস্ফুট মৃদু-স্বরে আবার বলিল, "মিস্ রায়! বীণা! বল একবার! সত্য করে বল! আমার মনে কি হচ্ছে, তা কি তোমার জানতে বাকি আছে?"

বীণা হাত ছাড়াইয়া লইয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে ঘরের সকলেই তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিতে, চৌধুরী অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া নিজের চৌকিতে বসিয়া পড়িল।

"এত হাসি কিসের মিস্ রায়? মিঃ চৌধুরী বুঝি আজ খুব হাসির গল্প সুরু করেছেন? উঃ! আপনার হাসি যে আর থামে না দেখছি! আমরা গল্পটা থেকে একেবারেই বাদ পড়ে গেলুম না কি!" মিঃ সেন আসিয়া তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন।

"শুধু গল্প!" বীণা আবার হাসিয়া লুটাইতে লাগিল। "মিঃ চৌধুরী আবার অভিনয়েও খুব সুপটু। এমনি একটা পার্ট অভিনয় করে আমায় দেখালেন! উঃ! হাসির ধমকে বুকে ব্যথা ধরে গেছে আমার।" বীণা আবার চৌধুরীর দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

"তাই না কি? বাঃ! আমাদের ডাকলেন না কেন? মিঃ চৌধুরী! আপনি মহিলাদের মনোরঞ্জনে বেশ দক্ষ জানি। আমি আপনার এ সৌভাগ্যের জন্য আপনাকে হিংসা করি! আমরা যে প্রথম হতেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেছি! আসর জমাতে কিছুতেই পারি না।" মিঃ সেন ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে চৌধুরীর দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

চৌধুরীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে সেনের কথার উত্তরে কেবল মাত্র একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

লীলা দূর হইতে তাহাদের লক্ষ্য করিতেছিল। চৌধুরীকে তাহার সত্যই ভাললাগিত। বীণার এই হৃদয়হীন নির্ম্মম ব্যবহারে সে চৌধুরীর জন্য অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছিল।

মিঃ সেন বীণাকে একেবারে অধিকার করিয়া জুড়িয়া বসিলেন। তাঁহার অজস্র বাক্যালাপের অবসরে চৌধুরী আহত হৃদয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। বীণা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

"চৌধুরী! আমি সব দেখেছি! কেন তুমি ওর জন্য এত কষ্ট পাও! ও তোমাকে নিয়ে শুধু খেলা করে, এ তুমি এত দিনেও বুঝলে না? তোমার মনে কি একটু জোর নেই? ছিঃ! ছিঃ! তোমার অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে!" লীলা ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল।

চৌধুরীর চোখে জল আসিতেছিল। বীণার আজিকার উপেক্ষা ও সকলের সম্মুখে অপমান তাহার বুকে শেলের মত বাজিয়াছিল। সে লীলার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল—কোন কথা বলিতে পারিল না।

লীলা ভগিনীর মত স্নেহে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "ছিঃ! শান্ত হও! মেয়েদের মত এত দুর্ব্বলচিত্ত হ'য়ো না! যে তোমায় কেবল উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করে আমোদ পায়, তার কথা তোমার আর কখনো ভাবাই উচিত নয়। তোমার যদি একটু সামান্য মাত্রও বুদ্ধি থাকে, তবে মানুষের মতই তার এ ব্যবহার সহ্য কর, আর তার কাছ থেকে দূরে থাক! যে সব জানোয়ারদের

সে তার পাশে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদেরি সঙ্গে সে থাক্! কোন ভাল লোকের জীবনে তার মত মেয়ের দরকার হবে না।"

চৌধুরী বলিল, "আমি সবই বুঝি—সবই জানি, কিন্তু তবু তার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারি নি। তুমি জান না, আমি তাকে কত ভালবাসি! যখন সে আমায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তখন আমার মনে হয়, আমি হয় ত পাগল হয়ে যাব। আবার একটা ভাল কথা বললেই আর কিছু মনে রাখতে পারি না। তাকে না পেলে আমি হয় ত পাগল হয়ে যাব! আমি কোন রকমে তার দিক হতে মন ফেরাতে পারি না!"

"কিন্তু কার জন্যে এত করছো সেটা ভেবে দেখ! সে ত তোমায় ভাল বাসে না। সে যদি তোমায় ভাল বাস্‌তো, তা হলে কখনো অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ করে' বা তোমায় এত উপেক্ষা করে' কষ্ট দিতে পারতো? তা হলে তুমিই তার মনের এত খানি জুড়ে বসে থাকতে, যে, আর কারুর সেখানে স্থান থাকতো না।"

চৌধুরী বিষণ্নভাবে বলিল, "তোমার খুব মনের বল আছে লীলা! কিন্তু বীণার সম্বন্ধে তোমার কথামত চলবার শক্তি আমার মোটেই নেই। আমি তাকে পূজা করি,—আমার জীবনের ধ্রুবতারা সে! আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে সে বসে আছে! তার মন্দ ব্যবহার সহ্য করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই! তাকে হারান আর মৃত্যু দুই-ই আমার কাছে সমান।"

লীলা চৌধুরীর ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইল। এরূপ প্রেমোন্মত্ত যুবকদের বিষয় সে অনেক শুনিয়াছিল। ইহাদের পরিণাম প্রায়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

প্রকাশ্যে সে ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দিবার জন্য হাসিয়া বলিল,

"আমি তোমার মত হলে সর্ব্ব-প্রথম ত একজন ডাক্তারের কাছে যেতুম। এখানকার জলহাওয়ায় তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে দেখছি! রীতিমত চিকিৎসার দরকার এখন! দিন কতক এ জায়গাটা ছেড়ে যাও দেখি!"

চৌধুরী কিন্তু এ পরিহাসে যোগ দিল না। তাহার মনের অন্ধকার কাটে নাই দেখিয়া লীলাও আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার কথা শোন চৌধুরী, বৃথা বীণার আশায় থেকে কষ্ট পেও না! চেষ্টা করলে তার চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে পাবে তুমি, যেখানে ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে সুখী হবে। তখন দেখবে, বীণাকে হারিয়েও তোমার বা জগতের কোন ক্ষতি হয় নি! জগৎ সমভাবেই চল্‌ছে, এবং তুমিও বেশ ভালই আছ! এগুলো তোমার শুধু একটা মানসিক বিকার বই আর কিছু নয়। জোর করে ঝেড়ে ফেললেই সব সেরে যাবে।"

চৌধুরী ম্লান হাসিয়া বলিল, "আমার মনে হয়, তুমি কখনো ভালবাসায় পড়-নি লীলা! যদি সত্যই কারুকে ভালবাসতে, তাহলে এত সহজে এ-সব কথা বলতে পারতে না। মানুষ যাকে ভালবাসে, তাকেই পেতে তার প্রাণ চায়! তার বদলে আর একজনকে নিয়ে কি করবে সে? দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? আমি বীণাকে ভালবাসি, অন্য মেয়ের জন্যে আমার মনে কোন স্থান নেই। হয় আমি তাকে পাব, নয় ত তার আশায় নিরাশ হয়ে আত্মহত্যা করা বা পাগল হওয়া—এই দুই পথ ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই জেনো।"

লীলা বীণাকে চৌধুরীর কথা জানাইয়া এক সময়ে বলিল, "তুমি তার সঙ্গে যা হোক একটা কিছু নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার কর! কেন তাকে

নিয়ে তুমি এ-ভাবে খেলা কর ? মানুষের মন কি খেলা করবার মত তুচ্ছ জিনিস ?"

শুনিয়া বীণা ত হাসিয়া অস্থির ! সে কহিল, "সে কি এবার তোমাকে উকিল ধরেছে না কি ? খেলা ছাড়া আর ওর সঙ্গে কি করা যায় বল ত ? তুমি কি চাও যে চৌধুরীকে আমি বিয়ে করবো ? ওর আছে কি ? আমার একটা জামার দাম দেবার ওঁর ক্ষমতা আছে ?"

লীলা রাগিয়া বলিল, "তা হলে তার সঙ্গে সেইমত ব্যবহার করলেই ত হয় ? যাতে সে মনে কোন রকম আশা না করতে পারে ? খামকা তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে আশা দিয়ে ঘুরিয়ে মারবার দরকার কি ?"

"লীলা ! তুমি আমার সঙ্গে অনর্থক লাগতে এসো কেন ? আমি ত তোমার ভাল মন্দ কোন কথাতেই থাকি না ! আমি বলছি যে আমি ওদের কারুর দিকে ফিরে চাই না—তবু যদি ওরা রাত-দিন আমার পিছনে ঘোরে, সে কি আমার দোষ ? আমি তার জন্যে কি করবো ?"

"সত্যিই যদি তুমি কারুর দিকে ফিরে না চাইতে, তা হলে কেউ তোমার ধারে আসতে সাহস পেত না। তুমি সকলের সঙ্গে অবাধে মেশো, ঘনিষ্ঠতা কর ; প্রেমিকের মত সকলকে কথা বলবার অধিকার দাও—অথচ বল,—আমার কি দোষ ? এ-সব কেবল ছিবলেমো বুদ্ধি ছাড়া আর কি বলা যায় ?"

"আচ্ছা ! আচ্ছা ! অত রাগ করো না ! এবার থেকে চৌধুরীর সঙ্গে আমি অতি মধুর ব্যবহার করবো ! দেখো তুমি !" বলিতে বলিতে সন্ধ্যার কথাটা মনে পড়ায় বীণা আবার হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। "সত্যি লিলি ! আজ সন্ধ্যে-বেলা যে মজাটা হয়েছিল, সে তোমায় কি বলবো ! প্রথম ত সে চটেই লাল ! কথাই

বলে না! মুখই ফেরায় না! শেষে আমি একটা ছুটো কথা বলতেই বেচারা একেবারে জল! তখন সে কি গদগদ ভাব! বল ত? এরা যদি এমন সখের বাঁদর নিজেই হয়, তখন একটু মজা না করে, একটু না নাচিয়ে দেখে থাকা যায় কখনো?" বীণা হাসিয়া হাসিয়া অস্থির—লীলা তাহার লঘুতায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

২০

"আমার যতদূর মনে হয়, আর যে রকম দেখলুম, ওঁর শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মনের অসুখই বেশি! আপনি কি ঠিক জানেন—ওঁর মনে কোন বিশেষ কষ্ট বা কোন উত্তেজনার কারণ কিছু আছে কি না?"

নির্ম্মলা বলিল, "আমি ত এ রকম কোন বিষয় জানি না। যখন থেকে বড় হয়ে জ্ঞান হয়েছে, বরাবর ত বাবাকে বেশ সুস্থ ও প্রফুল্লই দেখে আসছি। ওঁর যে মনে এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার আছে, এ তো আমরা কেউ জানি না। আপনিও তো তাঁকে গত পোনের বছর ধরে দেখে আসছেন—কখনো কোন ভাবান্তর দেখেছেন কি?"

মিঃ ঘোষের নূতন বাগানবাড়ীতে দাঁড়াইয়া নির্ম্মলা তাহাদের গৃহচিকিৎসক অনিলবাবুর সহিত কথা বলিতেছিল। দুই তিন দিন পূর্ব্বে মিঃ ঘোষের একান্ত আগ্রহে এখানে নির্ম্মলার গার্ডেনপার্টির উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন এখানে থাকিয়া তাঁহারা সহরে ফিরিয়া যাইবেন স্থির হইয়াছিল।

নির্ম্মলার কথার উত্তরে অনিলবাবু বলিলেন, "বাইরে থেকে তাঁকে দেখলে তো সে রকম কোন কারণ আছে বলে মনে হত না;

কিন্তু তাঁর জীবনের কোন কথা ত বাইরের লোকে জানতে পারবে না, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলুম। আপনাদের পারিবারিক কোন ঘটনা থাকতে পারে, যেটা তাঁর পক্ষে বিশেষ মনস্তাপের বিষয়; কিংবা তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে হয় ত এমন কোন বিষয় থাকতে পারে—যার চিন্তা তাঁর কাছে ভয় বা উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে—এ সব তো অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জানা সম্ভব নয়! এ রকম কিছু একটা জানতে পারলে তাঁর রোগের কারণ নির্ণয় করা সহজ হতে পারে। না হলে—"

নির্ম্মলা বলিল, "পারিবারিক দুর্ঘটনার মধ্যে ত আমার মার মৃত্যুর কথাই আমি জানি। কিন্তু সে ত বহুদিন পূর্ব্বের ঘটনা। তার জন্যে যে আজ ওঁর মনে এমন ভাবান্তর ঘটবে, সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না। আর তা ছাড়া, তাঁকে দেখলে মনে হয়, তিনি যেন অত্যন্ত ভয় পাচ্ছেন, কোন লোকের কাছ থেকে কিছু অনিষ্টের আশঙ্কায় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন, এই রকম মনে হয়।"

"তাঁর কোন গুপ্তশত্রু থাকাও তো অসম্ভব নয়! হয় ত তাঁর কোন অন্যায় কাজের ফলে সেই উৎপীড়িত লোক তাঁর উপর লক্ষ্য রেখেছে, সেই ভয়ে এখন তিনি এমন উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন—"

নির্ম্মলার নয়নে জলধারা বহিল। সে বলিল, "বাবা অন্যায় কাজ করবেন! এ কথা চোখে দেখলেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না! বাবা কোন দিন নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন নি! তাঁর অগাধ অর্থ কত দিকে কত রকমে খরচ হচ্ছে, আপনি ত সবই জানেন! সামান্য চাকর-বাকরকেও তিনি কখনো একটা উঁচু কথা বলে কষ্ট দিতে পারেন না, এমনি তাঁর মন! তিনি এমন কি অন্যায় কাজ করতে পারেন, যার জন্যে তিনি আজ এত কষ্ট পাবেন?"

অনিলবাবু প্রবীণ ব্যক্তি। চিকিৎসা কার্য্যে অভিজ্ঞতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। মিঃ ঘোষের সহিত তাঁহার বহুদিনের পরিচয় ছিল, এবং চিকিৎসা-সূত্রে তিনি এখানে বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত যাতায়াত করিতেন।

নির্ম্মলাকে কাতর দেখিয়া তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "এ কথাটায় আপনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন দেখছি! কিন্তু বাস্তবিক এতে কষ্ট পাবার মত কিছু নেই। আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে এমন অনেক ঘটনা জানি, যা প্রথমে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও, সে সব সত্য প্রমাণ হয়েছে। কত বড় বড় মহৎ জীবনের মধ্যেও কত এমন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়—যা তাঁদের জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। যা হোক—এসব বিষয় নিয়ে আপনি বৃথা মনে কষ্ট পাবেন না। চিকিৎসকের কর্ত্তব্য বোধে বলছি, যদি কিছু জানতে পারেন, আমাকে জানাবেন—"

নির্ম্মলা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আপনি যা বল্লেন তাই যদি সত্য হয়, তাহলে এত দিন সে জন্য কোন গোল হল না, আর এখনই বা এমন কেন হচ্ছে? সত্যিই যদি এমন কিছু তিনি করে থাকেন—"

"তা কিছুই বলা যায় না! হয় তো আগে কিছুই ছিল না, সম্প্রতি কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে থাকবে, কিংবা বহুদিন পূর্ব্বের কোন ঘটনার কথা মনে পড়ে যাওয়াও আশ্চর্য্য নয়। কত সময়ে কত বিষয় আমাদের মনের গভীর তলদেশে বিস্মৃতি মধ্যে ডুবে থাকে, সামান্য কোন সূত্রে—একটা কথায়—বা একটা ঘটনায় সেগুলি আবার জাগ্রত হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। আপনি সর্ব্বদা তাঁর প্রতি ভাল করে' লক্ষ্য রাখবেন। এ সব রোগীকে খুব ভাল করে 'ওয়াচ' করাই বিশেষ দরকার। যখন তিনি নিজের মনে বকেন—তখন যদি কোন

কথা বুঝতে পারেন ত চেষ্টা করবেন। দু একটা কথা জানা গেলেও তা থেকে সন্ধান করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো—ভয় নেই কিছু। যদি কিছু দরকার হয়, তখনি আমাকে খবর দেবেন।”

ডাক্তার চলিয়া গেলে নির্ম্মলা অপরাহ্ণের ম্লান আলোয় রঞ্জিত আকাশের দিকে তাহার বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। অদূরবর্ত্তী ত্রিতল অট্টালিকার উচ্চ গৃহচূড়ার পশ্চাতে বিদায়োন্মুখ সূর্য্য তখন চলিয়া পড়িয়াছে। এই যে একমাস কাল হইতে এই অনিশ্চিত আশঙ্কা ও উদ্বেগ তাহার প্রফুল্ল জীবনের উপর অন্ধকার ছায়াপাতে তাহার সকল আনন্দ লোপ করিয়া দিয়াছে, ইহার কি কোন দিন অবসান হইবে? নিজেকে তাহার আজ অত্যন্ত একা, অত্যন্ত অসহায় বলিয়া মনে হইতেছিল। গভীর বেদনা ও উদ্বেগে আজ কেবলি তাহার মনে হইতেছিল—আজ যদি তার মা থাকিতেন! পিসীমা অত্যন্ত সরল-প্রকৃতি, তাঁর কাছে বিপদের দিনে কোন পরামর্শ বা সান্ত্বনা পাইবার আশা নাই। তাহার একমাত্র ভরসা ও আশ্রয় যে পিতা—তাঁহার এই অসুখ, আর তাহার আত্মীয় বন্ধু কেহই নাই, সে আজ যাহার উপর নির্ভর করিতে পারে। যে মায়ের মুখ বহুদিন তাহার মন হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, আজ সেই মায়ের কথা মনে পড়িয়া তার চোখে বার বার অশ্রু ভরিয়া আসিতে লাগিল।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নির্ম্মলা ঘুমাইতে পারিল না। অনিল-বাবুর কথাগুলি সে মনে মনে বিচার করিয়া ভাবিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু মিঃ ঘোষের জীবনের পূর্ব্বকথা—যদি কিছু গোপনীয় থাকে—তাহা যে কেমন করিয়া জানা যাইতে পারে, তাহা সে অনেক ভাবিয়াও স্থির

করিতে পারিল না। সে নিজে ত কত অল্প বয়স হইতে বাড়ী-ছাড়া। বৎসরের মধ্যে দুই এক মাস ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে তাহার ত কোন সম্বন্ধই নাই। যদি তাহাদের দেশেই বসবাস থাকিত, তাহা হইলে বাড়ীর লোকজন—পাড়াপ্রতিবাসীদের কাছেও কতক কতক খবর পাওয়া যাইত। কিন্তু দেশের সহিত সম্বন্ধও ত তাহাদের বহু দিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবে কাহার কাছ হইতে এসব বিষয় জানা সম্ভব হইতে পারে? এক যদি পিসীমার কাছে কোন সন্ধান পাওয়া যায়!

পিসীমার কথা মনে পড়ায় নির্ম্মলার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। পিসীমার কাছে চেষ্টা করিলে কিছু না কিছু জানা যাইবেই! তিনি ত প্রায় সারাটা জীবন তাহাদের সঙ্গেই কাটাইলেন—সংসারের ছোট-বড় সব কথাই তাঁহার জানা সম্ভব!

এ চিন্তার সমাধান হইলেও নির্ম্মলা কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছিল না। অনিলবাবুর সংশয়পূর্ণ কথায় তাহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। ভিতরে ভিতরে সেই চিন্তা তাহাকে কেবলি পীড়া দিতে লাগিল।

তাহার পিতার অকলঙ্ক শুভ্র জীবনের মধ্যে এমন কি গুপ্ত ঘটনা থাকিতে পারে, যাহা আজ তাঁহার জীবন এমন অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে!

চাঁদের আলোয় চারিদিক ভাসিতেছিল। এই গভীর রজনীতে এই নীরব পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একা বসিয়া তাহার শৈশব-জীবনের কত কথা, ছোট-বড় কত ঘটনার স্মৃতি, ধীরে ধীরে তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

সহসা স্তব্ধ রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া খুট্‌খুট্‌ করিয়া একটা মৃদু শব্দ হইল,—কেহ যেন অতি সন্তর্পণে কোন ঘরের দরজা খুলিবার চেষ্টা

করিতেছে। নির্ম্মলা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না। বাড়ীর সকলেই এখন অঘোরে ঘুমাইতেছে। তবে কি বাহির হইতে কোন দুষ্ট লোক বাড়ীর ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে? নির্ম্মলার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ-জলে ভিজিয়া গেল। বারাণ্ডায় তাহার দাসী পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, সে তাহাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে গেল—কিন্তু তাহার স্বর দারুণ আতঙ্কে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল—সে কণ্ঠে স্বর ফুটিল না। সে নিশ্চেষ্ট জড়বৎ বসিয়া কি করিবে ভাবিতে লাগিল।

এই সময় আবার সেই শব্দ শোনা গেল। খট্-খটাস্! এ শব্দটা আগের চেয়ে একটু জোরে হইয়াছিল। নির্ম্মলা হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া জানলা হইতে নামিয়া পড়িল। এ কি? এসব যে মিঃ ঘোষের ঘরের দিক হইতে আসিতেছে! নির্ম্মলার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তবে কি তাঁহারই কোন অনিষ্ট করিবার জন্য কেহ জানলা বা দরজার ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে? এই বিপদের সম্ভাবনায়ই কি তিনি আজ মাসাবধি এত অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে দিনপাত করিতেছেন?

এ কথা মনে আসিতেই তাহার সব আতঙ্ক ও জড়তা সেই মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল! অস্ফুট আর্ত্তনাদে—'বাবা—বাবা গো'—বলিতে বলিতে সে তীরের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া মিঃ ঘোষের ঘরের দিকে ছুটিল।

মধ্যপথেই কিন্তু তাহার গতিরোধ হইয়া গেল। সে দেখিল, সশব্দে মিঃ ঘোষের দরজা ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। মিঃ ঘোষ মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘর হইতে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নির্ম্মলা স্তম্ভিত ভাবে মধ্যপথে দাঁড়াইয়া ছিল—ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এ কি ব্যাপার! মিঃ ঘোষের চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত—মুখে যেন জীবনের কোন লক্ষণ নাই! মৃত ব্যক্তির মুখের মত ঘোর পাংশুবর্ণ সে মুখ! গতি স্খলিত, বাহ্য-চৈতন্যের কোন চিহ্ন তাঁহার আকৃতিতে দেখা যায় না। ঘোর নিদ্রাবস্থার মধ্যেই যেন তিনি উঠিয়া আসিয়াছেন মনে হয়! গভীর নিশীথে এই ভয়াবহ অদৃষ্টপূর্ব্ব কাণ্ড দেখিয়া নির্ম্মলা নিজেও সংজ্ঞা হারাইয়া নিঃস্পন্দের মত চাহিয়া রহিল। তাহার পিতার সে সময়ের মুখ দেখিয়া তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটা আকুল ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস তাহার বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে কোন স্বর বাহির হইল না। তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি হরণ করিয়া কে যেন তাহাকে পাষাণ-প্রতিমায় পরিণত করিয়া দিয়াছে!

মিঃ ঘোষ নিজের মনে অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে দুই এক পা চলিতেছিলেন, আবার মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন,—যেন একটা অতি গুরুতর সমস্যার কিছুতেই মীমাংসা হইতেছে না—এইরূপ একটা ব্যাকুল ভাব!

তাঁহার চোখ আধখোলা ভাবে থাকিলেও তিনি কিছুই দেখিতে-ছিলেন না। চলিতে চলিতে একবার নির্ম্মলার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাহার দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়াই বলিলেন, "না! না! সে অসম্ভব! নিজের সন্তানের কাছে, নিজের মুখে এ কথা বলা—ওঃ! সে কিছুতেই পারা যায় না! কিন্তু তা হলে— তা হলে কি হবে?"

কিছুক্ষণ তিনি শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সহসা কি যেন

মনে পড়ায় তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিজের মনে মৃদু মৃদু বলিলেন, "ঠিক হয়েছে—এই ঠিক! লিখে রেখে যাব; তা হলেই সব ঠিক হবে! আশ্চর্য্য! কথাটা এত দিন মনে পড়েনি!"

মিঃ ঘোষ বারাণ্ডা অতিক্রম করিয়া তাঁহার বসিবার ঘরের দিকে চলিলেন। নির্ম্মলাও এতক্ষণে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ঘোষ তাঁর ড্রয়িংরুমে দেরাজের নিকট আসিয়া চাবির সন্ধানে পকেটে হাত দিলেন।

রাত্রিবাসের ঢিলা জামায় পকেটের সন্ধান মিলিল না—তাঁহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিল। অধীর ভাবে টেবিলের উপরের জিনিসপত্র সরাইয়া ঘাঁটিয়া তিনি চাবি খুঁজিতে লাগিলেন।

নির্ম্মলা নীরবে তাঁহার কাণ্ড দেখিতেছিল, কথা কহিতে বা তাঁহার কাছে যাইতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না।

কিছুক্ষণ নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর ক্লান্ত হইয়া মিঃ ঘোষ একখানা চৌকীর উপর বসিয়া পড়িলেন। দুই হাতের উপর মাথাটা রাখিয়া তিনি মৃদুস্বরে কি বলিতেছিলেন, নির্ম্মলা উৎকর্ণ হইয়া অনেক চেষ্টায় দু-একটি কথা শুনিল, 'রামগোবিন্দ! জিত তোমারি—তুমি যে শোধটা নিলে—'

সে কথাটা কিছু বুঝিল না,—এ নাম সে কোন দিন শোনে নাই। তবে এতক্ষণে সে ব্যাপারটার একটা সামান্য সূত্রও যে পাইয়াছে, তাই যথেষ্ট।

মিঃ ঘোষ আবার উঠিলেন। বারাণ্ডা অতিক্রম করিয়া নিজের ঘরের সম্মুখে আসিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তার পর ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

নির্ম্মলা তাঁর ঘরের জানালার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে শুনিল, গভীর শব্দে তাঁহার নাসিকাধ্বনি হইতেছে।

২১

পরদিন প্রভাতে রান্নাঘরের সামনের বারাণ্ডায় পিসীমা বঁটি পাড়িয়া তরকারি কুটিতে কুটিতে নূতন চাকর বেহারীর সহিত বাজার লইয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন। বেহারী তখনো বাংলা ভাষায় পারদর্শী হইয়া ওঠে নাই,—পিসীমার হিন্দী ভাষায় জ্ঞান আরও অপূর্ব্ব,—কাজেই বিরোধ না মিটিয়া উত্তরোত্তর সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছিল।

পিসীমা অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে ঝুড়ি হইতে এক একটি তরকারি তুলিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া নিজের মনে গজ্ গজ্ করিতে-ছিলেন, "আ পোড়া কপাল! মূলোগুলোর ছিরি দেখ একবার! একে কি বাজার করা বলে? বলি চোখ দুটো তোর কোথায় ছিল? কপালের ওপর, না মাথার পিছনে?"

বেহারী এ-প্রশ্নের কোন সদুত্তর স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল।

তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ক্রমশঃ পিসীমার রাগ চড়িতে লাগিল। বলিলেন, "আবার ঢং করে চেয়ে আছে দেখ! যেন ন্যাকা—কিছু বোঝেন না! এ কি মূলো? এ যে একেবারে শুধু শিকড়! এ কি কখনো সিদ্ধ হয়, না খাওয়া যায়! তোদের মত রাক্কুসে জাত ত সবাই নয়! পোড়া জাত কাঁচা মূলো ধরে শিকড় থেকে পাতা পর্য্যন্ত কচকচিয়ে খেয়ে ফেলে! ওরা আবার দেখে

13

শুনে ভাল জিনিষ বেছে বাজার করবে! কি! কথা নেই যে মুখে, হাঁ করে চেয়ে রইলি যে বড় ?”

বেহারী উত্যক্ত হইয়া বলিল, “চেয়ে থাকবে না তো কেয়া, আঁখ্ বন্ধো করে থাকবে? কি হোয়েসে—উই বাত্ বোলো না—খালি ঝুট মুট বক্ বক্ করতা কাহে ?”

পিসীমা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, “মুখের উপর জবাব করিস্ না বলছি! জবাব আমি সইতে পারি নে! আধ পয়সার জিনিষ কেনবার মুরোদ নেই—আবার তার ওপর জবাব! রাগ হয় কি সাধ করে? আর এই কি তোর চার পয়সার কুমড়ো? এই আঙ্গুলের চেয়ে সরু রত্তি ফালি! এর দাম চার পয়সা? আমাকে বোকা বোঝাতে এসেছিস্, না ?”

বেহারীর মেজাজ ক্রমেই গরম হইয়া উঠিতেছিল, এখন চুরির ইঙ্গিতে সেও রাগিয়া উঠিল—ঘাড় ঝাঁকাইয়া সগর্ব্বে বলিল, “চার পয়সা দাম নেহি তো ক্যা—হাম্ চোরি কিয়া? তব্‌সে খালি বক্ বক্—কাল্ সে হাম্ নেহি যায়গা বাজার মে—নোকরি করনে হিঁয়া আয়া—চোরি করনে আয়া নেহি!”

পিসীমা মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, “নাঃ! চুরি তুমি করবে কেন? এক দম্‌সে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আয়া! মর মুখপোড়া! আবার চোপা দেখ! দাদার যেমন কাণ্ড! নিজের দেশ-ঘর ছেড়ে এই পোড়া মেড়োর দেশে বাস করতে এলেন—যেমন সব বুদ্ধি—তেমনি ক্যাড়োর ম্যাড়োর বুলি! আবার থেকে থেকে তেড়ে ওঠে; বলি তোকে না একটা নাউ আনতে বলেছিলুম? একটা তরকারীর জুত নেই—একটু ঘণ্ট-ঘণ্ট না হলে কি দিয়ে ওদের পাতে ভাতগুনো ধরে দিই? তা সেই নাউটাই আনতে ভুলে মরেছিস বুঝি ?”

বেহারী বলিল, "ভুলিয়েসে কোন্ বোলা তুম্‌কো ? নাউ তো লে আয়া !"

"—লে আয়া তো কই ? দেখতে পাচ্ছি না তো—এনেছিস্ ?"

"—হাঁ ! হাঁ ! লে আয়া ! বাহার মে খাড়া কর্‌কে হাম চলিয়ে এসেছি ! নাউ দেউড়ীমে আছে !"

"—মরণ আর কি ! যমের অরুচি ! সব জিনিসগুলো এখানে এনে সেটা আবার দেউড়ীমে রেখে মরা কেন ? এখানে আনতে কি নবাব-পুত্তুরের হাতে ব্যথা লাগে ? বুদ্ধি অগাধ কি না ! যা ! নিয়ে আয় এখানে !"

বেহারী বলিল, "কেয়া ? হিঁয়া লানে হোগা ?" পিসীমা রাগে মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিলেন, "হিঁয়া আনবে না তো কেয়া আমি দেউড়ীমে গিয়ে তরকারী বানাবো ? কি আপদেই পড়েছি গো ! সেই থেকে বকিয়ে বকিয়ে মাথা ধরিয়ে দিলে !"

বেহারী অতি অপ্রসন্ন ভাবে গজ্ গজ করিতে করিতে নাউ আনিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

পিসীমা নিজের মনে বকিতে লাগিলেন, "পোড়া দেশে এসে রাতদিন বকে বকে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো ! যেমন চাকর—তেমনি বামুন—তেম্নি সব ! এখান থেকে রান্নাঘরে গিয়ে আবার সেই বারোটা বেলা পর্য্যন্ত মরো বকে ! ওলো বামা ! ভাঁড়ার থেকে একটা নারকোল বের করে দে তো কুরে ! দু এক ভাগ নিজে গিয়ে রাঁধি ! খাওয়া দাওয়া তো ওদের বন্ধ হবার জোগাড় হলো ! যে রান্নার ছিরি, ভূতেও মুখ দিতে পারে না, তা আবার মানুষ !"

বামা কুরুনী ধুইতে ধুইতে বলিল, "তা যা বলেছ বাছা ! মিশির ঠাকুরের রান্নার জ্বালায় আমার তো অরুচি ধরে গেছে ! সেদিন এমন

সুন্দর করে পোস্ত বেটে তেঁতুল এনে ঠাকুরকে বেশ করে বুঝিয়ে বলে এলুম—বড়া ভেজে তেঁতুল থর্ থর্ অম্বল রাঁধতে! ওমা! খেতে বসে অম্বলের মূর্ত্তি দেখে আমার কান্না পেল! না-নুন-না-টক্, সব শুদ্ধু তাল পাকিয়ে যেন পিণ্ডি চট্‌কে রেখেছে! ডাল্ আর রুটী খেয়ে ওদের জন্ম কাটে, ভাল রান্না জানবে কোত্থেকে গা?"

ইতিমধ্যে বেহারী আসিয়া বলিল, "পিসীমা! তুমহার নাউ আনিয়েসে।"

পিসীমা তাহার দিকে ফিরিতেই দেখিলেন—এক পাঁচ হাত লম্বা মূর্ত্তি অর্দ্ধ-মলিন বসনে দাঁড়াইয়া! তাহার রং মিশ কালো, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, বগলে এক ময়লা কাপড়ের দপ্তর, পায়ে নাগরা জুতো।

পিসীমা অবাক্ হইয়া সন্দিগ্ধ নেত্রে এই বিভীষণ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বামা সভয়ে একবার তাহাকে দেখিয়া বলিল, "তোর মতলবখানা কি বল তো বেহারী? কথা নেই, বার্ত্তা নেই—কোত্থেকে কাকে নিয়ে একবারে বাড়ীর ভেতর এনে হাজির করলি—বড় বাড় বেড়েছে তোর?"

বেহারী বলিল, "ঝুঁট বাত মৎ বোলো বামি! আপনে আনিয়েসে না—কি পিসীমা বোল্লে—এইখানে নিয়ে আয়! হাম্ তো ওকে দেউড়ীমে খাড়া করকে আয়া!"

পিসীমা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আমি বলেছিলুম! তোর চালাকি আমি কিছু বুঝতে পারি না বটে? বাটপাড় কোথাকার! ঐ ডাকাতটার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে ওকে বাড়ীর শুলুক সন্ধান দেখাতে নিয়ে আসা হয়েছে! বামা! নির্ম্মলাকে ডাক তো একবার! তার চাকরের কাণ্ড-কারখানা দেখুক—কোন্ দিন অর্দ্ধেক রাত্রে যদি গলায় ছুরি না দেয় তো কি বলেছি!"

বেহারী এ-সব অযথা অপবাদের স্পষ্ট মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিলেও পিসীমার গালাগালি ও চীৎকারে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেও সক্রোধে নিজ পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করায় উভয় পক্ষে গোলমাল যখন তুমুল কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে, সেই সময় নির্ম্মলা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ব্যাপার কি? কি হয়েছে পিসীমা? এত গোলমাল কিসের?"

নির্ম্মলাকে দেখিয়া বেহারী যেন অকূলে কূল পাইল; বলিল—"দেখো ত দিদিমণি! আজ সবেরে সে খালি বক্ বক্ কর্কে পিসীমা হামাকে একদম হায়রাণ করিয়ে দিয়েসে। আপনেই বোল্লে—এক্ঠো নাউ বোলাও, হাম ওকে বোলিয়ে আনিয়েসে; তব্ সে নখুন ওখুন কুছু কাটে না,—খালি চিল্লাচ্ছে—আউর চিল্লাচ্ছে—বোলছে চোর ডাকু হারামজাদ! হামি আর এখানে নোকরী করবে না।"

পিসীমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "না করবে তো আমার রাজ্যিপাট একবারে অচল হয়ে গেল আর কি! বুঝেছ বাছা? আমি ওকে কোন কথাটি বলি নি। বাজারে গেল, তা দোষের মধ্যে বলেছি যে একটা নাউ আনিস, একটু ঘণ্ট রাঁধবো। সে কথা চুলোয় গেল—কোত্থেকে এক বাটপাড় ডাকাতকে বাড়ীর মধ্যে এনে তুলেছে, আবার তার উপর চোটপাট জবাব কি! দাদা উঠুন একবার, মজাটা দেখাচ্ছি ওকে!"

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া নির্ম্মলার মলিন মুখ এক মুহূর্ত্তে কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে একটু হাসিয়া বলিল, "ওকে চারটে পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দে বেহারী! পিসীমা এখন নখ কাটবেন না।"

"—ওহি বাৎ এৎনা ঘড়ি বোল্লেই ঠিক হোতো! তব্ সে খালি

বখেড়া, খালি বখেড়া,—চলা আও ভেইয়া!" অতি অপ্রসন্ন মুখে নাপিতকে লইয়া বেহারী বাহিরে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা বলিল, "ওর কিছু দোষ নেই পিসীমা! তুমি ওকে নাউ আনতে বলেছিলে, ও তো বাংলা বোঝে না, ওরা নাপিতকে নাউ বলে, তাই ও একটা নাপিত ডেকে এনেছিল! এদেশে থাকতে হলে ওদের কথাগুলো একটু শিখতে হবে! না হলে ওদের দিয়ে কাজ করাতে পারবে না।"

পিসীমা তখনো হাঁপাইতেছিলেন—নির্ম্মলার কৈফিয়ৎ শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গালে হাত দিলেন। তাঁহার মুখে কোন কথা জোগাইল না।

বামা বলিল, "গড় করি বাছা! তোমাদের এ দেশের পায়ে! নাউ কিনতে বল্লে নাপিত ডেকে আনে! পোড়া নাপিতেরি বা কি দুষমন্ চেহারা! যেন খুনে ডাকাত! সাধে আর মন টেঁকে না এখানে? সবই যেন ছিষ্টিছাড়া কারখানা!"

নির্ম্মলা কেমন করিয়া তাহার বক্তব্য বিষয়টি পিসীমার কাছে তুলিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। সে এখন বামার কথায় সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "সত্যি পিসীমা! আমারও আজকাল এখানে আর মন টেঁকে না। এখানে ত অনেক কাল কাটলো, এখন একবার দেশ-ঘর দেখতে ইচ্ছে করে।"

এই মনোমত প্রস্তাবে এতক্ষণের পর পিসীমার মনের ক্ষোভ ও বিরক্তি দূর হইয়া গেল। তিনি হৃষ্ট চিত্তে বলিলেন, "সে ত ভাল কথা মা! চিরকাল কি আর বিদেশ-বিভুঁই ভাল লাগে, না মানুষ চিরটা দিনই বাইরে বাইরে পড়ে থাকে? আজ দাদা খেতে এলে আমি বোল্‌বো—আমার মিলু-মার এখানে আর ভাল লাগছে না, এবার তোমার এখানকার বাস তুলতে হবে, কেমন—বোল্‌বো ত?"

নির্ম্মলা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "কিন্তু পিসীমা! তোমার কি মনে হয় আমরা এতদিন বাইরে কাটিয়ে এখন দেশে গিয়ে থাকতে পারবো? কোথাও কিছু আট্‌কাবে না?"

পিসীমা বলিলেন, "ওমা! তা পারবে না কেন? তোমার বাপের দৌলতে সে কি আর আগেকার মত পাড়াগাঁ আছে? চারদিকে বড় বড় পাকা রাস্তা, ইস্কুল, হাঁসপাতাল, ছেলেদের খেলবার মাঠ—সব ঠিক বড় সহরের মতো, যা চাও তাই পাবে—থাকতে পারবে না কেন? বন-জঙ্গল কাটিয়ে দুটো বড় বড় বাগান করে দিয়েছেন। একটা বড় দীঘি কাটিয়েছেন—তার যে জল—একবারে পরিষ্কার তক্ তক্ করছে।"

নির্ম্মলা বাধা দিয়া অধীরভাবে বলিল, "আমি সে-কথা বলছি নে। আমি বলছিলুম কি—পাড়াগাঁয়ে সব নানা রকম লোকেদের দলাদলি, রেষারেষি, শক্রতা থাকে শুনি কি না, তাই বলছি, আমাদের কেউ সে রকম আছে কি না—বাবার সঙ্গে ত কারু কোন মনান্তর নেই?"

"—শোন কথা! দাদা আমার মহাদেব-তুল্য লোক, ওঁর সঙ্গে আবার মনান্তর! সেখানকার লোকে ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করে। তবে হ্যাঁ! লোক ত সব রকম আছে—ঘোঁট পাকাতে পারে বটে—তোমার এত বয়েস হলো—বিয়ে হয় নি! তা ছাড়া চাল-চলন তোমাদের একবারে বদলে গেছে কি না! তা সে মরুক গে! তার জন্যে কিছু আটকাবে না—আড়ালে আবডালে কে কি বলে না বলে—তাতে কান দেবার দরকার কি?"

নির্ম্মলা বলিল, "আজ তুমি সব দেশের গল্প কর পিসীমা! আমার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাদের বাড়ীতে এখন কে কে আছেন, বাড়ীর চারপাশেই বা কারা বাস করেন—তাঁদের সব কথা তুমি বলো। তার

পর সে যেন নিতান্ত কথাপ্রসঙ্গেই খুব সহজ ভাবে বলিল, "আচ্ছ পিসীমা! দেশে রামগোবিন্দ বলে কে একজন আছে, তুমি চেন তাঁকে?"

পিসীমা হঠাৎ এ কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া তীব্র দৃষ্টিতে নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিলেন। সে তখন অন্যমনে বেগুনের বোঁট লইয়া মাটিতে আঁক কাটিতেছিল। সে যে এ-সব কিছু জানে, তাহ বোধ হইল না। তখন তিনি বলিলেন, "রামগোবিন্দ? কই বিশেষ ত কিছু মনে পড়ছে না! ওঃ! ঠিক! একজন ছিল বটে, তা সে তো আমাদের ওখানে নয়, সে ভিন্ন গাঁয়ে থাকতো। তা তুমি এ কথ জিজ্ঞাসা করছো যে? দাদার কাছে শুনেছ কিছু?"

নির্ম্মলা উদাসীন ভাবে বলিল, "না—আমি কিছু শুনি নি নামটা দু'একবার বাবার মুখে শুনেছিলুম, তাই জিজ্ঞাসা করছি কেন, সে লোকটা কি করেছিল পিসীমা? সে কি এখনো সেখানে আছে?

পিসীমা একটু বিব্রত ভাবে বলিলেন, "এখন তারা সেখানে আর থাকে না। তোমার বাপের সঙ্গে তার অনেক দিন ধরে মামলা চলছিলো—আমি শ্বশুরবাড়ী থেকে একবার এসে শুনে গিয়েছিলুম সে বিশ বাইশ বছর আগেকার কথা। তার পরে কিসে কি হলো তা আমিও ঠিক জানি নে। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, তবে সেখানে তাদের বাস আর নেই—"

নির্ম্মলা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "পাঁচজনে কি কথা বলে পিসীমা?"

পিসীমা গম্ভীরমুখে বলিলেন, "সে-সব তোমার শুনে কাজ নেই বাছা! তা ছাড়া, আমি ওসব বাজে কথা বিশ্বাসও করি নে। দাদার

দ্বারা যে কখনো···" বলিতে বলিতে পিসীমা উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "যাই একবার রান্নাঘরে গিয়ে দেখি—মিশির কি কাণ্ডটা করছে! সবাই সমান কাজের ত।"

নির্ম্মলা উভয় হস্তে মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। পিসীমা রান্নার ছুতায় কথা চাপা দিয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার ভাবে বোধ হইল, তিনি হয় ত অনেক কথাই জানেন, কিন্তু নির্ম্মলার কাছে তিনি এসব কোন দিনই প্রকাশ করিবেন না। তবে তার পিতার জীবনের মধ্যে এমন একটা কিছু রহস্য গুপ্ত আছে, যাহা আজ তাঁর এমন মর্ম্মান্তিক অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্ম্মলা নিজের অন্তরের মধ্যে একটা তীব্র বেদনা ও লজ্জা বোধ করিতেছিল, —যে পিতার মহৎ ও উন্নত চরিত্র তাহার কাছে এত দিন পবিত্র আদর্শের মত গরীয়ান্ ছিল, সেই দেবতুল্য চরিত্রে এ কি অকথ্য লজ্জা ও কলঙ্কের কালিমা! যে পাপ ও কলঙ্কের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করা যায় না, সেই গভীর দুরপনের কলঙ্কের বোঝা হৃদয়ে লুকাইয়া তাহার পিতা কি দারুণ, কি মর্ম্মান্তিক বেদনা নিঃশব্দে বহন করিতেছেন! জাগ্রতে, শয়নে, স্বপনে—কোন সময়ে সেই মর্ম্মদাহকর চিন্তার দহন হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি নাই! গভীর সুষুপ্তির মধ্যেও সেই চিন্তা তাঁহাকে শাপগ্রস্ত নিশাচরের মত কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পরিভ্রমণ করাইতেছে! গত রাত্রে চাঁদের আলোয় তাহার পিতার সেই পাংশুবর্ণ মুখ নির্ম্মলার মনে পড়িল ও সেই সঙ্গে তাঁহার সেই অর্দ্ধোক্তি 'না—না, নিজের মুখে একথা বলা যায় না' উঃ!' কি তীব্র বেদনার দাহ নিশিদিন তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে!

মর্ম্মাহত হৃদয়ে নির্ম্মলা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল—এমন কি অন্যায় কাজ তাহার পিতা করিয়াছেন? হয়ত সে কথা আর তিনি চাপিয়া

রাখিতে পারিতেছেন না। হয় ত তাঁর মনে হয়, নির্মলাকে সব কথা বলিয়া মনে শান্তি পাইবেন, কিন্তু দুর্নিবার লজ্জায় সে কথা তার কাছে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সে এখন কি করিতে পারে? কি করিলে তাঁহাকে এ অবস্থায় সে একটু শান্তি দিতে পারে?

বেহারী আসিয়া বলিল, "একঠো আদমী এসেছে দিদিমণি! ও বলছে দু-রোজ সে কুছু খানা-পিনা হোয় নি—বহুৎ দুবলা হোয়ে গেসে! আপনে একবার দেখবে ওকে?"

নির্মলা চোখের জল মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে? কোন ভিখিরি? তুই তাকে মিশিরের কাছ থেকে চেয়ে কিছু খাওয়াতে পারলি না? আবার আমায় ডাকতে এলি!"

বেহারী মাথা নাড়িয়া বলিল, "নেহি! নেহি! ভিখারী নেই আছে সে! ভাদর আদমী! বহুৎ ভাদর লোক! ওহি লিয়ে হামি ওকে বসিয়ে আপনেকে খবর দিতে এসেসি! ভিখিরি হোবে তো হামি ওকে দুটি ভাত খিলাতে পারতিস্ না?"

এ বাগান-বাড়ীটা সহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। লোক-জনের বসতি বা যাতায়াত এখানে নিতান্তই অল্প। হঠাৎ এখানে কোন্ অনাহার-ক্লিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল, নির্মলা বুঝিতে পারিল না। অগত্যা সে উঠিয়া বলিল, "চল্! কে এসেছে দেখি গে!"

টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া এক বাঙালী যুবক বাহিরের ঘরে চৌকিতে বসিয়া সম্মুখের বাগানের দিকে চাহিয়া ছিল।

বেহারীর কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইতেই নির্মলাকে দেখিয়া তাহার উপবাস-পীড়িত শুষ্ক মুখ সহসা হর্ষ-পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সসম্ভ্রমে চৌকি ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এ কি! আপনি এখানে?"

নির্মলাও সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—সে অসিত!

২২

কল্যাণপুরের মহারাজার সুসজ্জিত প্রাসাদের এক উজ্জ্বল আলোকময় কক্ষে বীণা কিরণের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিল।

মহারাজার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। জেলার সমস্ত রাজপুরুষ, জমীদারবর্গ, স্থানীয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত জনগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসবে যোগ দিয়াছেন। এক মাস আগে হইতে এই উৎসবের আয়োজন ও এ সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিতেছিল। মহিলাদের মধ্যে পরস্পরে দেখা হইলেই সেদিনের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কথা হইত। পরামর্শ দান ও গ্রহণ সমভাবেই চলিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদের ফরমায়েসেরও অন্ত ছিল না।

বীণা সেদিন তাহার অপূর্ব্ব রূপের আভায় ও উজ্জ্বল সাজ-সজ্জায় ঝলমল করিতেছিল। তাহার পরিধানে একখানা ভায়োলেট রংয়ের সাড়ী—সোণালি জরির বড় বড় গোলাপ ফুলে খচিত। কণ্ঠে মুক্তার মালা। ঘন-কৃষ্ণ, মসৃণ চুলের উপর একটি হীরার প্রজাপতি দীপ্ত তারকার মত জ্বলিতেছিল।

আজ সে আর একবার কিরণের উপর তাহার বিমোহন শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে জয় করিবার সংকল্প করিয়াছে।

লীলা হলের ভিতর মিসেস্ রায়ের নিকট বসিয়া ছিল; সে শুনিল, বীণা বলিল, 'আমার আজকের এই নতুন পোষাকটা তোমার কেমন লাগ্‌ছে?'

কিরণের উত্তর স্পষ্ট শোনা গেল—"আমার আজ কিছু বলবার নেই বীণা! চোখ আমার ঝল্‌সে গেছে! আজ তোমায় দেখ্‌বো, কি তোমার পোষাক দেখবো, তা বুঝতে পাচ্ছি না!"

বীণার সুন্দর মুখখানি সুখে ও লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

সে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কিরণের হাত ধরিয়া বলিল, "আজ কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে, কেমন ?"

কিরণ এ কথার উত্তরে কেবল একটু হাসিল।

চৌধুরী নিকটে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নেত্রে বীণার দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার আশা, বীণার সহিত দৃষ্টি মিলিলেই তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইবে। বীণা কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। "চলো বাগানটায় একটু বেড়িয়ে আসা যাক্," বলিয়া সে কিরণের হাত ধরিয়া মনের উল্লাসে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিসেস্ রায় প্রসন্ন নেত্রে তাহাদের লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিরণ সর্ব্বাংশেই প্রার্থনীয় সুপাত্র। বীণা যদি তাহাকে বাঁধিতে পারে, সে ত আনন্দের বিষয় !

কেবল লীলার মনটা যেন একটা অজ্ঞাত বিষাদে ভার হইয়া উঠিল। কিরণের সঙ্গে তাহার বিরোধ আজও মেটে নাই। সে ভাবিল, বীণার সঙ্গে কিরণের আজকাল এত ঘনিষ্ঠতা কেন ? সেদিনকার কথা,—যেদিন তাহারা মাঠে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল— সেই দৃশ্য তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে স্পষ্ট বুঝিল, বীণা আজকাল আর সবাইকে ছাড়িয়া কিরণকে আয়ত্তে আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

ইহাতে তাহার রাগের কারণ কি হইতে পারে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না ; কিন্তু তাহার মন এ চিন্তায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। হৌক্ সুন্দরী,—তবু কিরণকে পাইবার প্রত্যাশা করা তাহার কি দুঃসাহস ! কিরণ কি একটা যে-সে সামান্য লোক ?

কল্যাণপুরের কয়েক মাইল প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে। মাঠে ও বাগানের মাঝে মাঝে রঙিন্ লণ্ঠন ; কৃত্রিম

উৎসসমূহ হইতে সুগন্ধি জলধারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মাঠে নানাবিধ বাজীর অগ্নিক্রীড়া রাত্রে বহু দূরের অধিবাসীদেরও আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কিরণ আজ অন্য দিন অপেক্ষাও অসম্ভব রকম গম্ভীর। সে কেবল ভদ্রতার অনুরোধে বীণার সঙ্গে হলে, বারাণ্ডায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বীণা ভাবিয়াছিল—আজিকার রাত্রের সমস্ত সময়টা সে কিরণের সঙ্গে নিজের ইচ্ছামত আমোদে কাটাইবে; কিন্তু সে শীঘ্রই বুঝিল, কিরণের উপর তাহার নিজের ইচ্ছা কিছুতেই খাটিবে না। সে তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিল—কিন্তু কোন ফল হইল না।

কিরণ আজ অত্যন্ত অন্যমনা হইয়া পড়িতেছিল। সে বীণার সঙ্গে হাসিতেছিল, গল্প করিতেছিল, কিন্তু সে কেবল শুষ্ক ভদ্রতার খাতিরে—তাহার হাসি-গল্পে কোন আনন্দ বা প্রাণের লক্ষণ ছিল না। সে বীণার কাছে ছিল বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত মন ও দৃষ্টি লীলার উপরে পড়িয়া ছিল।

মহাসমারোহে আহারের পালা সাঙ্গ হইল। বাহিরে মাঠে কলিকাতা হইতে আনীত ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। হলে স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞদিগের সভায় দেশীয় রাগ-রাগিণীর আলাপ হইতেছিল। নিমন্ত্রিতেরা দলে দলে আহারের পর নিজের ইচ্ছামত ব্যাণ্ড শুনিয়া বাগানে বেড়াইয়া, বাজি দেখিয়া ও স্থানে স্থানে জটলা করিয়া বেড়াইতেছিল।

লীলা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া একজন বিখ্যাত ওস্তাদের সেতার শুনিতেছিল। আজ এ প্রমোদ-ভবনের বিপুল উৎসবে সে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারে নাই। কি একটা অজ্ঞাত বিষাদের ভারে তাহার

মন যেন উদাস হইয়া পড়িতেছিল। হলের ভিতর তাহার বন্ধুবান্ধবদের হাসি, গল্প কিছুই আজ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। আহারের পর সুযোগ বুঝিয়া সে ধীরে ধীরে সকলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বারাণ্ডায় একা আসিয়া দাঁড়াইল।

অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোকে জ্যোৎস্নার আলো ম্লান করিয়া চারিদিক হাসিতেছিল। অধিকাংশ লোকে দিকে দিকে চলিয়া যাওয়ায় সুবৃহৎ হলঘর প্রায় নিস্তব্ধ। সেই গভীর রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে সেতারের মধুর ঝঙ্কারে সুরের লহরী দিকে দিকে উছলিয়া পড়িতেছে। লীলা নিজের বেদনা ভুলিয়া আত্মবিস্মৃতের মত এক মনে বেহাগের আলাপ শুনিতে লাগিল।

"এই যে! আপনি এখানে! আমি খাওয়ার পরে আপনাকে কত জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম,"—মিঃ দত্ত আসিয়া লীলার পাশে দাঁড়াইলেন—"সেতারটা বোধ হয় আপনার খুব ভাল লাগে—নয় কি? যে রকম মন দিয়ে শুন্‌ছিলেন!"

লীলা একটু হাসিয়া বলিল, "আমি আমাদের দেশের সব বাজনাই ভালবাসি! তা ছাড়া, আমার মনে হয় এ-দেশের রাগ-রাগিণীর মত জিনিস বুঝি আর কোথাও নেই। এখানকার সঙ্গীত-শাস্ত্রটা খুব ভাল করে চর্চ্চা করবার আমার অত্যন্ত ইচ্ছা আছে। আপনার কি ভাল লাগে না?"

"—আমার? খুব ভাল লাগে! এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একবারে একমত! বিশেষ, আমার নিজের অবসর সময়টা ত এই চর্চ্চাতেই কাটে! সন্ধ্যের পর আর ত কোন কাজ থাকে না—রাত্ত এগারটা পর্য্যন্ত সমানে সেতার চলতে থাকে।"

"—তাই না কি? তবে ত আপনি নিজেই একজন পাকা ওস্তাদ!

এত দিন এখানে থাকলেন, কই, এক দিনও ত আমাদের শোনালেন না কিছু? এটা কিন্তু আপনার বড় অন্যায়!"

মিঃ দত্ত হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ওটা ভুল বুঝলেন মিস্ রায়! আমি বলেছি—রাত এগারটা পর্য্যন্ত বাজনা চলে,—কিন্তু সে বাজনা আমি বাজাই, এমন কথা ত বলি নি। বাজনা চলে বটে, তবে বাজান যিনি, তিনি হচ্ছেন আমার ওস্তাদ। আমি শুধু ইজি চেয়ারে পড়ে পড়ে শুনি।"

"—কিন্তু আপনার ত যথেষ্ট অবসর আছে, নিযুক্ত লোকও রয়েছে—আপনি নিজে শেখেন না কেন? শুধু শুনে শুনে কি এ সব বিষয়ে কিছু তৃপ্তি হয়? আমি ত যতক্ষণ সে বিষয়টা নিজের আয়ত্তে আন্‌তে না পারি, ততক্ষণ আমার তৃপ্তি হয় না।"

"—সে হলে ত ভালই হতো। তবে সকলের মধ্যে সব জিনিস ত থাকে না,—ঐ খানটায় গোল বাধে। চেষ্টা আমি অনেক করেছিলুম; কিন্তু শেষে দেখা গেল—সঙ্গীতের সরস্বতী আমার প্রতি একবারে বিমুখ। কাজেই সরে দাঁড়াতে হলো!" বলিয়া মিঃ দত্ত হাসিতে লাগিলেন।

লীলাও হাসিল। কিছুক্ষণ পরে মিঃ দত্ত বলিলেন—"যা হোক, এত দিন আপনাদের এখানে বড় সুখেই ছিলুম—মিস্ রায়! কিন্তু এবার শীঘ্রই এ-সব ছেড়ে আমার সেই নির্ব্বাসনে ফিরে যেতে হবে! ছুটীর দিনগুলো যতই শেষ হয়ে আসছে—ততই যেন আমার মনে একটা উদ্বেগ ও আতঙ্ক জড়িয়ে ধর্‌ছে! কি করে যে আবার সেই নিঃসঙ্গ জীবনের দীর্ঘ দিনগুলো আমার কাটবে—তা ভেবে পাচ্ছি নে!"

মিঃ দত্ত বাংলার কোন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। ছুটি লইয়া কিছু দিন হইতে পাটনায় বাস করিতেছিলেন।

লীলা তাঁহার মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি ফিরাইল। সে দৃষ্টি মমতা ও সহানুভূতি-পূর্ণ। ব্যথিত চিত্তে সে বলিল, "সত্যি! একবারে একলা সেখানে পড়ে থাকতে আপনার বড় কষ্ট হয়, না? আমি ত একবারে একলা থাকার কথা ভাবতেই পারি নে—কোন দিন একলা থেকেছি বলে আমার মনে হয় না—"

মিঃ দত্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কষ্ট বলে কষ্ট? সেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ী—সেটা সহর থেকে অনেক দূরে—একটা নদীর ধারে। সেদিকে বড় লোকজনের বসতি নেই। তারি এক ধারের দুটো ঘরে আমি থাকি। দিনের বেলাটা কাজে কর্ম্মে এক রকম কেটে যায়; কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে সময় আর কাটতে চায় না। হয় ত একখানা বই হাতে করে ইজি চেয়ারে পড়ে আছি, পড়তেও মন লাগে না। কোন-কিছু করতেও ইচ্ছে হয় না—অলস হয়ে পড়ে আছি। রাত দশটার পর চাকরদের অনুগ্রহে সিদ্ধ-পক্ক—যা হোক এক রকম করে খাবারটা তৈরি হয়ে এলো—যা পারি, মুখে গুঁজে দিয়ে শেষে শুয়ে পড়লুম। দিনের পর দিন এই ভাবে কেটে যাচ্ছিল। শেষে অসহ্য হতে আজকাল একজন ওস্তাদ রেখেছি—তাঁর বাজনা শুনতে শুনতে কোন রকমে সময়টা কেটে যায়। এই ত আমার সেখানকার জীবন—"

"—কিন্তু কেন এত কষ্ট ভোগ করেন—মিঃ দত্ত? আপনি ত ইচ্ছা করলেই একজন জীবনের সঙ্গিনী খুঁজে নিতে পারেন—শুধু শুধু এত নিগ্রহ সহ্য করবার দরকার কি?" লীলা বন্ধুর মত সরল ভাবে কথাটা বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

"—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন—মিস্ রায়! কিন্তু প্রার্থিত বস্তুকে সব সময়ে চাইলেই কি পাওয়া যায়? অনেক সময় সেই উদ্বেগ ও আশঙ্কায় কথাটা বলতেও সাহস হয় না যে!"

তাহার মুখের উপর মিঃ দত্তের গভীর, সাগ্রহ দৃষ্টি অনুভব করিয়া লীলা ঈষৎ বিব্রতভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। এ প্রসঙ্গের আর অধিক র চর্চ্চা করিতে তাহার প্রবৃত্তি বা সাহস হইল না।

মিঃ দত্ত কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। তার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া নম্র মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমি আজ আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, মিস্ রায়! হয় ত—আজ না হলে আর বলাই হবে না,—সেই জন্য আপনার অনুমতি চাই।"

লীলা মুখ তুলিয়া চাহিল। মিঃ দত্তের উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য দেখিয়া সে কতকটা আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

প্রকাশ্যে সে অবিচলিত মুখে স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বল্‌তে চান্ বলুন না। আপনি আমাদের এত দিনের বন্ধু,—আপনার আবার এত আদব্-কায়দার দরকার কি?"

লীলার স্থির অবিচল মুখ দেখিয়া মিঃ দত্তের উৎসাহ ও আশা অনেকটা দমিয়া গেল। তবু তিনি বলিলেন, "আমি অনর্থক কতকগুলো ভূমিকা করে সময় নষ্ট করতে চাই না—মিস্ রায়! আমার যা বল্‌বার আছে—তা একেবারেই বোলবো। আমি আপনাকে ভালবাসি। আমার সবই তো আপনারা জানেন,—যদি আমায় যোগ্য বলে মনে করেন—"

লীলার মুখে একটা তীব্র বেদনার ছায়া পড়িল। যেন কে তাহার অত্যন্ত ব্যথার স্থান সবলে মাড়াইয়া দিয়াছে! কিরণের স্নেহ হারাইয়া সে আজ কত দিন হইতে দিবানিশি কি যে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আবার একজনের হৃদয়ের অনুরাগ প্রত্যাখ্যান করিয়া সে অন্যকে এই আঘাত কি বলিয়া দিবে!

মিঃ দত্ত বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেকদিন থেকেই আপনাদের

পরিচিত, এবং আপনাদের বন্ধু, এ গর্ব্ব করবার অধিকারও আমার আছে; কিন্তু আমার এই মনের ভাবটি আমি নিজেই এত দিন জানতে পারি নি। আপনি ক্লাবে যেদিন গান গাইলেন, সেই দিন যেন আমি আপনাকে নূতন করে দেখলুম। সেদিন থেকে আপনার শোভায়, আর আপনার প্রতি ভালবাসায় মন আমার পূর্ণ হয়ে রয়েছে! আমি বড় উচ্চ আশা করেছি—মিস্ রায়! এত বড় সৌভাগ্যের আমি যোগ্য নই, তবে যদি—"

লীলা ব্যথিত হৃদয়ে মিঃ দত্তের উচ্ছ্বাসে বাধা দিল,—"এতে যোগ্য-অযোগ্যের কোন কথা নেই, মিঃ দত্ত! আমি আপনাকে হয় ত কষ্ট দিলুম—মাপ করবেন, আমি বিবাহ করবো না স্থির করেছি। যদি করতুম, তা হলে হয়ত আপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতুম না।"

মিঃ দত্তের মুখ মলিন হইয়া গেল। লীলা আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সে কাহাকেও কষ্ট দিতে পারিত না। তাঁহার ম্লান দৃষ্টি অনুভব করিয়া সে মুখ নত করিয়া রহিল।

মিঃ দত্ত অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হলের ভিতর তখনো পূর্ণতানে সেতার বাজিতেছিল—যেন কাহার যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত বেদনা সুরের ভিতর হইতে ফুলিয়া ফুলিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। নীচে বাগানে দলে দলে সুসজ্জিত নর-নারীর মেলা—তীব্র পুষ্পসার ও ফুলের সুবাস বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া স্থানটিকে মদির-গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মিঃ দত্ত বলিলেন, "এটা কিন্তু আপনার বড় অসঙ্গত ইচ্ছা, মিস্ রায়! এ ইচ্ছা আপনার চিরকাল থাকবে না। শীঘ্রই হোক্, বা বিলম্বেই হোক্, এক দিন আপনাকে এ মত পরিবর্ত্তন করতেই হবে। তবে আমায় বৃথা বঞ্চিত করবেন কেন?"

তাঁহার শেষের কথাটায় তাঁহার মনের হতাশা যেন বিলাপ-ধ্বনির মত বাজিয়া উঠিল।

লীলা বলিল, "আপনি বরং বীণাকে বলে দেখুন। তার সংসারী হবার ইচ্ছে আছে; কিন্তু সে ইচ্ছে আমার ভিতর মোটেই নেই। আমার বিশ্বাস—বিবাহ হলেই সব উন্নতিতে বাধা পড়ে। মেয়েরা যখন স্ত্রী হয়ে যায়, তখন তারা আর নিজের থাকে না,—ভালবাসারই হোক্, বা শক্তিরই হোক্, একটা চাপ ও বন্ধন তার ঘাড়ে চাপ্‌বেই।"

"—কিন্তু আমার স্ত্রী বাতাসের মত স্বাধীন থাকবে, আমি কোন দিন তার ইচ্ছায় বা স্বাধীনতায় বাধা দেব না।"

"—তা হয় ত হতে পারে। কিন্তু আমায় মাপ করবেন—উপস্থিত সময়ে স্ত্রী হবার মত দায়িত্ব নেওয়া—আমি কিছুতে মনে আনতে পারছি না।"

"—হয় ত কিছু দিন পরে আপনার মত বদ্‌লাতে পারে। আমায় যত দিন বলবেন, আমি ততদিন অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি!"

লীলা অত্যন্ত বিব্রতভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "সে অসম্ভব কথা। কবে আমি মত বদ্‌লাবো, তা আমি নিজেই জানি না—আপনি তার জন্য অপেক্ষা করবেন কি করে? আমাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হোক্—কিন্তু এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হয়ে যাক্।"

লীলার কথা শেষ হইবার পর মুহূর্ত্তেই সহসা কিরণ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

"যদি তোমাদের আলাপে বাধা দিয়ে থাকি, তবে মাপ করো।, লীলা! তোমায় ডাক্‌বার জন্য একজন আমাকে পাঠিয়েছেন"—এই বলিয়া সে পূর্ব্বের মত অকুণ্ঠিত সহজভাবে লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া আসিল।

২৩

এই আকস্মিক ব্যাপারে লীলা কিছুক্ষণের জন্য একবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। আজ এক মাস হইতে যায়,—কিরণ তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া দূরে দূরে বেড়াইতেছে,—তাহার শত চেষ্টা ও আগ্রহ সত্ত্বেও তাহার সহিত একটা কথাও বলে নাই;—আর আজ সহসা এ কি ব্যাপার! লীলা কিছু বুঝিতে পারিল না। তাহার বুকের ভিতর এত কাঁপিতেছিল যে, ক্ষণকালের জন্য যেন তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল। আজ এক মাস হইতে লীলা সর্ব্বক্ষণ মনে মনে কিরণের সঙ্গে একটিবার সাক্ষাতের কথা একান্ত ভাবে আশা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু যেদিন অতর্কিত ভাবে তাহার সেই একান্ত প্রার্থিত সুযোগ আসিল—তখন আর তাহার কোন কথা বলিবার ক্ষমতা রহিল না।

কিরণও বাগানের দিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। সে যে কি চায়, তাহার মনের স্পষ্ট ভাবটি কি, তাহা সে নিজেই জানিত না—সে শুধু এই বুঝিয়াছিল,—এ ভাবে থাকিতে আর সে পারিতেছে না।

আজ এক মাস লীলার নিকট হইতে দূরে থাকিয়া সে নিজের হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে শ্রান্ত, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। লীলার সহিত বিবাদ করিয়া দূরে থাকা তাহার পক্ষে অসাধ্য; অথচ, তাহাকে নিকটে দেখিলেও রাগে তাহার সমস্ত হৃদয় জ্বলিয়া উঠে। তখন কেবল কঠোর কথা ছাড়া আর কিছু তাহার মুখে আসে না! কেন লীলা অবুঝের মত এই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া তাহার মনে এমন আগুন জ্বালাইয়া দিল?

যাহাকে দূরে রাখা যায় না, কাছে আনিলেও বুকের ভিতর দহনের জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠে, তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কিরণ তাহাই একমনে ভাবিতেছিল।

আজ যখন সে এখানে আসে, তখনো তাহার সঙ্কল্প আগের মতই ছিল,—লীলার সঙ্গে সে কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। এক মাস সে লীলার মুখের দিকে চাহে নাই, এক মাস সে তাহার মুখের একটি কথা শোনে নাই,—আরও কি এ ভাবে মানুষ থাকিতে পারে? যত সব বর্ব্বরের দল—যাহারা লীলাকে কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না,—তাহারা সকলে সর্ব্বক্ষণ তাহাকে ঘিরিয়া বেড়াইবে,—আর সে শুধু দূরে বসিয়া থাকিয়া তৃষিত নেত্রে তাহাই চাহিয়া চাহিয়া দেখিবে?

মনের আবেগ এক সময় অনিবার্য্য হইয়া উঠায়, কিরণ সহসা যেন ছোঁ মারিয়া, দত্তের নিকট হইতে লীলাকে সরাইয়া আনিল।

বারাণ্ডার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া তখনো লীলা অধোমুখে কাঁপিতেছিল। কিরণ দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। ফুলের মত সুকুমার, জ্যোৎস্নাস্নাত সেই চিরদিনের প্রিয় স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ! ইহারই জন্য তাহার সমস্ত জীবন এমন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে! আজ যেমন সে সকলের সম্মুখ হইতে তাহাকে নিজ অধিকারের গর্ব্বে তুলিয়া আনিয়াছে, এমনই করিয়া কি সে তাহার দুই সবল বাহুর শক্তিতে সকল বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া এই সুকুমারী তরুণীটিকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে না? সে ছাড়া লীলার উপর আর কাহার এমন অধিকার আছে? কিন্তু—কিন্তু—সে যে নিজেই আজ তাহার সমস্ত ভালবাসা ও স্নেহ উপেক্ষা করিয়া তাহার নিকট হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে!

'কিরণ!' লীলা নিজেকে বিস্তর চেষ্টায় কতকটা সংযত করিয়া লইয়া ডাকিল—'কিরণ '

কিরণ চমকিয়া উঠিল! বহু দিনের পর আজ এই প্রিয় আহ্বানে তাহার সর্ব্ব শরীরে যেন একটা সুখের তরঙ্গ বহিয়া গেল! সে শুধু আত্মবিস্মৃতের মত লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—উত্তর দিতে পারিল না।

লীলা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার বলিল—"কিরণ! আমায় ডাকবার জন্য কে তোমায় পাঠিয়েছিলেন, বল্লে না ত?"

"কেউ নয়!"

"তবে তুমি মিছে কথা বল্লে যে?"

"না হলে ঐ দত্তটা কি তোমায় আজকে আর ছাড়তো?"

আবার দুইজনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। গত দিনের কত ঘটনা, কত তুচ্ছ কথা, খুঁটি-নাটি কত ঝগড়া, কত সুখের স্মৃতি, মনে উঠিয়া তাহাদের দুইজনকে বিমনা করিয়া তুলিতেছিল। এত দিনের বিচ্ছেদের পর আগের মতই অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিবার জন্য দুজনেরই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই কয়েক দিনের বিরোধ তাহাদের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিছুতেই তাহারা আর পূর্ব্বের সহজ জীবনে প্রবেশের পথ পাইল না।

কিছুক্ষন পরে লীলা আবার কথা বলিল। আজ অনেক দিন পরে সে যে সুযোগটুকু পাইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার তাহাকে করিতেই হইবে! আজ তাহার যাহা বলিবার আছে—তাহা সবই গুছাইয়া বলিতে হইবে!

"—এত দিন পরে তা হলে তুমি আমায় মাপ করেছ, কিরণ?"

হঠাৎ কিরণ আবার কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, "তোমাকে মাপ?

কখনো না! কোন দিন আমি তোমাকে মাপ করতে পারবো না।"

লীলার মুখ একেবারে রক্তশূন্য সাদা হইয়া গেল! সে অতি কষ্টে বলিল, "কেন কিরণ! এত কি দোষ আমার হয়েছে?"

"—ছলনা করে অপরের ভালবাসার অভিনয় করাটা আমরা দোষ ও অন্যায় বলে জানি।"

লীলা সঙ্কোচে ও লজ্জায় মরিয়া গেল! সে বুঝিল—কিরণের সঙ্গে তাহার বিরোধ ঘুচিবার আর কোন আশা নাই! সে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে এমন দৃঢ় ধারণা করিয়া বসিয়া আছে, যে তাহাকে বুঝাইয়া যুক্তি দেখাইয়া, কিছুতেই তাহার মতে আনা যাইবে না। কেন আর তবে তাহার জন্য বৃথা কষ্ট করা! যে বিচ্ছেদ অনিবার্য্য, তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া আর উপায় কি আছে?

সে বলিল, "তুমি সেই প্রথম দিন থেকে একই কথা বোলছো, কিরণ! সব সময় মানুষের কেবল কাজ দেখে তাকে বিচার করা চলে না,—তার উদ্দেশ্য দেখেও তাকে অনেক সময় বিচার করা উচিত। এ কথা তোমাকে বোঝাতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি; কিন্তু তুমি বোঝা দূরে থাক্—আমাকে এ পর্য্যন্ত একটা কথা বলবারও অবসর দিলে না। যা হোক—আর এ সব কথা তোমাকে কোন দিন বল্‌তে যাব না। শুধু একটা কথা আমার তোমাকে বল্‌বার আছে। আমি জান্‌তে চাই—আমাদের এত দিনের বন্ধুত্বের কি তবে এই-খানেই শেষ?"

কিরণ সহসা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তার আগে—অর্থাৎ এ কথার উত্তর দেবার আগে—আমিও তোমার কাছ থেকে একটা কথা জান্‌তে

চাই। যে পথে তুমি চলেছ, এর শেষ ফল বা এর কোন প্রতীকার সম্বন্ধে কোন কিছু স্থির করেছ কি ?"

"—প্রতীকারের কথা ত শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রথম দিন থেকেই ভেবে রেখেছি। আর সে কথা কোন দিন তোমার কাছে গোপন করি নি ত কিরণ ? আমি এখন দেখ্‌ছি, বীণা কোন দিনই এ সম্বন্ধে মত বদ্‌লাবে না। তাই আমি স্থির করেছি, শীঘ্রই আমি অরুণের কাছে সব কথাই স্বীকার করবো। বীণার চিঠিখানা দিন দিন আমার জীবন যেন বিষময় করে তুল্‌ছে,—আর আমি এ লুকোচুরির মধ্যে থাকতে পার্চ্ছি না।"

"—তার পর ? সব শুনে সে যদি তোমায় ঘৃণা করে সরিয়ে দেয়, সেটা খুব চমৎকার ব্যাপার হবে ত ? আমি এ কথা শুনেই প্রথম যেদিন তাকে সব বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলুম, সেদিন আমার কথা শুন্‌লে ত এত জটিল কাণ্ড হতে পারত না ?"

—"এখানেই তুমি বরাবর ভুল বুঝছো কিরণ ! আমি বল্‌ছি, সে আমায় কখনো ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাকে ছাড়বার শক্তি তার নেই। বীণা এখন শুধু তার কাছে একটা নাম মাত্র। আমি বীণাই হই, বা লীলাই হই, তাতে তার কিছু যায় আসে না—সে শুধু আমাকেই চায় ! আমায় সে যথার্থ ভালবেসেছে ! আর সেই ভালবাসার জন্যই সে আমার সমস্ত দোষ, সমস্ত ত্রুটি হাসি মুখে মার্জ্জনা করবে। আমায় দূরে রাখ্‌তে সে কোন দিনই পারবে না।"

এ কথা যে কত সত্য, তাহা কিরণ যেমন মনে মনে অনুভব করিত, এমন আর কে করিবে ? কিন্তু লীলা জানিত না যে, এই চিন্তাই কিরণের সমস্ত জীবন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিরণ যে তাহাকে ভালবাসে, তাহাকে হারাইবার আশঙ্কাতেই সে যে এমন

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ সন্দেহ একবারও তাহার মনে উঠে নাই।

লীলার কথায় কিরণের মনের আগুন আবার জলিয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, কিছুক্ষণ সবলে নিজেকে সংযত করিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এটা ত তার দিকের কথা হলো। তোমার নিজের দিকের কথাটা কি?" সে লীলার উত্তর শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

—"আমার দিক জেনে আর তোমার কি হবে!"—লীলার চোখে জল আসিতেছিল। সে তাহা লুকাইবার জন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া একটা ফোয়ারার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ঠক্, মিথ্যাবাদী, স্বেচ্ছাচারী। আমি কিছু বল্লেই বা সে কথা তোমার বিশ্বাস হবে কেন?"—তাহার পাতলা লাল ঠোঁট দুটি মনের আবেগে কাঁপিতে লাগিল।

তখন একবার তাহার মুখের দিকে চাহিতেই কিরণের সমস্ত রাগ ও দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল। আবার আগের মত তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতে, তাহার চোখের জল সাদরে মুছাইয়া দিতে সে আকুল হইয়া উঠিল! তাহার লীলাকে কঠোর কথা বলিয়া তাহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিয়া সে তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে—আর সে এ ভাবে থাকিতে পারে না।

কোমল মৃদুকণ্ঠে—'লিলি' বলিয়া হাত বাড়াইতেই পাশে কাহার ছায়া পড়িল?

"খুব সরে পড়েছিলেন ত? আমি কত কত জায়গায়, কতক্ষণ থেকে যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি"—বলিয়া মিঃ সেন আসিয়া লীলার পাশে দাঁড়াইলেন।

কিরণের আর কথা বলা হইল না। সে সেনের দিকে একটা অগ্নিময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, তখনি সেখান হইতে সরিয়া গেল!

২৪

"উঠে আসুন মিস্ রায়! ওদিকে বাজি আরম্ভ হয়ে গেছে! সকলেই দেখ্তে গেছে। আপনাকে না দেখতে পেয়ে আমি তাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।"

মিঃ সেন লীলার সঙ্গে বারাণ্ডার অন্য প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীচে ময়দানে অগ্নিক্রীড়া হইতেছিল। নিমন্ত্রিতেরা সকলে জানালা, বারাণ্ডা বা ছাতের উপর হইতে বাজি দেখিতে-ছিলেন।

লীলা অতৃপ্তচিত্তে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মিঃ সেনের অজস্র গল্প, বাজির নানাবিধ আশ্চর্য্য ও মনোহর ক্রীড়া—সমবেত জনগণের আনন্দ, উৎসব কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কিরণের সঙ্গে অনিবার্য্য বিচ্ছেদের দুঃখ ও বেদনায় তাহার সমস্ত চিত্ত ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। যে পথে সে স্বেচ্ছায় চলিয়াছে, তাহার শেষ ফল—অরুণের সঙ্গে তাহার বিবাহ; আর তাহার ফলে কিরণের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ—তাহার নিজের এ মৃত্যুবাণ সে নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়াছে। আজ আর ইহাকে এড়াইয়া চলিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই। যত ক্ষতি, যত যন্ত্রণাই হোক্, ইহা তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে।

অগ্নিক্রীড়া শেষ হইল। মিঃ সেন তবুও লীলাকে ছাড়িয়া যাইবার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না। কিছুদিন হইতে লীলা তাহার

প্রতি মিঃ সেনের অতিরিক্ত মনোযোগ দেখিয়া উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সাধ্যমত তাঁহার সঙ্গ এড়াইয়া চলিত। বিশেষ আজিকার এই ব্যথিত-কাতর চিত্তে তাঁহার সঙ্গ ও আলাপের ঘটায় সে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মিঃ সেন লীলার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করেন নাই। তিনি আজ নিজের চিন্তা ও আশায় বিভোর। কথায় কথায় লীলার গান গাহিবার শক্তির কথা তুলিয়া তিনি সে সম্বন্ধে অজস্র চাটুবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন—"আমি মনে করি, এ বিষয়ে আপনার যে অতুল শক্তি আছে, আপনি তার কোন সদ্ব্যবহার করেন না—এটা কিন্তু বড় অন্যায়! চর্চ্চা না থাকলে ক্রমশঃ কণ্ঠের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

লীলা উত্তর না দিয়া শুধু হাসিল। কি কুক্ষণেই সে ক্লাবে গান গাহিয়াছিল! আর ত সেই একঘেয়ে কথা জনে জনের মুখে শোনা যায় না!

"আপনি হাসছেন! কিন্তু সত্যিই বল্‌ছি আমি—আপনার গান যে আমায় কি মুগ্ধ করেছে, তা আমি বলতে পারি না! আমার অবশ্য বলা উচিত নয়—কিন্তু না বলেও থাকতে পারছি না—আপনাকে যিনি বিবাহ করবেন, তিনি কি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ! মনে হলে সেই অজ্ঞাত লোকটির উপর আমার এত হিংসা হয়!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "আপনি ভুল করছেন! সে লোকটির উপর হিংসা না হয়ে আপনার করুণা হওয়া উচিত। আপনি জানেন না—আমি বড় জেদী ও একগুঁয়ে—সেইজন্য কারুর সঙ্গে আমার বনে না।"

মিঃ সেন মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটাইয়া লীলার দিকে চাহিলেন—"ঠাট্টা করছেন আপনি! আমি এ কথা কখনো বিশ্বাস করতে পারি

না!" মিঃ সেন একটু থামিলেন, একবার কাসিয়া—একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট মৃদুস্বরে বলিলেন, "বলতে সাহস হয় না মিস্ রায়! তবে যদি অভয় দেন—ত বলি—আমি যদি সে স্থান পাই, তবে সব দায়িত্ব নিতে রাজি আছি!"

লীলা নীরবে অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। সে কাহাকেও নিরাশ করিয়া বেদনা দিতে কষ্ট পাইত, কিন্তু দলশুদ্ধ সকলে যদি তাহাকেই বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে সেই-বা কি করিবে?

তাহাকে নীরব দেখিয়া মিঃ সেন আবার বলিলেন, "আমার কথাটা ভেবে দেখবেন—মিস্ রায়! আমি আপনাকে স্ত্রীরূপে পেলে নিজেকে ধন্য বলে জান্‌বো! আমি যে কত ভালবাসি আপনাকে—সে কি করে জানাবো। আপনার কথা ছাড়া আর কিছু আমি আজকাল ভাব্‌তে ভুলে গেছি! যখন কোর্টে থাকি—খালি আপনার মুখই আমার মনে জাগতে থাকে—রায় লিখতে গিয়ে কত দিন আসামীর নাম—আপনার কথাই ভুলে লিখে ফেলি—"

"সেই সব ক্রিমিন্যাল আসামীর বদলে!" লীলা বিরক্তির তীব্র হাসির মধ্যে কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিল!

"আপনি অবশেষে আমার সঙ্গে ঠাট্টা আরম্ভ করলেন?" মিঃ সেন নিরাশভাবে লীলার মুখের দিকে চাহিলেন—"নিজের বিষয় বলবার মত আমার কিছু নেই মিস্ রায়! শুধু আমার মনের একাগ্র ভালবাসার কথাই আপনার কাছে নিবেদন করছি আমি,—মানুষ নিজে যেমন তুচ্ছই হোক্ না কেন—তার অন্তরের একনিষ্ঠ পবিত্র প্রেম—সে ত উপেক্ষার বস্তু নয়! যে দিন থেকে আমি আপনাকে এ ভাবে দেখেছি,—সেদিন থেকে আমার—"

সেনের উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল! বীণা সে সময় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল! তাহার সঙ্গে—চৌধুরী!

"মিঃ সেন! আপনি ততক্ষণ একটু মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করবেন? লীলার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে!" বীণা কথাটা বলিয়া মধুর হাসিয়া সেনের দিকে চাহিল।

সেন সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্। তাঁহার নিকট হইতে মুক্তির আশায় লীলা এতক্ষণ করুণনেত্রে এদিক ওদিক চাহিতেছিল, বীণার কথা শুনিয়া সেনের উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সে তখনি উঠিয়া পড়িল।

বীণা লীলাকে একটু অন্তরে আনিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে চুপি চুপি বলিল,—"কিরণ কোথায়? তাকে দেখতে পাচ্ছি না যে? এই ত খানিক আগে দেখেছি—সে তোমার কাছেই ছিল?"

বীণার হিংসাপূর্ণ মুখ দেখিয়া লীলার হাসি আসিতেছিল—তবু সে গম্ভীর মুখে বলিল—"হয় ত ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে থাকবে—ছেলেমানুষ।"

"ঠাট্টা করো না লিলি! সব সময় তোমার ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না!" বীণা রাগিয়া বলিল—"কোথায় গেল সে—বলতে হবে তোমায়। আর তোমারি বা কি আক্কেল? তুমি এতক্ষণ ধরে তার কাছে একলা বসে কি এত গল্প কচ্ছিলে? এ সব নির্লজ্জ ব্যবহার দেখলেই ত লোকে পাঁচ কথা বলতে পারে! একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার?"

"সে নিজেই এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল,"—লীলা বীণাকে আরও জ্বালাইবার জন্য বলিল,—"আমি মিঃ দত্তের সঙ্গে সেতার শুনছিলুম, সে এসে আমায় ডেকে বারাণ্ডায় নিয়ে এল, বল্লে, চল—

একটু গল্প করা যাক্। তার পর থেকে ত কতক্ষণ এই খানেই ছিল। বাজি আরম্ভ হলে সেন আমায় বাজি দেখাতে এদিকে নিয়ে এলেন,—সেই সময় সে যে কোন্ দিকে গেল, তা আমি দেখি নি।"

বীণা অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল, বলিল, "তার সঙ্গে আমার কথা ছিল—আজ সমস্তক্ষণই সে আমার কাছে থাকবে, ছিলও সে বরাবর! খাবার সময় গোলমালে ও ভিড়ের মধ্যে সে যে কোন্ দিকে গেল—বুঝতে পারি নি! তার পরই দেখি তোমার সঙ্গে জুটেছে সে! কি যে তোমাদের এত কথা, তা তো কিছু বুঝতে পারি না!"

লীলা আর কিছু বলিল না। চারিদিকের গোলমাল ও নানা উত্তেজনায় তাহার শরীর কেমন অবসন্ন বোধ হইতেছিল। বীণা অত্যন্ত বিরক্তিভরে কিরণের সন্ধানে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছিল।

হলের ভিতর একদিকে লীলা ও বীণার বন্ধুর দল জটলা করিতেছিল। অমিয়া বলিল, "আজকাল মিলিকে কোনখানে দেখতে পাই না কেন—বল দেখি? ক্লাবে যাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছে এক রকম, তা ছাড়া কোন পার্টি কি সভা-সমিতিতেও যেতে দেখি না—হল কি ওর?"

মিস্ বেলা এতক্ষণ দেওয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ মুকুরে নিজের পরিপুষ্ট সুন্দর মুখখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তিনি এখন মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তার কিছু হয় নি—মিঃ ঘোষের শরীর আজকাল ভাল থাকে না—তাই আসতে পারে না। সেদিন ওদের নূতন বাগান বাড়ীতে যে পার্টি দিলে মিলি—তাতে মিঃ ঘোষকে দেখলে না? কি রকম বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে!"

নীলিমা বলিল, "তা যাই বল ভাই! মিলির বরাত ভালো!

মিঃ ঘোষের অবর্ত্তমানে তাঁর অত বড় সম্পত্তি—সবই ত মিলির—পাঁচটা ভাই-বোন নেই—যে ভাগাভাগি হবে। মা-বাপের এক সন্তান যারা—তাদের জীবনটা বড় সুখের হয়—নয় কি ?”

রেবা দলের মধ্যে কিছু গম্ভীর ও চিন্তাশীল। সে বলিল, “টাকা থাক্‌লেই যে জীবনটা সুখের হবে, এ কথা তোকে কে বলেছে ? অজস্র টাকার উপর বসে আছে, টাকার বিনিময়ে যত রকম বিলাস-ভোগ আছে, সবই সহজে উপভোগ কচ্ছে—এ রকম লোককে বাইরে থেকে খুব সুখী বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু সন্ধান করলে দেখ্‌তে পাবে, হয় ত তার মত দুঃখী জগতে খুব কমই আছে। বাস্তবিক সুখ জিনিষটা সংসারে এমন জটিল—”

অমিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, “রক্ষে কর্ ভাই রেবা—সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে, তোর দার্শনিক বক্তৃতা অনেক হজম করেছি নির্ব্বিবাদে,—কিন্তু আজ এ জায়গায় ওটা সুরু করলে বড় অবিচার করা হবে ! পার্টিতে এসেছিস্—দু-দণ্ড আমোদ কর, হাসি-গান-গল্পর মধ্যে সময়টা স্ফূর্ত্তিতে কেটে যাক্—তা—না—এখানেও মুখ গম্ভীর করে ওই সব বুলি আওড়াতে আরম্ভ করলে সব আমোদ-আহ্লাদ মাটি হয়ে যাবে !”

রেবা এ সমস্ত ক্ষণস্থায়ী চাপল্য ও অসার আমোদের বিরুদ্ধে আবার কথা বলিতে উদ্যত হইতেই বেলা বাধা দিয়া বলিল, কি সব বাজে কথা নিয়ে তোরা বকে মরতে লাগলি ? ও সব কথা ছেড়ে দে ! বীণা লীলা—এদের কারুকে দেখতে পাচ্ছি না—এরা এখনো আসে নি না কি ? বীণা না থাকলে পার্টিটা জমেই না মোটে—

অরুণা সেনের সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল। বীণা আসিবার পর

হইতে সে খ্যাতি প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। সেই জন্য অরুণা বীণার রূপের প্রশংসা শুনিলে ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরিত। বেলার কথা শুনিয়া সে রাগিয়া বলিল, "তোদের ঐ সব কথা শুনলে আমার হাড়ে জ্বালা ধরে; বীণা না থাকলে পার্টিই জমে না, কেন বীণা ছাড়া আর কি সমাজে কোন মেয়ে নেই? ওই করে করে তোরা তাকে এমনি বাড়িয়ে তুলেছিস্—যে তার আর গর্ব্বে মাটিতে পা পড়ে না। আর এখানকার পুরুষেরাও তেমনি জুটেছে! তাদেরো আর কোথা[illegible]ন নেই—কেবল বীণা—আর বীণা—"

নীলিমা বলিল, "তা ভাই যা বলেছিস—সত্যি! বীণা ও-বেচারাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে—এখন নাকে দড়ি দিয়ে ওদের নিজের খেয়ালে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়, আর মজা দেখে। এই ত একটু আগে দেখে এলাম, কিরণ চৌধুরীর হাত ধরে বাগানে বেড়াচ্ছে! তাই কি সহজ ভদ্রভাবে? সে হাব-ভাব, সে কথা বলার ভঙ্গী, হা[illegible] যদি দেখতিস্ তোরা—আমাদের ত কেটে ফেল্লেও ও সব ঢং করতে [illegible]ারবো না—ছিঃ! কি ঘেন্না!"

নীলিমা ঘৃণা ও লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইতেই অরুণা বলিয়া উঠিল, "তা কিরণের সঙ্গে আর ও-সব কিছু খাটবে না বীণার! সে তো আর সবাইয়ের মত জানোয়ার নয়? তার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান অত সহজ কথা নয়!"

তরুণীর দল যখন বীণার নির্লজ্জতা ও পুরুষদের অন্ধ স্তাবকতার আলোচনায় ব্যস্ত—প্রবীণা গৃহিণীদের মধ্যে তখন মিসেস্ সেন তাঁহার বন্ধুমহলে চুপি চুপি বলিতেছিলেন—"জজগিন্নীর দিকে একবার চোখটা ফেরাও দিদি—চক্ষু সার্থক হয়ে যাবে! বলি বয়সটা ত কিছু কম হয় নি—অত বড় বড় দুই ধুগ্যি মেয়ে সঙ্গে! তবু সাজ-সজ্জার

ঘটাখানা দেখ! মাগো! আমাদের ত দেখ্‌লে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়!"

মিসেস্ তরফদার একবার হলের বাহিরে চক্ষু ফিরাইয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওমা! তাই ত! বুড়ো বয়সে এত সাজ! লোকে কথায় বলে—যে বয়সের যা—তাতেই ভাল দেখায়! এ বয়সে এত বাহার দিতে লজ্জা হয় না? বলি—ওঁর ঘরে যে হীরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি—এ কথা আর কে না জানে? তা আর লোককে এত দেখাবার কি দরকার বাবু?"

মিসেস্ রায় বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া মিসেস্ পালিত বলিলেন, "তা এ যে তোমার অন্যায় কথা অবলা! যার ঘরে হীরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি—যার প্রাণে সাধ-আহ্লাদ আছে, সে পরবে না কোন্ দুঃখে? আর যাই বল,—সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়,—এ সহরে রূপে বল, ধন-ঐশ্বর্য্যে বল, আর শিক্ষা-সভ্যতাতেই বল—ওদের পরিবারের মত আর ক'টা আছে, বল ত?"

মিসেস্ তরফদার এ প্রতিবাদে একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আরে রাখ রাখ—ওদের শিক্ষা-সভ্যতার ছায়াও যেন আর কোন পরিবারে না লাগে। আমি ওদের না জানি কি? আমার না কি চর্চ্চা করা স্বভাব নয়, তাই; না হলে যে-সব কথা আমি ওদের বিষয়ে শুনি—সে শুনলে লোকে কানে হাত দেবে! আমি কোন কথা বলি না, তাই—"

এবার আর কাহারও ধৈর্য্য রহিল না! সহরের একটা পদস্থ ও সম্মানিত পরিবারের সম্বন্ধে কি কুৎসা ও রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা জানিবার জন্য উপস্থিত মহিলাবৃন্দ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

তখন মিসেস্ তরফদার গম্ভীর মুখে বলিলেন, "এই জজ সাহেবের মেয়েদের কথা বলছিলুম। তোমরা ত বীণার সম্বন্ধে সব সময় নিজের চোখে দেখছো,—পুরুষদের সঙ্গে ও কি নির্লজ্জ ভাবে মিশে চলিয়ে বেড়ায়! তার পর এই অরুণের সঙ্গে ধর কি কেলেঙ্কারিটাই ওরা মায়ে-ঝিয়ে করলে, তাও তো সবাই দেখলে—যত দিন তার সময় ভাল ছিল, তত দিন আদর-যত্ন সবই ছিল। যেদিন দুঃসময় এলো—ব্যস্! যাও বাবা! নিজের পথ দেখ। কিন্তু এ সবও তো পদে আছে। আবার ছোট মেয়েটি আজ দিন কতক ধরে যা কেচ্ছা সুরু করেছেন, সে যদি শোন,—ঐ যে কিরণ—বসন্তপুরের জমীদার—ও ছোকরা ত বিয়ে করে নি—বাড়ীতে শুধু লোক-জন আর নিজে থাকে। সেখানে রোজ রোজ ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে সকাল থেকে আর বেলা এগারটা পর্য্যন্ত লীলার আড্ডা দেওয়া কেন বল ত? তার বাড়ীতে কি পাঁচটা মেয়েছেলে আছে—যে তোর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তুই আলাপ করতে যাস্? সমাজের বুকের উপর বসে এই সব যথেচ্ছাচার চল্‌ছে! জজ সাহেবের মেয়ে বলেই কি সব অনাচার সইতে হবে? কেন, আমাদের ঘরেও পাঁচটা মেয়ে রয়েছে, আমাদের কি উচিত—ঐ সব মেয়েদের দৃষ্টান্ত নিজেদের মেয়েদের দেখান, ওদের সঙ্গে মিশ্‌তে দেওয়া? তোমরা নিজেরাই কথাটা বুঝে দেখ না?"

কথাটা শুনিয়া উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রথমটা কিছুক্ষণ লজ্জা ও ঘৃণায় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তাহার পরই চারিদিক হইতে একটা চাপা স্বরে নানা প্রশ্ন ও মন্তব্যের বর্ষা নামিল "ওমা! সত্যি না কি?" "কি ঘেন্না! গলায় দড়ি!" "তখনি জানি—ও যা না পাহাড়ে মেয়ে—একটা না একটা কিছু অঘটন ঘটাবেই!"

"বলি—মা-বাপে কি চোখে ঠুলি দিয়ে দিন রাত বসে আছে! ওই সব থুবড়ো মেয়েরা কোথায় কি ধিঙ্গীগিরি করে বেড়াচ্ছে, তা কি একবার চোখ তুলে দেখে না?"

"হুঁ! ওরা আবার দেখবে!" মিসেস্ তরফদার বিজয়-গর্ব্বে একবার মিসেস্ পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওদের মতে এতে দেখাদেখি কি আছে আবার? ওর মা তো বীণার মত মেয়ের রূপে-গুণে একেবারে গরবে আত্মহারা! ওরা জানে, এ ত মেয়েদের বাহাদুরি! দেখি—ভাবি—তুমি—আমি—যাদের অত শিক্ষা-দীক্ষা নেই,—অত সভ্যতার জ্ঞান নেই—তারাই—"

"সে যা হোক্—এ সব কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে এর একটা প্রতিকার করা উচিত!" মিসেস্ সেন তাঁহার বিপুল দেহভার কষ্টে তুলিয়া চেয়ারের উপর উত্তেজিতভাবে সোজা হইয়া বসিলেন—"জজ সাহেবের মেয়ে বলেই যে সমাজে যা খুসি তাই করবে, এ আধিপত্য আমরা কখনো সহ্য করবো না—তা দিদি! তুমি কথাটা জানলে কি করে?"

"জানবার ভাবনা কি?" মিসেস্ তরফদার সদর্পে বলিলেন, "যে নিজের চোখে প্রতিদিন দেখছে, শুনছে, তারই কাছ থেকে আমার শোনা। দরকার হয়, সকলের মুখের উপর তাকে দাঁড় করিয়ে ভজিয়ে দেবো। আমার কিছু এ বানিয়ে বলাও নয়, আর গল্প শুনে বলাও নয়। কিরণের সর্দ্দার বেহারা—আমার বেহারার ভাই হয়—তারি কাছ থেকে এ কথা আমি শুনেছি! কই! নিরু-দি যে আর কোন কথা বোলছো না?"

মিসেস্ পালিত একটা কথা বলিয়া ফেলিয়া এতক্ষণ অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত ভাবে মিসেস্ তরফদারের দর্পিত দৃষ্টির সম্মুখে

অপরাধীর মত বসিয়া ছিলেন। এ ভাবে সম্বোধিত হইয়া তিনি উত্তর দিবার জন্য মুখ তুলিতেই, মিসেস্ রায় ধীরে ধীরে রাজরাণীর মত পদোচিত গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সহিত হলের ভিতর প্রবেশ করিলেন!

সেই মুহূর্ত্তে সেই মহিলা-সভার সমস্ত উত্তেজনা, বিরক্তি, চর্চ্চা—সবই আশ্চর্য্যরূপে অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, মিসেস্ সেন হাসিমুখে মিসেস্ রায়কে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "এই যে, কমলা দি! এসো! এতক্ষণ তাই আমি এঁদের বলছিলুম—বলি, সবাইকে দেখছি, কমলা-দিকে দেখছি না কেন? তা এত দেরি হলো যে?"

মিসেস্ তরফদার নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যাই বলুন—আপনি না থাকলে আমাদের সভাটা যেন কেমন খালি খালি বোধ হয়, যেন কিছুতে জমাট বাঁধে না! বীণা, লীলা এরা সব কোথায়? এসেছে ত?"

নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পালা সাঙ্গ করিয়া মিসেস্ রায় ঈষৎ হাসিয়া মিসেস্ সেনের কথার উত্তরে বলিলেন, "এসেছি আমি অনেকক্ষণ! মিসেস্ দত্তর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলতে দেরি হয়ে গেল। বীণা, লীলা সবাই এসেছে,—তারা বোধ হয়, বাগানের দিকে বেড়াতে গেছে! মিসেস্ দত্ত আজ তাঁর ভাইপোর সঙ্গে আলাপ করে দিলেন কি না, দিব্যি ছেলেটি! ওরা বাংলার মস্ত জমিদার! রাজা উপাধি, তা ছেলেটিকে দেখলেই বোঝা যায়—বনেদী ঘরের ছেলে বটে! যেমন চেহারা, তেমনি ভদ্র। চমৎকার কথাবার্ত্তা। তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?"

"কই না! মিসেস্ দত্ত ত হলের মধ্যে একবারও আসেন নি এখনো!"

মিসেস্ তরফদার বলিলেন, "তাঁর ভাই পো এখানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি ? তা কোথায় গেলেন তাঁরা ?"

বারাণ্ডার শেষ প্রান্তে লীলা অবসন্নের মত নিঝুমভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। হলের বাজনা তখন থামিয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে অনেকে তখন বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। বীণা তাহার পাশে দাঁড়াইয়া বিরক্তিভরে বলিতেছিল—"আমার আজকার প্ল্যানটা মাটি করে সব আমোদটাই নষ্ট করলে কিরণ! কথা ছিল খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বাগানে আমায় নিয়ে বেড়াবে,—তা, না, এখন নিজেরই দেখা নেই। শেষকালে নেহাত ঐ চৌধুরীটার সঙ্গেই যেতে হবে দেখছি ?"

২৫

সুরভি পুষ্পসারের তীব্র সৌরভে সহসা সে স্থানের বাতাস আমোদিত হইয়া উঠিল। মিসেস্ দত্তের পরিচিত কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া লীলা ও বীণা ফিরিয়া চাহিল। মিসেস্ দত্তের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—কুমার গুণেন্দ্রভূষণ !

"ওমা ! এই যে লীলা-বীণা ! তোমরা এখানে ? তোমার মা বল্লেন, তোমরা বাগানে বেড়াতে গিয়েছ ! এসো গুণেন্দ্র ! এদের সঙ্গে তোমার আলাপ করে দি।" মিসেস্ দত্ত আগাইয়া আসিয়া লীলার হাত ধরিয়া বলিলেন—"মিসেস্ রায়ের ছোট মেয়ে লীলা, আর এইটি বড় বীণা। এটি আমার ভাইপো—বীণা, সেই যে যার কথা তোমাদের বলেছিলুম—"

কুমার গুণেন্দ্রভূষণ অত্যন্ত বিনম্রভাবে দুই পদ অগ্রসর হইয়া লীলাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন। পর মুহূর্ত্তে বীণার দিকে চাহিতেই তাহার সেই প্রখর উজ্জ্বল রূপে সহসা যেন তাঁহার নয়ন ঝল্সাইয়া গেল !

নমস্কার করিতে ভুলিয়া গিয়া তিনি এক মুহূর্ত্ত অপলক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

লীলা ও বীণা দেখিল—কুমার চমৎকার সুপুরুষ। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর—সুগঠিত দীর্ঘ আকৃতি। পরিচ্ছদ—সূক্ষ্ম, রমণীয় ও সুরুচি-সঙ্গত। দুই হস্তের অঙ্গুলীতে হীরক অঙ্গুরীয়ের তারকাদীপ্তি।

মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া কুমার বীণাকে নমস্কার করিয়া অত্যন্ত নম্রভাবে বলিলেন, "পিসীমার কাছে আপনাদের দুজনের কথা এতবার এবং এত বিশদভাবে শুনেছি যে, এখন আর আপনাদেব সঙ্গে নূতন পরিচয় বলে মোটে মনে হচ্ছে না—"

কুমারের সেই ক্ষণকালের স্তব্ধ ও মুগ্ধ দৃষ্টির অর্থ বীণার বুঝিতে বাকি ছিল না। তাহার অন্তরের সমস্ত বিরক্তি সেই মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। নবীন উল্লাসে ও আবেশে তাহার চক্ষু দুটি মনোহর জ্যোতিতে জ্বলিয়া উঠিল। সে মধুর হাসিয়া একবার মিসেস্ দত্তের দিকে চাহিয়া বলিল, "মাসিমা ছোটবেলা থেকেই আমাদের এত ভালবাসেন, আমাদের কথা সর্ব্ব সময়েই ওঁর মুখে লেগে আছে। তবে আমাদের সম্বন্ধে ওঁর সমস্ত কথা যেন নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করবেন না; কারণ, স্নেহের আধিক্যে অনেক সময় ওঁর মাত্রা ঠিক থাকে না।"

'হাঁ গো মেয়ে! তাইত!' মিসেস্ দত্ত একটু প্রীতির হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের কথা আমি সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলি—নয়? আহা! কমলার সঙ্গে আমার ভাব কি আজকের? সেই ছোট বেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে খেলেছি, একসঙ্গে খেয়েছি, একসঙ্গে ঘুমিয়েছি। তার পর বিয়ে হতেই দুজনে কে কোথায় একেবারে কতকালের ছাড়াছাড়ি। শেষ কত জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আবার

এখানে এসে দেখা হলো। সেই কমলার মেয়ে তোমরা—আমার কত আদরের—"

বীণা মিসেস্ দত্তের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিল, "চল মাসিমা! হলের ভিতর গিয়ে বস্‌বে চল! এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? অনেক রাত হয়ে গেছে।"

মাসিমার উদ্দেশে বলা হইলেও বীণা কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা বলিল।

সকলে হলের দিকে অগ্রসর হইলেন। লীলা নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিল। হলের ভিতর অত লোকের মধ্যে ও আলোর উত্তাপে তাহার যাইতে ইচ্ছা ছিল না। সকলের পশ্চাতে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে তাহার কাঁধের উপর কাহার হাত পড়িল।

লীলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, কিরণ তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে!

"তোমায় বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে লীলা! এস, আমার সঙ্গে বাইরের ফাঁকা হাওয়ায় বস্‌বে চল।"

কিরণের এই সহজ ও স্নেহপূর্ণ কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মত লীলা নীরবে তাহার অনুসরণ করিল।

পাশের একটি ছোট ঘরে গিয়া কিরণ এক গ্লাস সোডায় বরফ মিশাইয়া লীলার হাতে দিল। টেবিলের উপর ছোট ছোট প্লেটে মিষ্টান্ন সাজান ছিল—সে একখানা প্লেট লীলার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "একটু কিছু খাও! তোমার মুখ এমন শুকিয়ে গেছে! এ ভাবে থাকলে অসুখ করবে।"

এ আদর-যত্ন প্রত্যাখ্যান করিবার মত শক্তি লীলার ছিল না।

সে সত্যই তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রান্ত হইয়াছিল। নীরবে গ্লাসটি শেষ করিয়া সে বলিল, "তুমি কিছু খেলে না, কিরণ?"

"আমার ত কিছু দরকার নেই—আমি বেশ আছি। এসো—হাওয়ায় একটু বস্‌বে।"

বারাণ্ডায় দুইখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দুইজনে বসিল। কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না।

লীলার হৃদয়ে একটা বেদনাময় সুখের হিল্লোল উঠিতেছিল। এখনো—এখনো—কিরণ তাহাকে কত ভালবাসে! সে তাহার অন্যায় ব্যবহারে রাগ করিয়াছে, সে তাহার নিকট হইতে অভিমান করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু—তবু তো সে তাহার প্রতি পূর্ব্বের সে স্নেহ হারায় নাই! দূরে থাকিলেও সে এখনো ত আগের মতই তাহার দিকেই দৃষ্টি সজাগ করিয়া রাখিয়াছে—তাহাকে ক্লান্ত দেখিয়া সে তাহার রাগ অভিমান সব ভুলিয়া তাহার কাছে আসিয়াছে,—সেই অতীত দিনের মতই তাহাকে খাওয়াইয়া বাতাস করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিয়াছে! লীলা শত দোষ করিলেও কিরণ এখনো তাহার সেই প্রিয়তম বন্ধু!

লীলার ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা নিঃশব্দে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিরণের প্রীতি, তাহার সে অফুরন্ত ভালবাসা পাইয়া হারানো—কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট! আর কি কোন দিনই তাহাদের মধ্যে এ ব্যবধানটুকু ঘুচিয়া পূর্ব্বের সেই সহজ সরল জীবন ফিরিয়া আসিবে না?

লীলা একবার কিরণের স্তব্ধ গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কত নিকটে—তবু—যেন সে আজ লীলার নিকট হইতে কোন্ সুদূরে চলিয়া গিয়াছে!

কিরণ নীচে বাগানের দিকে চাহিয়া জ্যোৎস্নার আলোয় কোমল

তরু-পল্লব ও কিশলয়দলের নৃত্য দেখিতেছিল। আজ তাহার মন এত অন্যমনস্ক—সে যে কখন. কি করিতেছে; কিই বা সে বলিতে বা করিতে চায়,—তাহা কিছুই স্থিরচিত্তে ভাবিতে পারিতেছিল না। তাহার হৃদয় আজ একান্ত ভাবে লীলার দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু যে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাকে আজ তাহার বলিবারই বা কি আছে? মনের ভিতর এত দিনের রুদ্ধ অনুরাগ প্রবল আবেগে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিতেছিল। সে প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল।

সহসা এক সময় কিরণ তাহার স্বপ্ন হইতে জাগিয়া লীলার দিকে চাহিল। লীলার তরুণ মুখে ক্লান্তি ও বেদনার ছায়া। তাহার বড় বড় কালো চোখ দুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। এলোমেলো চুলের গোছা চোখে মুখে কপালের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার ম্লান বিষণ্ণ মূর্ত্তিকেও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

কিরণ একবার তাহার দিকে চাহিয়াই চকিত হইয়া উঠিল। "এ কি! তুমি কাঁদছো?" সে তখনি লীলার পাশে চৌকি টানিয়া আনিয়া লীলার হাত চাপিয়া সস্নেহে বলিল, "কি হয়েছে লিলি? কাঁদ্‌ছো কেন?"

লীলা এই স্নেহের স্পর্শটুকুর জন্য কতদিন হইতে তৃষিত হইয়া ছিল। আর সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না! সে হঠাৎ কিরণের দুই হাত ধরিয়া, গভীর আবেগে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বালিকার মত কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ সব ভুলিয়া একেবারে অস্থির ও বিব্রত হইয়া উঠিল। সে তাহার রুমাল দিয়া পূর্ব্বের মত স্নেহে ও আদরে তাহার চোখের জল

মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "ছি! এমন করে কেঁদো না! চুপ কর! এখনি মাথা ধরে উঠ্‌বে যে! কি হয়েছে বল আমায়—বল্‌বে না?"

"আমি তোমার কথা শুনবো! কিন্তু তার আগে একটা কথা—শুধু একটা কথা তুমি আমায় বলে যাও—বল একবার—আমায় মাপ করলে? তুমি জান না, তুমি রাগ করে আছ বলে আমি মরে যাচ্ছি!" আবার তাহার চোখের জল অসংবরণীয় হইয়া উঠিল।

কিরণ এ কথা শুনিয়া একবার গভীর দৃষ্টিতে লীলার অশ্রুপ্লাবিত কাতর মুখের দিকে চাহিল। লীলার অন্তরের প্রচ্ছন্ন ছবি সে যেন চোখের সাম্‌নে পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাইল। তাহার হৃদয়ের সমস্ত অভিমান ও রাগ সেই মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া গেল। সে তখন নিজেকে ভুলিয়া বলিয়া ফেলিল, "এই জন্যে এত কান্না? সে ত অনেক দিন আগেই করেছি লিলি! তোমায় মাপ না করে আমি নিজে থাকতে পারি কখনো?"

"বাঁচলুম! আমার বুকের ভার নেমে গেল! আমি সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও তোমার বন্ধুত্ব হারাতে চাই না! তা হলে আর আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে না তো কিরণ?"

লীলার মুখে সুখের, লজ্জার হাসি, চোখে জল;—কিরণ কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "পাগল আর কি! তুমি কি জান না—লিলি? তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে আমারি বা জীবনে কি সুখ আছে?" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিরণ তখনি আবার সাম্‌লাইয়া লইল। সে এ কি করিতেছে! তাহার একমাত্র বন্ধু লীলাকে যে কথা বলা যাইত, অরুণের বাগ্‌দত্তা লীলাকে তো তাহা বলা চলে না!

লীলার সর্ব্বশরীর প্রবল শীতের তাড়নায় কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

তাহার শুষ্ক মুখ ও রক্তিম চোখের দিকে চাহিয়া কিরণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল, "তোমাকে বড় খারাপ দেখাচ্ছে লিলি! তুমি কি কিছু অসুখ বোধ করছো? চোখ-মুখ বসে গেছে যে একেবারে!"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না! কেবল সমস্ত শরীরে বড্ড কাঁপুনি ধরছে! বোধ হয় আমার অত্যন্ত ঠাণ্ডা লেগে গেছে।"

কিরণ তাহার কপালে হাত রাখিয়া দেখিল, অত্যন্ত উত্তাপ। সে বলিল, "তোমাব জ্বর এসেছে লিলি! এখন এখানে থাকলে তোমার অসুখ আরো বাড়তে পারে। আমি যাই, মিসেস্ রায়কে বলিগে—তোমার এখনি বাড়ী যাওয়া দরকার।"

"না—না—মাকে চাই না আমার! তাঁকে আর বীণাকে জানো ত তুমি? তাঁরা এখানকার শেষ আমোদটুকু পর্য্যন্ত উপভোগ না করে নড়বেন না! কারুকে চাই না—আমার—শুধু তুমি—তুমি আমার কাছে থাক! তা হইলেই ভাল থাকবো আমি! তুমি এখন চলে যাবে না ত?"

"কি পাগল তুমি লিলি? তোমাকে এখানে এই অবস্থায় ফেলে বাড়ী যাব আমি? কিন্তু তোমার যে এখন একটু গরমে থাকা দরকার! আমার বড় ভয় হচ্ছে তোমার জন্যে!"

কিরণ এদিক ওদিক চাহিয়া একটা ছোট শয়ন-কক্ষ দেখিতে পাইল। তখন সে জোর করিয়া লীলাকে খোলা বারাণ্ডা হইতে সেই ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। নিজের গায়ের শাল খুলিয়া তাহাকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিয়া বলিল, "এইবার তুমি চুপ করে শুয়ে একটু ঘুমোও দেখি। এখন উঠ্‌লেই আবার তোমার ঠাণ্ডা লাগ্‌বে! আমি একবার মিসেস্ রায়কে তোমার খবরটা দিয়ে আসি।"

সে উঠিবার চেষ্টা করিতেই লীলা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "না—কিরণ! তুমি এইখানে বোসো—আমায় একলা ফেলে তুমি উঠে যেও না।"

সর্ব্ব শরীরে একটা অসহ্য উত্তাপ ও অবসাদে তাহাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছিল। ক্রমে প্রবল জ্বরে তাঁহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়া গেল। সে মাঝে মাঝে জ্বরের ঘোরে অসংলগ্ন প্রলাপ বকিতে লাগিল। কিরণ তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সহসা এক সময় লীলা ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। একবার বিহ্বলভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে! তুমি রয়েছ! আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম, যেন চলে গেছ তুমি! মাথাটা যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! কি বলছি—বুঝতে পাচ্ছি না! বুকে যেন একটা ব্যথা মনে হচ্ছে—নিশ্বাস ফেল্‌তে পার্‌ছি না! কি হলো আমার—বল ত?"

কিরণ তাহাকে আবার বিছানায় শোয়াইয়া দিল; বলিল, "একটু ঘুমিয়ে পড় ত! ঠাণ্ডা লেগে তোমার জ্বর হয়েছে বলে ও-রকম মনে হচ্ছে। ঘুম হলেই ও-সব সেরে যাবে।

"তুমি চলে যাবে না ত? বল—তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই। বুকে কেমন একটা ব্যথা মনে হচ্ছে, নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি না; আমায় ফেলে চলে যেও না কিরণ!"

"কোথায় যাব লিলি? তোমায় ফেলে কি আমি যেতে পারি? তুমি ঘুমোও—আমি এখানেই বসে আছি।"

"আর একটা কথা—শুধু একটা—এই কথাটা হলেই আমি ঘুমিয়ে পড়বো। তুমি বিশ্বাস কর কিরণ, আমি ইচ্ছে করে অরুণকে ঠকাতে

চাই নি—উদ্দেশ্য আমার যা ছিল—হঠাৎ অন্য রকম হয়ে গেল। আমি সত্যই প্রতারক, ঠক নই—কিরণ—এইটা শুধু তুমি—”

তীব্র বেদনা ও আত্মগ্লানিতে কিরণের মুখ কালি হইয়া গেল। সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, “মাপ করো লিলি! মাপ করো আমাকে! আমি যা বলেছি, সে সব ভুলে যাও। তুমি জান না—কি যন্ত্রণাই আমি পেয়েছি সেদিন! রাগে তখন যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলুম! না হলে তোমাকে এত বড় অন্যায় কথা বলতে পারি কখনো?”

লীলা আর কিছু বলিল না। শান্তি ও তৃপ্তির হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে কিরণের হাত ধরিয়া ছোট শিশুর মতই নির্ভরতার আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িল।

কিরণ নিজের মনের সুখ-শান্তি সব হারাইয়া, উদ্বিগ্ন চিত্তে লীলার অচৈতন্য মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। লীলার এই কঠিন রোগের অবস্থা ও তাহার কাতরতা দেখিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহার নির্ম্মম ব্যবহারে লীলা মর্ম্মে মর্ম্মে কি আঘাত পাইয়াছে! আজ এক মাস হইতে সে মনের ভিতর যে উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিতেছে, হয় ত বা তাহাই তাহার এই বিষম রোগের কারণ। নিজের প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঈর্ষার জ্বালার কথা ভাবিয়া কিরণ মর্ম্মাহত হৃদয়ে নিজেকে ধিক্কার দিতেছিল—সে নিজেই কি অবশেষে তাহার লীলার মৃত্যুর কারণ হইল!

কিন্তু সমস্ত উদ্বেগ ও ভাবনার মধ্যেও একটা অতি অস্পষ্ট—অতি সূক্ষ্ম আনন্দের তড়িৎরেখা যেন তাহার সর্ব্ব শরীরের ভিতর বহিয়া যাইতেছিল। আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে—লীলা একান্ত মনে তাহার নিজের অজ্ঞাতে তাহাকেই ভালবাসে। অরুণের প্রতি তাহার যে ভাব—যাহা সে নিজে ভালবাসা বলিয়া জানে, তাহা কেবল করুণা

ও সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যে তাহার হাত ধরিয়া একান্ত নির্ভর ও বিশ্বাসের উপরে নিশ্চিন্ত মনে লীলা ঘুমাইতেছে, এ বিশ্বস্ত ভাব—এ নির্ভর কি সে কিরণ ছাড়া আর কাহারও প্রতি করিতে পারিত? অচৈতন্য লীলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কিরণ সংশয় ও সুখের মধ্যে দোল খাইতে লাগিল।

২৬

অকস্মাৎ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অসিতকে দেখিয়া নির্ম্মলা অত্যন্ত চকিত ও বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন এত বাড়িয়া উঠিল—যেন তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে।

অসিত নিজেও কম আশ্চর্য্য হয় নাই। এখানে এমনভাবে নির্ম্মলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে, এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেও কিছুক্ষণ নির্ম্মলার স্তব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার বলিল, "আপনি হঠাৎ আমায় এখানে দেখে খুব অবাক্ হয়ে গেছেন দেখছি! তা—আমাদের দিন তো এই রকম পথে পথেই চিরকাল কেটে আসছে!" বলিয়া সে ঈষৎ হাসিল।

নির্ম্মলা তখনো প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই, তবু সে নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু আপনাকে বড় রোগা ও দুর্ব্বল বলে মনে হচ্ছে। এত দিন এখানে ছিলেন না বুঝি? আমরা আপনাদের সেই ঠিকানায় অনেকবার আপনাদের খোঁজ করেছিলুম।"

সেই লজ্জাকম্পিত মধুর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া অসিত কিছুক্ষণ নির্ম্মলার রক্তিম সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। বহু দিন

পূর্ব্বের এক প্রভাতের চিত্র ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছিল। সেদিনের সেই মধুর প্রভাত—চারিদিকে সোনার আলো,—আর সেই বিজন প্রান্তরে ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে নির্ম্মলার যন্ত্রণা-কাতর করুণ সুন্দর মুখ যেন তাহার বলিষ্ঠ সবল চিত্তে কোন মায়ালোকের স্বপ্নজাল বুনিতে লাগিল।

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "আপনার সেই বন্ধুটি? সেই যে সেদিন যাঁকে দেখেছিলুম, তিনি কোথায়? ভাল আছেন ত?"

এই প্রশ্নে অসিত তাহার জাগ্রত স্বপ্ন হইতে চমকিয়া সচেতন হইয়া উঠিল, বলিল, "ও, পরেশের কথা বলছেন? সে ভাল আছে। আমরা দুজনেই এখানে ছিলুম না ত! আপনাদের সঙ্গে যেদিন দেখা হয়, তার পরদিনই আমরা বিশেষ কাজে পাঞ্জাবে চলে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে তিন চার দিন আগে এসেছি। দানাপুরে একটা কাজ ছিল, সেটা সেরে আসতে আসতে পথে জ্বর হয়ে পড়ে, একটা ভাঙ্গা শিবমন্দিরে পড়ে থাকতে হয়েছিল। তার পরে আজ সকালে উঠে দেখি—সর্ব্ব প্রথম কিছু আহার্য্যের বন্দোবস্ত দরকার—না হলে শরীর আর বইছে না। এই বাড়ীটা সামনে দেখে তাই"—বলিয়া সে একটু হাসিয়া আবার বলিল—"অবশ্য আপনাকে যে এখানে দেখতে পাব, এ আশা কখনো করি নি—"

নির্ম্মলাকে কে যেন চাবুক মারিল! সে সহসা অসিতকে দেখিয়া এমন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল যে, বিহারী তাহাকে কি বলিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে, সে-কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে! লজ্জায় ও অনুতাপে সে মরমে মরিয়া গেল! বলিল, "দেখুন ত,—আমার কি অন্যায়—আপনার দুদিন খাওয়া হয় নি, আর আমি

কি না দাঁড়িয়ে গল্প করছি! আপনি একটু বসুন—আমি এখনি আসছি।"

সে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই অসিত বলিয়া উঠিল, "কিন্তু একটা কথা আগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে।"—"আমার বেশি দেরী হবে না—এখনি আসছি" বলিয়া সে অসিতকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া চঞ্চল চরণে বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দশ পরে এক থালা খাবার সাজাইয়া নির্ম্মলা ফিরিয়া আসিল। সে থালাখানি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া এক গ্লাস গরম দুধ অসিতের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, "এই দুধটা আগে খেয়ে ফেলুন! বেশ গরম আছে।"

অসিত একবার খাদ্যপূর্ণ থালাখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিল, পরে হাসিয়া বলিল, "আয়োজনটা মন্দ করেন নি, দেখছি। এতে আমার একটা দিন বেশ কেটে যেতে পারে। কিন্তু একটা কথা আছে—বাড়ীটা কার? আপনিই বা এখানে কোথা থেকে এলেন—কিছুই বুঝতে পারছি না ত?"

"এই কথার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এ বাড়ী আমাদেরই। আপনি খেতে বসুন। আমি উপর থেকে বাবাকে ডেকে আনছি।"

অসিতের মুখ এক মুহূর্ত্তে গুরুগম্ভীর হইয়া উঠিল! সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "এটা আপনাদের—অর্থাৎ মিঃ ঘোষের বাড়ী?"

নির্ম্মলা সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সে বলিল, "আপনি এত কি ভাবছেন? অন্য কারুর বাড়ীতে আপনাকে আমরা অভ্যর্থনা করছি না। এ বাগানবাড়ীটা বাবা কিছু দিন আগে কিনেছেন। সেদিন এইখানে আসতে গিয়েই ত—"

"তা হলে আমাকে মাপ করবেন। এখানে আমি আতিথ্য স্বীকার করতে অপারগ।" বলিয়া চৌকি ছাড়িয়া গম্ভীর মুখে অসিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলা বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কিসে যে কি হইয়া গেল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

অসিত আর কোন কথা না বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সে সত্যই চলিয়া যায় দেখিয়া, নির্ম্মলা আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"একটু দাঁড়ান, অসিত বাবু! চলে যাবেন না—আপনি যে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন! এই অসুস্থ শরীরে না খেয়ে আবার কোথায় যাচ্ছেন? একটু কিছু খেয়ে যান্।"

অসিত যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "অসম্ভব! আপনাদের এখানে আতিথ্য গ্রহণ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব! বৃথা আপনাকে কষ্ট দিলুম। মাপ করবেন!"

নির্ম্মলার উদ্যত হস্ত হইতে দুগ্ধপূর্ণ কাঁচের গ্লাস পড়িয়া গিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে চুরমার হইয়া গেল।

অসিত আর দাঁড়াইল না। একবার নির্ম্মলার রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—পরক্ষণে ঝড়ের মত গৃহ হইতে বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

২৭

লীলার পীড়া দিন-দিন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তিন চারি দিন পরে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ডবল নিউমোনিয়া—জীবনের আশা অতি অল্প, কি হয় বলা যায় না।

মিঃ রায়ের আনন্দময় ভবনে আতঙ্ক ও আসন্ন শোকের ছায়া দিন দিন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। লীলার জীবনের আশঙ্কায় সকলের চিত্তই

কাতর ও সন্ত্রস্ত, দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় মিসেস্ রায়ের দর্পিত ও উদ্ধত প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি লীলার ঘরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারিতেন না, নিজের ঘরেও শান্তি ছিল, না; ঘণ্টায়-ঘণ্টায় কেবল নর্সদের নিকট হইতে তাহার সংবাদ লইয়া অধীর ভাবে তাঁহার সময় কাটিত। বীণাও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে সর্ব্বক্ষণ তাহার তত্ত্বাবধান করিত।

বাড়ীর চাকর-দাসীরা তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত ও ম্রিয়মাণ; তাহারা তাহার বিপদ কাটিয়া যাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা ও নানা দেবস্থানে মানসিক করিয়া বেড়াইতেছিল।

ক্ষান্ত তাহার অতি-প্রিয় পরের চর্চ্চা, ও কলহ-বিবাদ ভুলিয়া দিন-রাত্রি লীলার বিছানার পাশে পড়িয়া থাকিত। নর্সেরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সে-ঘর হইতে বাহির করিতে পারিত না।

কিন্তু লীলার অসুখে যে সর্ব্বাপেক্ষা মনে আঘাত পাইয়াছিল, এবং যাহাকে সে সমস্ত গোপন করিয়া প্রতিদিনের মতই সহজ ভাবে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম বজায় রাখিয়া বেড়াইতে হইত, সে কিরণ!

সে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে বীণার নিকট হইতে লীলার সংবাদ জানিয়া যাইত। যে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় তাহার মন অশান্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, বাহ্যিক ভাবে তাহা কিছুই প্রকাশ পাইত না। বীণা নিশ্চয় মনে জানিত, লীলার অসুখের ছলে কিরণ তাহারই জন্য এ বাড়ীতে আসে।

অবশেষে এক দিন লীলার জীবনের সঙ্কট মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীতে সকলেই সেদিন কি একটা অতর্কিত আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন, —কখন কি হয়, কখন কি শুনিতে হয়, এইরূপ একটা ভীত-উৎকণ্ঠিত

ভাব। সকলে নিঃশব্দে চলা-ফেরা করিতেছে,—জোরে কথাটি কহিবারও সাহস কাহারও ছিল না।

কিরণ সেদিন সব ভুলিয়া সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অনাহারে একাসনে কাটাইয়া দিল। লীলার জীবনের কোন আশা ছিল না, তবু সে এ কথা কিছুতেই মনে আনিতে পারিতেছিল না। লীলার মৃত্যু! অসম্ভব! এ কথা ভাবিতে গেলে একটা তীব্র বেদনা তাহার অন্তরে ঝড়ের মত ঠেলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল।

সমস্ত দিন একই ভাবে কাটিল। দিন-ভোরের কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত যুদ্ধের পর রাত্রি নয়টার সময় ডাক্তারেরা প্রকাশ করিলেন—তাহার সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে; এ যাত্রা সে বাঁচিয়া যাইবে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষান্ত আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে কিরণকে সে সংবাদ দিয়া আসিল। কিরণকে সে বড় ভাল বাসিত।

নিঃশব্দে কিরণের নয়ন হইতেও বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। গভীর কৃতজ্ঞতায় ও পরিপূর্ণ শান্তিতে সে যুক্তকরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

* * * *

দীর্ঘ চল্লিশ দিনের পর লীলা প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিল। প্রথমে তাহার কিছুই মনে পড়িল না,—শুধু সে বিহ্বলের মত চাহিয়া নর্সদের অচেনা মুখ ও গৃহের সাজ-সজ্জা দেখিতেছিল। একবার সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "কিরণ!"

নিঃশব্দে নর্স আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল; কিরণ কে, তাহা সে জানে না; জানিলেও, ডাক্তারের বিশেষ নিষেধ, রোগীর ঘরে নর্স ছাড়া আর কেহ যাইতে পারিবে না। সে শুধু লীলাকে কথা বলিতে

নিষেধ করিয়া স্থির থাকিতে অনুরোধ করিল। লীলাও গভীর ক্লান্তিতে আবার তখনি ঘুমাইয়া পড়িল।

ইহার পর হইতে অর্দ্ধতন্দ্রাবস্থায় লীলা প্রায়ই দেখিত,—উৎসব-রজনীর সেই বিজন কক্ষ, মৃদু-স্তিমিত আলোক, তাহার রুগ্ন-শয্যার পাশে কিরণের সেই উদ্বেগ-কাতর স্থির-গম্ভীর মুখ! লীলার শত দোষ সত্ত্বেও তাহার প্রতি কিরণের কি প্রবল স্নেহ; তাহাকে একটু সুস্থ রাখিতে, একটু আরামে রাখিতে তাহার কি একাগ্র প্রয়াস!

ধীরে ধীরে লীলা যতই সুস্থ হইতে লাগিল, ততই তাহার মনে কিরণকে দেখিবার ইচ্ছা অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইত, যেন তাহাদের বিচ্ছেদের পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে! আর একজনের কথা মনে হইলে সে চঞ্চল হইয়া উঠিত। বেচারা অরুণ! সে হয় ত তাহার এ অসুখের কথা জানেও না। এত দিন তাহাকে না দেখিয়া সে হয় ত তাহাকে আর-সব মেয়েদের মতই চঞ্চল ও খামখেয়ালি ভাবিতেছে। সে না গেলে অরুণের যে সবই নষ্ট হইয়া যাইবে! সে ছাড়া আর কে তাহাকে জীবন্ত ও উৎফুল্ল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে!

অরুণের কথা মনে পড়িলেই লীলা ভাবনায় উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিত; সে নিজের মনে জোর করিয়া বলিত, "আমায় বাঁচতেই হবে; আমি কখনো মরবো না! যে কাজ আমি আরম্ভ করেছি, আমি না বাঁচলে সে কাজ শেষ করবে কে?" এই ইচ্ছার প্রাবল্য ও মনের শক্তি তাহার দুর্ব্বল রুগ্ন শরীরে তড়িতের মত শক্তি সঞ্চার করিত, দিন দিন তাহার উন্নতি দ্রুততর হইতে লাগিল।

লীলার পীড়ার সময় আর এক জন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করা মিঃ রায়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি এই ঘটনা বাহ্যিক শান্তভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবু তাঁহার গম্ভীর মুখে চিন্তা ও বেদনার ছায়া স্পষ্টই দেখা যাইত। কার্য্যস্থল হইতে আসিয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে লীলার শিয়রে বসিয়া থাকিতেন।

"তুমি আমাদের বড় ভাবিয়ে তুলেছিলে" লীলা সারিলে একদিন সকালে মিঃ রায় তাহার বিছানায় বসিয়া তাহার শীর্ণ হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "তোমার জন্য যে ভাবনা হয়েছিল! যা হোক্ এবার খুব শীঘ্র শীঘ্র সেরে উঠবে, কেমন? আমায় একবার দিল্লী যেতে হবে—ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, তুমি গায়ে বেশ বল পেয়েছ! তখন একটা পার্টি দেওয়া যাবে। তোমার অসুখের সময় যে সব বন্ধু-বান্ধব সর্বদা খোঁজ-খবর নেওয়া, দেখা-শোনা করেছেন, তাঁদের সব তুমি সে-দিন নিজে আদর-অভ্যর্থনা করবে—কি বল?"

লীলা এ কথায় বিশেষ তৃপ্তি পাইল না, বরং সে একটু ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার তুমি এর মধ্যে বাইরে যাবে? কি যে তোমার এত কাজ, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না। তা কবে যাবে? ফিরতেই বা কতদিন লাগবে তোমার?"

মিঃ রায় একটু হাসিয়া তাহার উৎসুক মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "কেন বল ত, এ খোঁজ হচ্ছে?"

লীলা বলিল, "তুমি হাসছ; সত্যি বলছি—তুমি চলে গেলে বাড়ীতে একটুও ভাল লাগে না আমার। বল—কত দিনে ফিরবে?"

মিঃ রায়ের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি লীলার পাণ্ডুর গাল দুটি টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কিছু ভেবো না! আমি যত শীঘ্র পারি,

আমার এই ছোট্ট মা-টির কাছে ফিরে আসবো। আমিই কি তোমায় একলা ফেলে বেশি দিন থাকতে পারি?"

লীলা আর কোন উত্তর করিল না। সে ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজিয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। মিঃ রায় ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে লীলা বলিল, "বাবা, কিরণকে আজ সন্ধ্যার সময় একবার পাঠিয়ে দেবে? ডাক্তার এখনো আমায় খালি-খালি একলা থাকতে বলে। আমি যদি আধ ঘণ্টা তার সঙ্গে দুটো একটা কথা বলি, তাতে আমার এমন কি ক্ষতি হবে বল ত?"

মিঃ রায় কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কি দরকার তোমার তাকে লিলি? তুমি এখনো বড় দুর্ব্বল কি না, তাই ডাক্তার—"

লীলা বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "না বাবা, না, আমি নিজে একবার তাকে দেখতে চাই। আমার গোটা কতক কথা বলবার আছে।"

সে দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি একবারটি তাকে আধ ঘণ্টার জন্য পাঠিয়ে দেবে, বল? দেখো তুমি—আমার তাতে কিছুই ক্ষতি হবে না। দেবে তো? বল!"

এ আবদার নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা জজসাহেবের ছিল না। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা; যদি সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে গিয়ে তার দেখা পাই, তাহলে পাঠিয়ে দেব! কিন্তু মনে রেখো—বেশি বকতে পাবে না, খবরদার!"

২৮

সন্ধ্যার সময় একা বসিয়া লীলা কিরণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মুখ তখনো একেবারে রক্তশূন্য, সাদা। প্রচুর রুক্ষ কালো চুল

দুইটি বিনুনি করিয়া মাথার দুই ধারে জড়ানো। কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ মুখে চোখ দুটি যেন অসম্ভব বড় দেখাইতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কিরণ সেখানে প্রবেশ করিল। সেই মাত্র বিলিয়ার্ড টেবিলে মিঃ রায়ের কাছে লীলার কথা শুনিয়া সে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করে নাই।

মিঃ রায় তাহাকে বলিয়াছেন, "লীলা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তোমার যদি বিশেষ অসুবিধা না হয়, তা হলে বাড়ী যাবার সময় তার সঙ্গে একবার দেখা করে যেও।"

অসুবিধা! কিরণের মন সেই মুহূর্ত্তে লীলার কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। এই আহ্বানটির জন্য সে আজ কত দিন হইতে তৃষিত, পিপাসিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে!

সে খেলা ফেলিয়া সবিনয়ে বলিল, "আমি এখনই তার কাছে যেতে চাই! যাব কি?"

মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন,—"এই দেখ; এত তাড়া কিসের? দুজনেই সমান ব্যস্তবাগীশ! তোমার সুবিধামত এক সময় গেলেই হবে! সে জন্য নিজের কাজ-কর্ম্ম বা আমোদ-আহ্লাদ নষ্ট করা কেন?"

"—আমার এখন কোন কাজ নেই; আর তাকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পাওয়ার চেয়ে আমার কাছে আর অন্য কিছু আনন্দের বিষয় থাকতে পারে না।"

কিরণ আর দাঁড়াইল না। নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার ভয় ছিল—বীণা জানিতে পারিলেই, তখনই তাহার সঙ্গে বাড়ী যাইবার আবদার জুড়িয়া বসিবে।

রোগীর ঘরের শেড্-ঢাকা স্তিমিত আলোয় কিরণ সেই রাত্রের প্রায় দুই মাস পরে লীলাকে দেখিল,—যেন একটি ঝটিকা-তাড়িত ফুলের মত শীর্ণ মুখ; তবু সেই মুখে তাহার মনের অদম্য শক্তি ও তেজ পূর্ব্বের মতই অব্যাহত।

আজ আর তাহার কোন সাজসজ্জা ছিল না। কিরণ মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিল—কি সুন্দর!

সে প্রথমে কোন কথা বলিতে পারিল না; শুধু নিঃশব্দে তাহার ক্ষীণ শুভ্র হাতখানি ধরিয়া পাশে বসিল। তাহার এত কথা বলিবার ছিল, কতদিনকার কত বিষয় মনে মনে সঞ্চিত হইয়া আছে, কিন্তু সে সময় সে কোন কথাই বলিতে পারিল না।

লীলা খুব সহজ ভাবেই তাহার অভ্যর্থনা করিল। তাহার ব্যবহারে বা কথায় কোনো সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা ছিল না।

সে বলিল,—"তুমি জান না—একটু জ্ঞান হবার পরই তোমায় দেখবার জন্য আমি কত ব্যস্ত হয়েছিলুম! কত দিন তোমায় ডেকেছি—ওরা কেউ আমার কথা শুনতো না—আজ বাবাকে কত করে বল্‌তে তিনি তোমায় পাঠিয়ে দিলেন।"

কিরণ কোন কথা বলিল না—কেবল লীলার মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"তুমি কথা বলছো না কেন? ভাবছো—বেশি বকলে আমার অসুখ হবে? তা নয়; আমি ত এখন বেশ ভালই আছি; খালি দুর্ব্বল বলে চলা-ফেরা করতে পারি না; তুমিও আমার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিলে কিরণ?"

লীলার রুক্ষ চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে কিরণ সস্নেহে বলিল,—"সে কথা কি আবার জিজ্ঞেস্ করতে হয় লীলা?

কি করে যে আমার এ-সব দিনগুলো কেটেছে, সে তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না।"

লীলা প্রীত হইয়া প্রসন্নমুখে বলিল, "সে আমি সব জানি। তোমার মত আমাকে আর কেউ এত ভালবাসে না,—এক বাবা ছাড়া আর কেউ নয়; তোমার কাছে কত কথাই যে আমার শোনবার আছে, বুঝেছ ত—কি বলছি আমি? বেচারা অরুণের কথাটাই শোনবার জন্য আমি আরো ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম! সে ভাল আছে ত? আমায় না দেখে সে কি ভাবছে?"

"সে ভালই আছে! তোমার জন্য সে মনে মনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। আমি তাকে বলেছি—বীণা তার ছোট বোনের অসুখের জন্য বাড়ী ছেড়ে আসতে পারে না। সে তাই বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত মনে আছে।"

"আহা! বেচারা! কি মন্দ ভাগ্য নিয়েই সে এসেছে! তার কথা মনে হলে আমার যে কি কষ্ট হয়, সে তোমায় আর কি বোলবো! কত বড় মহৎ জীবনটা কি ভাবে নষ্ট হয়ে গেল! কি করে যে তার এই অবশিষ্ট দীর্ঘ জীবনটা কাটবে, আমি তাই ভাবি! তুমি যে ঠিক আমারি মত তাকে ভালবাস, আর তার ব্যর্থ জীবনের দুঃখের কথা আমার মতই মন দিয়ে অনুভব কর, এটা যে আমার কত ভাল লাগে! মানুষের দুঃখ-কষ্ট মানুষ হয়ে বুঝবে না, কিম্বা বুঝতে চায় না, এরকম হৃদয়হীন লোকেদের আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।"

কিরণের মন তখন লীলার জন্য ব্যস্ত, মানব-প্রকৃতির তথ্য আলোচনার দিকে তাহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সে নিজের মনের আবেগে পূর্ণ হইয়া লীলার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

লীলা আপন-মনেই বলিতে লাগিল,—"আমার এখন নিজেকে কি একলাই মনে হচ্ছে! আরো কত দিনে যে গায়ে একটু বল পাবো, বাইরে যেতে পারবো, তা কিছু বুঝতে পারছি না। দিন-রাত একলা থেকে থেকে আর ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই মনে হয়, এ সময় যদি আমার একজন সঙ্গী কেউ থাকতো!"

কিরণ তাহার ভাবে-ভরা দীপ্ত দুই চোখ লীলার মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল। "আমায় যদি বিশ্বাস হয়, তা হলে আমাকে তোমার সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গী বলে গ্রহণ করতে পারো!" তাহার মনের সমস্ত কথা সে তাহার সেই দীপ্ত দৃষ্টির মধ্য দিয়া বুঝাইতে চাহিতেছিল।

লীলা কিন্তু তাহার কথা বা সে দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিল না। সে ভাবিল, কিরণ তাহাদের অখণ্ড বন্ধুত্বের কথাই বলিতেছে। সে মুগ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি চিরদিনই আমার প্রতি এত সদয়! কত অবাধ্যতা করেছি, কত দোষ করেছি তোমার কাছে, যখন মনে হয়, তখন ভাবি, আমি তোমার এত স্নেহ পাবার উপযুক্ত নই! তোমার বন্ধুত্ব পৃথিবীর মধ্যে আমার কাছে অমূল্য!"

কিরণ ডাকিল—"লিলি!"

সে স্বরে চমকিয়া লীলা তাহার উচ্ছ্বাস বন্ধ করিয়া কিরণের মুখের দিকে চাহিল। তাহার উত্তেজিত মুখ ও জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখিয়া লীলা নিজেও অবাক্ হইয়া গেল।

কিরণ বলিল,—"তুমি কি কোন দিনই আমার কথা বুঝবে না লিলি? দেখছো না, আমি তোমাকে কত ভালবাসি! কেন শুধু বন্ধুত্ব বলে ভুল করছো? আর কি করে এ-কথা তোমাকে বোঝাব বল?"

লীলা পাংশুমুখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল! এ কথা যে সে কল্পনায়ও মনে আনিতে পারে না। এ কি অসম্ভব কথা আজ সে শুনিতেছে!

কিরণ বলিল, "এখনো বোঝ নি? কত দিন কত ভাবে তোমায় এ-কথা জানাতে চেয়েছি, কিন্তু তুমি কোন দিনই বুঝতে চাওনি! আমিও ভেবেছিলুম, যত দিন নিজে থেকে না বুঝবে, তত দিন এ বিষয়ে কথা বলবার কোন দরকার হবে না। কিন্তু আর যে আমি চেপে রাখতে পারছি না, লিলি? আজ তিন চার মাস দূরে থেকে আমার মনের ভাব আমি বেশ বুঝেছি। তুমি জানো না লিলি, আমি তোমায় কত ভালবাসি। তোমায় ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব!"

এবার আর বুঝিতে লীলার ভুল হইল না। কিরণের আবেগে উচ্ছ্বসিত আরক্তিম মুখ ও অনুরাগ-দীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে সে প্রথমটা সংজ্ঞাশূন্যের মত নিঃস্পন্দ হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। তাহার দুর্ব্বল দেহে এ উত্তেজনা সহ্য হইল না। তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিরণ ক্রমে নিজের মনের উচ্ছ্বাস দমন করিয়া শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। লীলার অবস্থা দেখিয়া সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। লীলার কম্পন তখনো থামে নাই। কিরণ ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল, "মাপ করো লিলি! আজ তোমাকে এ-কথা বলা আমার উচিত হয় নি! আমার আরো অপেক্ষা করা উচিত ছিল! এখন তুমি এ-কথা ভুলে যাও! ভাল করে সেরে উঠলে, তখন আবার এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

শুধু এইটুকু জেনে রাখো—আমি তোমারই! আমার জীবন নিয়ে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো! যতদিন জীবন থাকবে—আমি তোমার।”

লীলা কিন্তু কোনো কথা শুনিল না; বিহ্বলের মত অবশ ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

যেমন শত বৎসরের অন্ধকার গৃহে একটি দীপ শলাকা জ্বালাইলে তাহার সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়, কিরণের একটি স্পষ্ট কথায় তেমনি লীলা তাহার এত দিনের অজ্ঞাত মনোভাব সুস্পষ্ট রূপে বুঝিয়া ভয়ে বিস্ময়ে মুহ্যমান হইয়া রহিল!

আজ সে বুঝিল, সেও কিরণকে ভালবাসে। কিন্তু হায়! এখন—এখন যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে! এখন বুঝিয়া আর ফল কি?

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া লীলা নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিল। কি অপূর্ব্ব আনন্দে, কি তীব্র বেদনায় তাহার সমস্ত চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে!

কত দিন কত ভাবে কিরণ তাহাকে এ-কথা বুঝাইতে চাহিয়াছে। আজ একে একে সেই সব কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল! কেন সে বুঝিল না—কেন সে জানিল না? যখন সময় ছিল, তখন কেন সে বোঝে নাই! আর আজ? আজ যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে! আজ আর বুঝিয়া কি হইবে?

কিরণকে হারাইয়া কেন যে সে জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি হারাইয়াছিল, কেন যে তাহার মন নিশি-দিন কিরণের জন্য কাঁদিয়া ফিরিত, এত দিন পরে সে আজ তাহা স্পষ্ট অনুভব করিল! মানুষে এমন অন্ধ হইয়া থাকিতে পারে? আজ সে বুঝিল, কিরণ তাহার অন্তর-বাহির জুড়িয়া রহিয়াছে—সেখানে আর কাহারও স্থান নাই।

কিন্তু হায়! এত বিলম্বে! এখন যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—এতদিন কেন সে একথা বুঝিল না?

যে কিরণকে সে নারীর প্রেমে অনাসক্ত ও অজেয় বলিয়া জানিত, সে যে তাহারই একান্ত অনুরক্ত! সংসারে যাহাকে করুণায়, শক্তিতে, স্নেহে, বীরত্বে অসাধারণ বলিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই তাহার বন্ধু, সখা—তাহার চির-নির্ভরস্থল কিরণ—সে তাহাকেই ভালবাসিয়া, তাহাদের মধ্যে বয়সের তারতম্যের প্রভেদ ঘুচাইয়া, তাহাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে? কেন সে বুঝিল না, কেন সে জানিল না—জানিলে কি সে কখনো অরুণের কাছে যাইত? যাইতে পারিত?

লীলার মনে পড়িল, এক দিন সে গাহিয়াছিল, 'যদি তুমি প্রাচীন হইতে, হে বন্ধু! আমি আমার যৌবন বিসর্জ্জন দিতাম, যাহাতে তোমার বয়সের পার্থক্য আমাকে তোমা হইতে দূরে না রাখিতে পারে।' সেদিনও কিরণ এই গান শুনিয়া কি অনুরাগ-বিহ্বল-চিত্তে তাহাকে তাহার মনের কথা জানাইতে চাহিয়াছিল! সেদিন লীলা কিছুই বোঝে নাই! ভবিষ্যতে যে এ গান তাহারই জীবনে সত্য হইবে, তাহা কে জানিত?

লীলা বিবেক বুদ্ধি ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের তাড়নায় মর্ম্মাহত হৃদয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল।

তাহার জীবনের এই আনন্দময় স্বর্গের দুয়ার সে নিজের হাতে চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়াছে! প্রেম, আশা, আনন্দ, সবই জীবন হইতে চিরবিদায় দিয়া তাহাকে এখন কঠোর কর্ত্তব্যের বশীভূত করিয়া লইতে হইবে! অন্ধ অসহায় অরুণ! তাহার দুঃখময় জীবনের প্রতি করুণা ও মমতায় স্বেচ্ছায় লীলা তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে! তাহার কাছে সে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ—তাহাকে ত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই!

* যে সত্য এত দিন তাহার অজ্ঞাত ছিল, তাহা চিরদিনই অজ্ঞাত রহিল না কেন? লীলার সুপ্ত হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া তাহাকে চিরদিনের মত দুঃখ ও নিরাশায় ভাসাইতে কেনই বা আজ সে সত্য আত্মপ্রকাশ করিল? সে এখন কি করিবে? কিরণকেই বা কেমন করিয়া এত বড় আঘাত সে দিবে?

লীলা কোন দিকে কিছু কুল-কিনারা পাইল না, কেবল বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

তাহার এই কম্পিত ও নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া কিন্তু কিরণের মনে আশার সঞ্চার হইতেছিল। সে তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল,—"আমি জানি, তুমি কোন দিন অরুণকে ভালবাস-নি, তুমি নিজেকে ভুল বুঝেছিলে, নিজের মন তুমি জানতে না, তুমি আমাকে শুধু ভালবাস! আমারই তুমি! আমার কাছ থেকে কেউ তোমায় নিয়ে যেতে পারবে না! লিলি! মুখ তোল! আমার দিকে ফিরে চাও!"

লীলার এই উভয়-সঙ্কটের অবস্থা তাহার দুর্দ্দশার সাক্ষ্য দিতেছিল। সে মুখ তুলিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বুঝিতেছিল, তাহার অন্তর কত দুর্ব্বল। কিরণের চিরপ্রিয় সুন্দর মুখের দিকে চাহিলে সে বুঝি আর তাহার প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে পারিবে না।

শান্ত নীরব সন্ধ্যায় তাহারা দুইজনে কতক্ষণ এমনি নীরবে কাটাইল। মাঠ হইতে প্রত্যাগত ধেনুদলের ঘণ্টার শব্দ ও কুলায়-প্রত্যাগত পাখীদের সেদিনের বিদায়-গীতির কলতান কেবল মধ্যে মধ্যে চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

কতক্ষণ পরে কিরণ চুপি চুপি ডাকিল—"লিলি"!

"কি—বল ?"

"একবার বল—তোমায় ভালবাসি ! একটিবার শুধু—একটি-বার বল !"

লীলা বাণবিদ্ধার মত আবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল ! "কিরণ ! এটা কি হাসি-তামাসার মত তুচ্ছ কথা ?"—সে আর কিছু বলিতে পারিল না। বলিবারই বা তাহার কি আছে ? অরুণকে সে ছাড়িতে পারে না। কিরণের এই অগাধ প্রেম ও বিশ্বাসে পূর্ণ হৃদয়কেই বা সে কিরূপে এত বড় আঘাত দিবে ? নিজের দুঃখ ভুলিয়া কিরণের জন্যই তাহার প্রাণ কাঁদিতেছিল।

কিরণ যেন তাহা বুঝিল—একটি অখণ্ড তৃপ্তি ও গৌরবে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। তখন সে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য গল্প করিতে লাগিল। অরুণের কথা তুলিয়া সে লীলাকে জানাইল, অরুণ তাহার অদর্শনে অত্যন্ত কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। সে লীলার স্থান গ্রহণ করিয়া প্রতিদিনই তাহার পাণ্ডুলিপি তাহাকে পড়িয়া শোনায়। আজকাল সে আর বড়-একটা বাহিরে বেড়াইতে যায় না,—দিনের বেলা সর্ব্বক্ষণ তাহারই কাছে কাছে থাকে।

অরুণের কথা উঠিলে লীলা বালিশ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। অত্যন্ত লজ্জিত ও অরুণ-রাগে রঞ্জিত সে মুখ ! সে কিরণের চোখের দিকে না চাহিয়াই অরুণের সম্বন্ধে কথা বলিতে উদ্যত হইল।

তখন নর্স আসিয়া জানাইল—কিরণের বিদায় লইবার সময় হইয়াছে। প্রথম দিনে এত বেশী কথা বলা উচিত নয়।

কিরণ সেদিনের মত বিদায় লইয়া স্বপ্নাভিভূতের মত গাড়ীতে গিয়া উঠিল। নবীন অনুরাগে তাহার চক্ষু তখন জ্বলিতেছিল।

২৯

কাশীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটের উপর একটি নির্জ্জন চত্বরে অসিত একা বসিয়া বেণীমাধবের গগনস্পর্শী ধ্বজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। নীচে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা—অপরাহ্ণের সূর্য্য অস্তপ্রায়। সেই ম্লান রক্তিম কিরণ নদীর বুকে, ঘাটের পথে, গাছের পাতায় ঝরিয়া পড়িতেছিল। ঘাটের পথ জনবিরল, কেবল গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিতা স্নানার্থিনী কয়েকটি নারীর আলাপের ধ্বনি মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

নদীতীরে একা বসিয়া অসিত তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা ভাবিতেছিল। উত্তর বাংলায় এক শান্ত-শ্যামল পল্লীর মধ্যে তাহাদের সেই নিশ্চিন্ত সুখময় গৃহের চিত্র স্বপ্নের মত এখনো তাহার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে—মায়ের সেই প্রসন্ন-সুন্দর মুখখানি—কত আদরে কত যত্নে যে মায়ের স্নেহের কোলে সে দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। প্রতিদিন ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সে মায়ের চুম্বনে জাগিয়া হাসিয়া উঠিত। তাহার পর সমস্ত দিন তাঁহার সকল কাজের মধ্যে সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। কত অশ্রান্ত গল্প, কত কথা, কত হাসি, সন্ধ্যার সময় চাঁদের আলোয় মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্প—সেই সুখের স্বপ্নের মত দিনগুলির অস্পষ্ট স্মৃতি এখনো তাহার মনে পড়ে। তাহার পর এক দিন কিসে কি যে হইয়া গেল, তাহা সে কিছুই জানিল না—তাহার মা তাহাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই তাহাকে সে-কথা কিছু বলিল না—শুধু তাহার পিতা তাহাকে লইয়া তাহাদের গৃহ ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। সেই হইতে তাহার দুঃখের জীবন আরম্ভ হইল।

আশ্রয়হীন, অর্থহীন, অসহায় অবস্থায় কত দিন পথে পথে তাহাদের জীবন কাটিয়াছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে কাতর হইয়া কত দিন মায়ের মুখ মনে পড়িয়া তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত,—অল্পভাষী গম্ভীর-প্রকৃতি পিতার ভয়ে সে কাঁদিতে পারিত না,—নিঃশব্দে মনের ব্যথা মনে চাপিয়া নীরব রোদনে বক্ষ পূর্ণ করিয়া গুমরাইয়া থাকিত। কেহ তাহাকে একটি আদরের কথা বলিত না, কেহ তাহাকে যত্ন করিত না। একটু ভালবাসার জন্য, একটু স্নেহের স্পর্শের জন্য তৃষিত হইয়া তাহার দুঃখের জীবনের কত দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল।

তাহার পরে ক্রমে সে বড় হইল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে পিতার সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের তীব্র বেদনা ও প্রতিহিংসার জ্বালার সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিল।

সে শুনিল, তাহাদের গ্রামের জমীদার গিরীন্দ্রনারায়ণ ঘোষই তাহাদের সমস্ত দুঃখ ও অপমানের মূল কারণ। মণ্ডলগড় পরগণার নায়েবের অত্যাচারে প্রজারা উত্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। কর্ম্মচারীদের চক্রান্তে জমীদারের নিকট কোন কথা উঠিতে পারিত না। তাহার মহাপ্রাণ পিতা প্রজাদের পক্ষ লইয়া জমীদারকে সমস্ত ঘটনা সত্য ভাবে জানাইয়া উভয় পক্ষে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে, জমীদারের রোষে পড়িয়া অনেক মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায়, নানা অত্যাচারে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল।

কিন্তু শুধু এই উৎপীড়নেই জমীদারের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির তৃপ্তি হইল না। এক দিন তাহার পিতা কোন বিশেষ কার্য্যে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন,—দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য, কেহ কোথাও নাই। প্রতিবেশীরা সংবাদ দিল, গত রাত্রে

জমীদারের লোকজন আসিয়া ঘরের দরজা ভাঙিয়া তাঁহার পত্নীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা জাগিয়া উঠিলেও ভয়ে জমীদারের বিপক্ষে দাঁড়াইতে সাহস করে নাই। শিশু অসিত উপস্থিত তাহাদের কাছেই আছে।

সেই দিন অপরাহ্ণে দীঘির জলে তাহার মাতার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিল। দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সতী অভিমানে ও ঘৃণায় আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

তাহার পিতা জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়া শুধু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ও এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। এই তাহাদের জীবনের ইতিহাস।

তাহার পর হইতে সে-ও তাহার পিতার মত তাহাদের বংশের অপমানকারী সেই প্রবল শত্রুর প্রতি তীব্র প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ-স্পৃহা নিজ হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়া তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কোন দিন কৃতকার্য্য হয় নাই। পিতা-পুত্রের সম্মিলিত চেষ্টা কতবার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। অভাবে, দুশ্চিন্তায়, গুরুতর পরিশ্রমে ক্রমেই তাহার পিতার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল। অবশেষে এক দিন জীবনের ঈপ্সিত কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতেই তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিল।

অসিতের মনে পড়িল—কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপর তাহার পিতার মৃত্যুশয্যা। সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শেষ রাত্রে তিনি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গাবক্ষে সেই নির্জ্জন শ্মশানঘাটে এক মন্দিরের চত্বরে একা সে মৃতপ্রায় পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রাত কাটাইয়াছে। অর্থ, সম্পদ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত থাকিতেও

আজ পনের বৎসর ধরিয়া অসহ্য মর্ম্মবেদনায়, দারিদ্র্যে, অর্দ্ধাশনে, বিনা চিকিৎসায় তাহার পিতা মৃত্যুমুখে—নিতান্ত দীনহীনের মত, পথ-ভিখারীর মত অসহায় অবস্থায় ভূমিশয্যায় পতিত! একটা নিরুপায় হতাশা ও তীব্র যাতনায় তাহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। উপযুক্ত পুত্র হইয়াও সে এক দিনের জন্য তাহার উৎপীড়িত, দুঃখী পিতাকে কোন স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিল না!

প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রামগোবিন্দ জাগিয়া উঠিলেন। একবার প্রাণ ভরিয়া স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করিলেন। তাহার পর উদ্দেশে মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমার সময় হয়ে এসেছে, অসিত! যা কিছু আমার বলবার ছিল, সে সবই তোমার জানা আছে। নতুন করে আর কিছু বলবার নেই। এখন শুধু সেই সব কথাগুলোই তোমায় আবার মনে করিয়ে দিয়ে যাই ..."

তাঁহার মুখে রৌদ্র আসিয়া পড়িতেছিল। অসিত উঠিয়া নিজের গায়ের চাদরখানি রৌদ্র আচ্ছাদন করিয়া টাঙ্গাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি বলিলেন, "আমার এই মৃত্যুশয্যায় তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, যে কাজ আমি অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাচ্ছি—তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় সে কাজ সুসম্পন্ন করবে? তোমার মায়ের সম্মান যে নষ্ট করেছে, আমাদের জীবনব্যাপী সমস্ত অপমান ও দুঃখের যে মূল, তাকে যেখানে যে কোন অবস্থায় পাবে, নির্ব্বিচারে হত্যা করবে। তার রক্ত ভিন্ন আমার আত্মা আর কিছুতেই তৃপ্ত হবে না। তোমার প্রতিহিংসা যেন তাকে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত অবিরাম অনুসরণ করে। বল, সে যেখানেই থাক, তাকে খুঁজে বের করবে?"

অসিত সাশ্রুনয়নে পিতার মৃত্যুশয্যা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

রামগোবিন্দের শুষ্ক অধরে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। শান্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরে কিছু দিন অসিত লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে পথে বেড়াইল। কোন কাজে মন দিতে পারে না—কোন কিছুই ভাল লাগে না, কি করিবে কোথায় যাইবে, তাহা কিছুই মন স্থির করিয়া ভাবিতে পারে না।

এই সময় বাংলায় বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল। চারিদিকে সভাসমিতি, বক্তৃতা, বিদেশী পণ্য বর্জ্জন প্রচেষ্টা ইত্যাদিতে সারা বাংলা টল্‌মল্ করিতে লাগিল। অসিত যেন সহসা অকূলে কূল্ পাইল। জীবনের পথে নূতন আলোর সন্ধান পাইয়া সে-ও নবীন আবেগে ও উত্তেজনায় এই আন্দোলন মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তাহার পর হইতে কিছু দিন অসিত দলের মধ্যে থাকিয়া বাংলার দিকে দিকে অক্লান্ত ভাবে ও কঠোর পরিশ্রমে বয়কট মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন আর তাহার নিজের কথা ভাবিবার স... বা চেষ্টা রহিল না।

উত্তেজনার পর অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই, যখন সরকার পক্ষ হইতে অত্যাচার, নির্য্যাতন, নানা নূতন আইনের নাগপাশের বন্ধন আরম্ভ হইল, তখন দলের মধ্য হইতে অনেকেই একে একে সরিয়া পড়িল। দেশভক্তির আতিশয্য আর তখন তাহাদের টানিয়া রাখিতে পারিল না।

কিন্তু ইহারই মধ্যে আরো একটি দল ছিল, যাহারা প্রথম উত্তেজনার মুখে দেশসেবায় নামিলেও, ক্রমে তাহারা যথার্থ দেশকে চিনিয়াছিল, দেশকে ভালবাসিয়াছিল, দেশের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। তাহারা উৎপীড়ন, নির্য্যাতনে টলিল না,—কোন প্রলোভন,

কোন আতঙ্কই আর এই ঘরছাড়ার দলকে ঘরে ফিরাইতে পারিল না। বাংলায় দিকে দিকে এই ঘরছাড়ার দলকে লইয়া নানা বিপ্লব-সমিতি গড়িয়া উঠিল। লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এই সব বিপ্লববাদীর দল নানা ভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল।

অসিতেরও আর ফিরিবার মন ছিল না। সে কিসের আকর্ষণেই বা কোথায় ফিরিবে! সংসারে তাহার কোন বন্ধন ছিল না। সে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিয়া বিপ্লববাদীদের দলে মিশিয়া গেল।

এই সমিতির দলভুক্ত হইয়া যখন সে নানা মতের মধ্য দিয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া, নানা দিক হইতে দেশের মুক্তির অত্যুগ্র চেষ্টায় নিজের জীবনের কথা বিস্মৃত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় এক দিন পাটনার নির্জ্জন প্রান্তরে নিতান্ত অতর্কিত অবস্থায় তাহার জীবনের প্রবল শত্রুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

* * * *

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অসিত একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া তখন তটভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নদীর জলেও সেই আঁধার ছায়া। দূরে অরণ্যানীর অন্তরাল হইতে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ ঈষৎ উঁকি দিতেছিল। বেণীমাধবের মন্দির হইতে সন্ধ্যা-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ধীর সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছিল। অসিত উঠিয়া চত্বরের এক কোণ হইতে কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইল। তাহার পর যেন কাহার আসার আশায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ঘোষের সহিত দেখা হইবার পর হইতে কি দুর্নিবার চাঞ্চল্য ও উদ্বেগেই না সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল! এই সেই তাহাদের

জীবনের প্রবল বৈরী! ইহারই হাতে তাহার মা অপমানিত হইয়া ঘৃণা ও ধিক্কারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ইহারই অত্যাচারে তাহার পিতা আশ্রয়হীন, বিত্তহীন হইয়া, পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরিয়া নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অকালে মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার পিতৃমাতৃহন্তা সেই নারকী আজ তাহার আয়ত্তের মধ্যে। দেশের সহিত সমস্ত যোগ ছিন্ন করিয়া এতদিন সে সুদূর পশ্চিমের এক প্রান্তে আত্মগোপন করিয়া কাটাইয়াছে! তাই তাহারা এত সন্ধান করিয়াও তাহাকে কোনদিন বাহির করিতে পারে নাই। কিন্তু এবার? এবার তাহার হস্ত হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

পৈশাচিক আনন্দে ও তীব্র প্রতিহিংসায় প্রথমে কিছুক্ষণ তাহার সমস্ত চিত্ত বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। সে সময় সে আর কোন কাজে মন দিতে পারিল না। ঘোর উত্তেজনা ও উদ্বেগে অধীর হইয়া সে কেবলই অশান্ত ভাবে ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহার মনের সে ভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার এত দিনের উদ্যত প্রতিহিংসার পাত্র কি সেই সরলহৃদয় কন্যাগতপ্রাণ সদানন্দময় বৃদ্ধ? নির্ম্মলার কাতর করুণ মুখের দিকে চাহিয়া কি উদ্বেগ ও শঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে মিঃ ঘোষ সেদিন বসিয়া ছিলেন। সে কি স্নেহকাতর, মমতাময় দৃষ্টি! যে হৃদয়হীন দাম্ভিক বর্ব্বরের অমানুষিক অত্যাচারে তাহাদের সুখের সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে, এ কি সেই ব্যক্তি? অসিত কিছুই বুঝিতে পারিল না। নির্ম্মলা একটু সুস্থ হইবার পর হইতে মিঃ ঘোষের সেই সরল, স্বচ্ছন্দ আলাপ, কথায় কথায়, কারণে অকারণে তাঁহার প্রাণখোলা উচ্চ হাসি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর তাহার পরিচয় পাইবার পর? অসিত অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল!

তাহার পরিচয় পাইয়া কি ঘোর লজ্জা ও অনুতাপের তীব্র জ্বালা মিঃ ঘোষের প্রসন্ন মুখে না ফুটিয়া উঠিয়াছিল ? সেই অনুতপ্ত, কুণ্ঠা ও লজ্জায় নতশির বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া তাঁহার এত দিনের অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে হইবে ! অসিতের তরুণ বীর-হৃদয় এ চিন্তায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল। নিজের সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে সে কখনো পশ্চাৎপদ নয়, কিন্তু এ যে একেবারে মৃতের উপর অস্ত্রাঘাত ! যে নিজেই তাহার কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় মরিয়া আছে, তাহার উপর আবার সে কেমন করিয়া আঘাত করিবে ! আর নির্ম্মলা ? সে হয় ত এ সব বিষয়ের কোন কথা ঘুণাক্ষরেও জানে না ; অথচ এ ব্যাপারের সমস্ত ফলাফল সেই নিরপরাধিনীর ভাগ্যেই অতর্কিত বজ্রাঘাতের মত এক দিন পতিত হইবে !

অসিত অনেক ভাবিয়াও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তাহাদের সমিতির আদেশে তাহাকে নিজের ব্যাপারের মীমাংসা স্থগিত রাখিয়া পাঞ্জাবে চলিয়া যাইতে হইল ! সেখানে ও অন্যান্য স্থানে এই তিন চার মাস অক্লান্ত ভাবে কাজ করিয়া সে সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে আবার পশ্চিমে ফিরিয়া আসিয়াছে !

সেদিন দানাপুর হইতে ফিরিবার পথে সহসা নির্ম্মলার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে আবার তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার সহিত যে হৃদয়হীনের মত নির্ম্মম ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এ কয়দিন তাহার সকল কাজের মধ্যে, সকল চিন্তার মধ্যে তাহা কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিয়া, তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। নির্ম্মলার সেবাপরায়ণ চিত্তের যে উদ্যত সেবা প্রত্যাখ্যান করিয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল, সেই অসমাপ্ত, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি,

অনুক্ষণ তাহার অন্তরে বুভুক্ষিতের মত তীব্র দহনের জ্বালা জ্বালাইয়া রাখিয়া তাহাকে পীড়া দিতেছিল। রৌদ্রকরদীপ্ত নির্ম্মল নীলাকাশে সহসা যেন কাহার ওই রক্তহীন, স্তব্ধ পাণ্ডুবর্ণ মুখের ছবি ফুটিয়া উঠে। অলস মধ্যাহ্নে ঝাউবনের মর্ম্মর ধ্বনির মধ্যে বাতাসে যেন থাকিয়া থাকিয়া কাহার আকুল আর্ত্তস্বর ভাসিয়া উঠে—দাঁড়ান! একটু দাঁড়ান! অসিত বাবু! কোথায় যান? এ কি তাহার হইল? কিসের এ ব্যথা? কিই বা সে এখন করিবে?

যাহার রক্তের জন্য সে তাহার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহার কথা মনে হইলেই এখন একটা অবাধ করুণার উচ্ছ্বাসে তাহার মনের জিঘাংসাবৃত্তি ডুবিয়া যাইতে চায়। অসিত প্রাণপণ বলে আপনাকে সংযত করিয়া পূর্ব্বের সেই কঠোর প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগাইয়া রাখিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিল!

সেদিন সে মিঃ ঘোষের বাড়ীর আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া কি এমন অন্যায় কাজ করিয়াছে? যে তাহাদের বংশের শত্রু, তাহার মাতার সম্মান-অপহারক, তাহাদের সর্ব্ব দুঃখের মূল, সে কি নারীর মোহে পড়িয়া, সে-সব পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়া, কুকুরের মত তাহারই গৃহে, তাহারই অন্ন গ্রহণ করিতে পারে? সে যাহা করিয়াছে, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য ও করণীয়। নির্ম্মলা অবশ্য এ ব্যাপারে নিরর্থক যন্ত্রণা পাইবে; কিন্তু তাহাতে অসিতের কি করিবার আছে? আজ সে নির্ম্মলার কথা ভাবিয়া এত ইতস্ততঃ করিতেছে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে সে যখন শিশু ছিল, তখন কি তাহার কথা ভাবিয়া কেহ তাহার নির্দ্দোষ মহাপ্রাণ পিতাকে এমন পৈশাচিক ভাবে উৎপীড়িত করিতে কোন দ্বিধা করিয়াছিল? তবে আজ তাহারই বা এত দুর্ব্বলতা কেন? নির্ম্মলার চিন্তাই বা কেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে

এমন লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতেছে? সে তাহার কে? নির্ম্মলার সঙ্গে তাহার কিই বা সম্বন্ধ? অসিত নির্ম্মলার কথা ভুলিয়া নিজের কর্ত্তব্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল!

এই কয় বৎসরের মধ্যে সমিতির আদেশে সে ত কতবার কত জনকে হত্যা করিয়াছে! তখন ত তাহার মনে কখন কোন দ্বিধা হয় নাই,—হত ব্যক্তির পরিবার বা পুত্র-কন্যার অবস্থার কথা কোন দিন তাহার মনে উদিত হয় নাই! মিঃ ঘোষের বেলায় বা তাহার এত ভাবিবার কথা কি আছে? তাহার এত দুর্ব্বলতা, এত ভাবনা—এ কি কেবল নির্ম্মলার জন্যই নয়? নির্ম্মলার মোহ এই সামান্য কয় দিনে তাহাকে এমন অভিভূত করিয়াছে যে, সে স্বচ্ছন্দে তাহাদের এত দিনের এত দুর্দ্দশা, এত অপমান ভুলিতে বসিয়াছে! সে কি তাহার মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার শেষ আদেশ এত সহজে, এত অনায়াসে ভুলিয়া যাইবে! যে মায়ের স্নেহের কোলে সে এ পৃথিবীর আলো প্রথম দেখিয়াছিল, যে মায়ের হৃদয়ের রক্তধারায় সে এত দিন পুষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই স্নেহময়ী জননীর অতৃপ্ত আত্মা যে তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণামের প্রতিশোধের আশায় তাহারই প্রতি চাহিয়া আছে! এত বড় কুসন্তান সে! এত অনায়াসে সে তাহার মায়ের স্মৃতির অবমাননা করিতে বসিয়াছে!

অসিতের ধমনীতে খরবেগে রক্ত বহিল। ক্ষণিকের মোহ ও দুর্ব্বলতা ভুলিয়া সে আবার পূর্ব্বের মত সাহস ও শক্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—এ প্রলোভন যে তাহাকে জয় করিতেই হইবে।

৩০

সহসা দূরে উৎকট ঝিঁঝি পোকার ডাকের মত সুতীব্র শিশের শব্দে নির্জ্জন গঙ্গাতট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অসিতের চিন্তাজাল সেই

শব্দে ছিন্ন হইয়া গেল। সেও চকিত হইয়া উঠিয়া কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া উচ্চরবে শিশ্ দিয়া পূর্ব্বশব্দের প্রত্যুত্তর দিল।

তাহার কিছু পরেই পরেশ ও সুধীর তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"অসিত-দা?"

অসিত বলিল—"এস, আমি অনেকক্ষণ থেকে তোমাদের অপেক্ষায় এখানে একলা বসে আছি। তার পর?—খবর কি সব?"

"খবর ভালই, চলো—একটু বসা যাক্—তার পরে ক্রমে সব বলছি।"

তিনজনে আসিয়া ঘাটের উপরের সেই চত্বরে বসিল। সুধীর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "অসিত-দার কি আজকাল এইখানেই স্থিতি না কি? তা জায়গাটি চমৎকার বাছা হয়েছে। এখানে কিছুদিন একা একা বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়।"

চত্বরের এক প্রান্তে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। পরেশ সেইখানে শুইয়া পড়িল। তাহার ঠিক মাথার উপর একটি তারা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। জনমানবহীন নীরব তটভূমিতে গঙ্গার মৃদু জলোচ্ছ্বাসের শব্দ সমতানে বাজিতেছিল।

শীতল ঝিরঝিরে বাতাসটুকু উপভোগ করিতে করিতে পরেশ বলিল—"তা কাটিয়ে দেওয়া যায় বটে, তবে কি না—শুধু চাঁদের আলো আর হাওয়া খেলেই ত পেট ভরে না—দেহটা এক বিষম স্থূল পদার্থ কি না, কাজেই ওটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যে কিছু বাস্তব দ্রব্যের—"

অসিত বাধা দিয়া বলিল, "বাস্তব দ্রব্যের জন্যে তোমার কিছু ভাবতে হবে না। এখানে আমি খোদ বেণীমাধবের মন্দিরে অতিথি—দুবেলা প্রচুর আহারের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে রাত্রেও থাকবার

জন্যে আমি একটি ঘর পেয়েছি—সেবা-যত্নের কোন ক্রটি নেই। তবে দিনের বেলাটা বড় গোলমাল। তাই দিনটা কাটাবার জন্যে এই জায়গাটা বের করা গেছে। এখন কাজের কথা বল।"

পরেশ বলিল—"বাঁচালে দাদা! এতক্ষণে ধাত এল! তুমি যে-রকম দার্শনিক মানুষ, খাবার কথা পাড়তে গেলেই হয় ত এক বিষম ধমক দিয়ে উঠবে, বলবে—এত বড় গুরুতর কাজের সময় আবার ও-সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? তাই ভেবে আমার ভয় হচ্ছিল। যাই হোক—এখন তোমার এদিককার কি খবর? ওদিকে ত সব প্রস্তুত—শুধু বাংলায়···বাবু বলছিলেন, যে যদি দিনটা আর কিছু পেছিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তাঁরা আরো কিছু সময় পেয়ে প্রস্তুত হতে পারেন,—টাকা কড়িও আরো কিছু সংগ্রহ হতে পারে।"

অসিত শুনিয়া বলিল, "সে-কথা আমিও ভেবে দেখেছি। কিন্তু এখন অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, সকল দিক বিবেচনা করে দেখলে আর বিলম্ব করা চলে না। আমি যখন পঞ্জাব থেকে ফিরে আসি, তখনই দেখে এসেছি—সেদিকের সমস্ত সিপাহীরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এতদিন চেপে রাখা গিয়েছিল, কিন্তু আর তারা এ ভাবে থাকতে চায় না। বলে, তোমাদের সময় আস্‌তে আস্‌তে আমাদের যদি ইউরোপের যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়, তা হলে ত সবই পণ্ড হয়ে যাবে। উত্তর-পশ্চিম আর বিহারের সমস্ত ব্যারাকে আমি নিজে ঘুরেছি, এখন পর্য্যন্ত তারা সকলেই আমাদের মতে চলতে রাজি আছে,—কিন্তু আর বেশি দিন টেনে রাখা তাদেরো চলবে না। সেই জন্যে আমি ভাবছি—যখন সবই প্রস্তুত, তখন আর সময় নষ্ট না করাই ভাল।"

পরেশ বলিল—"তা হলে আমার মতে তুমি একবার এখান হতে বেরিয়ে পড়। ওঁরা অনেক দূরে থাকেন, আর বাংলার বাইরের দিকে বেশি খবর রাখেন না বলে এ-সব দিকের অবস্থা ঠিক বোঝেন না। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে বল্‌লে তাঁরা মত পরিবর্তন করতে পারেন। আমি বাংলার ভিন্ন ভিন্ন দলে এবার ঘুরে দেখে এসেছি—সঙ্ঘ-গঠনের শৃঙ্খলা ও শক্তি ওদিকে যেমন গড়ে উঠেছে, আমার মনে হয়, আর কোথাও তেমন হয় নি। তুমি একবার গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

সুধীর এতক্ষণ নীরবে ছিল। সে এখন বলিল, "কিন্তু এখন যদি তোমায় বাইরে যেতে হয়, তা হলে এই সব দিক থেকেই সাবধানে বেরিয়ে যেও—কাশীর ভিতরে এখন যাবার চেষ্টা করো না। পাটনায় আজকাল খুব ধর-পাকড় সুরু হয়েছে। নলিন গ্রেপ্তার হবার পর তার কাছ থেকে কি কাগজ-পত্র পেয়ে এখন কাশীতেও চার দিকে খানা-তল্লাসীর ধুম পড়ে গেছে। তুমি যে দুখানা বাড়ীতে কাশী গেলে থাক, সে দুখানাই ওরা সার্চ্চ করেছে। আজ দেখে এলুম, দুটো বাড়ীতেই পুলিশ পাহারা।"

অসিত মৃদু হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ তারা ভেবে রেখেছে, আমি যখন বাইরে আছি, তখন কাশীতে এসে দুটো বাড়ীর একটাতেও অন্ততঃ যাব, আর ওরা তখন অনায়াসে আমায় ধরে ফেলবে। এখন কিছুদিন বেচারারা সেই সুখের স্বপ্নে ভোর হয়ে থাক্‌, আমি ততক্ষণ এদিকের কিছু কিছু কাজ গুছিয়ে আসি। ওরা কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছে—যে আমি ওদের চোখের সামনে দিয়ে দুটো বাড়ীতেই ঘুরে এলাম? দানাপুর ক্যান্টনমেন্টের কাজ সেরে আমি যেদিন কাশীতে আসি, পর পর দুখানা বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখি—ঐ ব্যাপার।

আমার অবশ্য তখন সন্ন্যাসীর বেশ,—কেউ ফিরেও দেখলে না। আমি ফিরে এসে তখন এইখানে আস্তানা নিয়ে তোমায় খবর দিলুম যা হোক্, এখন আমায় যদি কিছু দিনের জন্য আবার বাইরে যেতে হয়, তা'হলে এখানে তোমরা দুজন থাক্‌ছ ত?"

পরেশ বলিল, "বেশ তো! তুমি যত দিন ফিরে না আসছ, এদিককার যা কিছু কাজ, সে সব আমরাই চালাব।"

অসিত বলিল, "কাজ নতুন করে করবার মত এখন কিছু নেই। শুধু মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা, আর পাঁচ রকম কথা বলে তাদের উৎসাহটা বজায় রাখা—এইটুকু হলেই এখন চল্‌বে। অমৃতসর থেকে খবর এসেছে—সেখানেও একবার যেতে হবে। সেদিকের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটা দিন স্থির করে না ফেললে আর চল্‌বে না। আমি তা হলে আগে বাংলায় গিয়ে কথাবার্ত্তা স্থির করে তার পরে অমৃতসরে চলে যাব। এবার সেখানে যাওয়ার মানেই—এ ব্যাপারের চরম সিদ্ধান্ত করা। তার পর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, যদি এতদিন পরে সত্যই ভারতের ভাগ্যে যুগ-যুগান্তরের অধীনতা ঘোচাবার সময় এসে থাকে, তা হলে দেখবে—হয় ত আর দু'সপ্তাহের মধ্যেই এক বিরাট্ ব্যাপারের মধ্যে ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে।"

শেষের কথাগুলি অতি ধীরে-ধীরে গভীর স্বরে উচ্চারণ করিয়া অসিত স্বপ্নাভিভূতের মত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল; যেন সেই সুদূর গ্রহতারাখচিত নীল নভোমণ্ডলে ভারতবর্ষের অনিশ্চিত ভবিতব্য'টা কি, তাহাই সে একমনে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অসিতের সেই গভীর কণ্ঠস্বরে তাহার সঙ্গীদের অন্তরেও সহসা এক তীব্র ভাবের আবেগ ও এক বিচিত্র অনুভূতির বিদ্যুৎ-স্পন্দন বহিয়া

গেল। পরেশ তাহার স্বাভাবিক ব্যঙ্গ ও কৌতুকপ্রিয়তা ভুলিয়া অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কা ও উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

স্থধীর কল্পনায় সারা ভারতব্যাপী বিরাট বিপ্লবের ভীষণ রক্তের খেলার উত্তেজনার মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া নিস্পন্দের মত বসিয়া রহিল।

এত দিন ধরিয়া তিলে তিলে, অতি গোপনে, অতি সন্তর্পণে যে দেশব্যাপী বিষম আয়োজন করিয়া তোলা হইয়াছে,—এবার তাহার সাফল্য পরীক্ষা করিবার দিন আগতপ্রায়,—অনিশ্চিত উদ্বেগ ও সন্দেহে সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিতেছিল।

এত দিনের এত আশা, এত আয়োজন—সত্যই কি তবে সফল হইবে? সকল দিক বজায় রাখিয়া, সকল দিকে শৃঙ্খলা রাখিয়া এ বিরাট্ যজ্ঞ সমাধা করিতে পারিব কি? শেষ রক্ষা হইবে কি? তিনজনের অন্তরেই এই ভাবের শত শত প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল।

নির্জ্জন নদী-সৈকতে মৃদুতান তুলিয়া গঙ্গার জল অশ্রান্ত ভাবে কোন্ অনন্তের উদ্দেশে ছুটিতেছিল। ক্ষুদ্র লহরীগুলি নাচিতে নাচিতে আসিয়া তটভূমিতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে—ছল্-ছলাৎ—ছল্ ছলাৎ। কদাচিৎ কোন নিশাচর পাখীর অস্পষ্ট স্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। রজনীর সুগভীর স্তব্ধতার মাঝে তাহারা এই ভাবে কতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় কাটাইয়া দিল।

বহুক্ষণ পরে ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির নীরবতাকে সচেতন করিয়া পরেশ ডাকিল—"অসিত-দা?"

অসিত চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল—"কেন ভাই?"

"তোমার বিশ্বাস হয়?" পরেশ তাহার আগ্রহে-ভরা দৃষ্টি অসিতের প্রতি স্থির রাখিয়া বলিল—"এই যে একটা বিপুল আয়োজন

এত দিন ধরে করে তোলা হল, এর সাফল্যের ওপর তোমার স্থির বিশ্বাস আছে?”

“নিশ্চয়ই! বিশ্বাসের উপরেই এত বড় দেশজোড়া কাণ্ড গড়ে উঠেছে। এক দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছাড়া আর আমাদের কি সম্পদ আছে ভাই?”

“তবে কেন প্রাণে এত সংশয় জাগছে?”

অসিত বলিল, “ও কিছু নয় পরেশ! সব বড় কাজের আগেই কর্ম্মীদের মধ্যে ও-রকম একটা সংশয়ের ভাব, একটা উদ্বেগ আসেই,—সেটা কোন কাজের কথা নয়। ওটাকে ঝেড়ে ফেলে, দৃঢ় বিশ্বাস ও উৎসাহ নিয়ে আমাদের কাজে নামতে হবে। এই বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ই যুগে যুগে মানুষকে বড় করে তুলেছে—বাধা-বিঘ্নের মাঝ দিয়ে, মানুষকে বড় বড় কাজে নামিয়ে, তাকে সাফল্যে মণ্ডিত করে তুলেছে,—আমাদের বেলাই বা তার অন্যথা হবে কেন?’

পরেশ আর কিছু না বলিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিল। অসিতও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল; “যে যাই বলুক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—এই পথেই ভারতের জাতীয় উন্নতি, তার স্বাধীনতা সবই ফিরে আসবে। এই যে এত লোকের জীবন পণ করে একনিষ্ঠ সাধনা, এ কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে? আমাদের মধ্যে কেউ নামের জন্যে, যশের জন্যে এ পথে আসে নি,—কারুর প্ররোচনা শুনে, কোন লোকের বক্তৃতা শুনে, ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে এসে এ দলে যোগ দেয় নি। শুধু তারা নিজেদের অন্তর থেকে যে প্রেরণা পেয়েছে,—নিজের জীবন দিয়ে যে সত্যকে তারা অনুভব করেছে,—তার প্রতিষ্ঠা, তার সাধনার জন্যে তারা সমস্ত উৎপীড়ন, নিগ্রহ, সমস্ত দুঃখকে সাদরে বরণ করে নিয়ে, এই বিপদসঙ্কুল জটিল পথে এগিয়ে চলেছে। এই যে তাদের অন্তর-

দেবতার প্রত্যাদেশ. এই যে দেশের একদল লোকের মন-প্রাণ সুরে-বাঁধা যন্ত্রের মত একই সুরে কাঁপ্‌ছে,—এ কি সবই মিথ্যা হতে পারে? সে হয় না, সে হবে না। এই পথেই তার মুক্তি। তুমি-আমি হয় ত অনন্ত কাল-সাগরে লীন হয়ে যাব,—হয় ত সে-দিন দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটে উঠবে না। কিন্তু এই দেশের বুকের ভিতর থেকেই আবার এক দল উঠবে, যারা দেশের মুক্তির জন্যে তাদের হৃদয়ের শেষ রক্ত-বিন্দুটি পর্য্যন্ত হাস্‌তে হাস্‌তে উৎসর্গ করবে। এমন প্রাণব্যাপী একাগ্র সাধনা কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে?"

অসিত কথা শেষ করিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। পরেশ ও সুধীরের মনে হইল—যেন অসিতের কথার রেশ সেখানকার আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অসিত আবার বলিল, "ভেবে দেখ, আজ আমাদের কি শোচনীয় অবস্থা! শুধু তোমার-আমার কথা বলছি না,—দেশের নামে যারা যারা এ পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের সকলের কথাই বলছি,—ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় এসে পড়া গেছে, যেখানে সহায়-সম্পদ নেই, আশ্রয় নেই, কোনখান থেকে একটু সহানুভূতি বা দুটো স্নেহের কথা শোনবার আশা নেই। আত্মীয় স্বজন আশ্রয় দিতে ভয় পায়,—বন্ধু-বান্ধব দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়,—পাছে কোন বিপদে পড়তে হয়। ঘরে স্থান পাবার উপায় নেই,—পথে দাঁড়ালে পুলিশ পিছু নেয়,—বনের জন্তুর মত ঝোপ-ঝাড়ে, মাঠে-জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে অনাহারে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাতে হয়। দুঃখের অবধি নেই, তবু ত কেউ ফিরতে চায় না। সকল দুঃখ-কষ্ট মাথায় করে নিয়ে তারা নিজেদের লক্ষ্যপথে অবিরাম ছুটছে—একদিন দুদিন নয়—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এত বড় ত্যাগ, এত সহিষ্ণুতা, এত বড় মহৎ প্রেরণা তারা

কোথা থেকে পেয়েছে ? এ কি ভগবানেরই আদেশ নয় ? যাদের দিয়ে তিনি এই মহৎ কাজ সম্পাদন করবেন, তাদের এই অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তিনিই মানুষ করে তুলছেন। আমি বিশ্বাস করি— এবার ভারতে একটা যুগান্তর নিশ্চয়ই আসছে !"

পরেশ বলিল, "বিশ্বাস আমিও করি। তবে মাঝে মাঝে যেন কেমন একটা সংশয় জাগে,—হবে কি হবে না—এমনি একটা উৎকণ্ঠা। যাক্—তুমি উপস্থিত আমাদের অবস্থার কথা যা বল্লে, সেটা যে কত সত্য—এবার বাংলায় ঘুরতে ঘুরতে পথে, ঘাটে, ট্রেণে সর্ব্বত্র তার পরিচয় পাওয়া গেছে। যেখানেই যাই, প্রায় একই রকম কথা,— সর্ব্বত্রই একটা বিষম উৎকণ্ঠা, একটা উপেক্ষার ভাব। ফেরবার সময় ট্রেণে জনকতক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক এ দলের ওপর এমন সব মন্তব্য করতে লাগলেন—'দেশের বুকের উপর বসে দেশের লোকের উপরেই ডাকাতি ! একে খুন, তাকে খুন ! দেশে যত অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করা ! এদের উৎপাতে দেশের শান্তি—শৃঙ্খলা সব পণ্ড হবে। গবর্ণমেণ্টের উচিত সব ধরে ধরে কঠোর শাস্তি দিয়ে এ সব দল নির্ম্মূল করা' ইত্যাদি। আমি শুনে শুনে ভাবলুম—মন্দ নয়। আমরা তবে কার জন্যে প্রাণপাত করে এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে মরি ? দেশের স্বাধীনতা বলতে ত আর সত্যি দেশের বন জঙ্গল পাহাড় নদীর কথা বোঝায় না,—দেশবাসীর সুখ-স্বাধীনতাই ত আমাদের কাম্য বস্তু। তা দেশের লোকের ত আমাদের ওপর টান খুব প্রবল দেখছি। সুধীর বেচারা ছেলেমানুষ,—চেয়ে দেখি, দুঃখে অভিমানে ও-বেচারার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে ! আমি ভাবলুম, কেঁদেই ফেলে বা !" বলিয়া পরেশ সকৌতুকে সুধীরের দিকে তাকাইয়া হাসিল।

অসিত সস্নেহে বলিল, "সত্যি সুধীর ? ও সব কথা শুনে সত্যিই

তোমার এত কষ্ট হয়েছিল ? ও-সবদিকে আমাদের কাণ দিতে নেই। ভাই, এ দিকে আসতে হলে, মনকে খুব উঁচু স্বরে বাঁধতে হবে। আমরা যা সত্য বলে, নিজেদের কর্ত্তব্য বলে বুঝেছি, তাই একমনে করে যাব। তার নিন্দা বা প্রশংসা কিছুতে কাণ দেব না। এই হচ্ছে মোট কথা। গীতার উপদেশ মনে নেই ? অনাসক্ত—"

সুধীর বাধা দিয়া বলিল, "সে-সব আমার খুব মনে আছে অসিত-দা! তবে তুমি পরেশ-দার সব কথা বিশ্বাস কোরো না,—ও-বড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। এটা সত্যি যে, ও-সব কথা শুনে তখন আমার একটু আঘাত লেগেছিল। তারা যে-রকম গাল দিয়ে বলছিল—তুমি যদি শুনতে একবার! যাদের জন্যে আমরা এত করে মরছি, দুটো সহানুভূতির কথা ত তাদের কাছে পাওয়াই যাবে না; উল্টে গালাগালি! অসিত-দা, যেদিন দরকার হবে, সেদিন আমিও তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বুকের রক্ত দেব, এটা ঠিক কিন্তু ভাই! তোমার মত অত মনের বল আমার নেই। আমি মানুষ—সাধারণ মানুষের মতই এখনো আমার মনটা সুখ-দুঃখের অতীত হয়নি।"

অসিত গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি ঠিক বলেছ সুধীর! আমরা মানুষ। মানুষ সুখে-দুঃখে আশায় আকাঙ্ক্ষায় হাবুডুবু খায়,—আবার এই মানুষই জ্ঞানযোগে-যুক্ত হয়ে একদিন সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে পরম শান্তি লাভের অধিকারী হয়। যদি মানুষ হয়ে জন্মেছি, তবে সাধারণের মত ছোট গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যাব কেন ভাই? আকাঙ্ক্ষা মহৎ, উঁচু হওয়াই ভালো। আর দেশের লোক ত ও-কথা বলবেই। আমরা ব্যাপারটা যে-ভাবে দেখছি, ওরা ত এখনো সে-ভাবে দেখতে শেখে নি। ওরা শুধু ভাবে—আমাদের কাজের ফলে ওদের এই নিশ্চিন্ত আরামটুকু লোপ পাবে,—একটা ছন্নছাড়া কাণ্ড হবে। এই ভয়েই তারা আমাদের

ওপর খড়্গহস্ত। আর দেশের লোকের কথা ছেড়ে দাও,—ক্রমে আত্মীয়-স্বজনও আমাদের ছাড়তে বাধ্য হবে। তুমি এখনো ঘরের মধ্যে আছ,—ত্বদিন পরে এমন সময় আসতে পারে, যখন ঘরে আর তোমার ঠাঁই হবে না। আমাদের আপন-পর কোথাও কিছু নেই ভাই, আছেন শুধু মাথার ওপরে ভগবান্—আর নীচে আমাদের এই দেশ। এই ত্বটির মধ্যে আপনার জনের কথা ডুবিয়ে দাও,—দেশের লোক-মতের কথা বৃথা ভেব না; তা হলেই শান্তি পাবে। পরেশ, তোমার সেই গানটা স্থধীরকে একবার শুনিয়ে দাও ত।”

তখন সেই নীরব নির্জ্জন গঙ্গাতট মুখরিত করিয়া, নিস্তব্ধ সুপ্ত নৈশ প্রকৃতিকে সচকিত করিয়া পরেশের উচ্চ মধুর স্বর চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে' ভাবনা করা চল্‌বে না!
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে—
হয় তো রে ফল ফল্‌বে না—
তা বলে' ভাবনা করা চল্‌বে না।

৩১

কিরণের সহিত সেদিনের সাক্ষাতের পর হইতে ত্বই সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আর লীলার সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই।

কিরণ অধীর চিত্তে লীলার আহ্বানের অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু তাহাকে ডাকিবার কথা মনে হইলেই লীলা কাঁপিয়া উঠিত। সেদিনের পর হইতে তাহার সহিত আগের মত সহজ ভাবে দেখা

করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিরণও আর পূর্ব্বের মত অকুণ্ঠ-ভাবে তাহার কাছে আসিতে পারিত না।

দীর্ঘ দুই মাসের পর সেদিন লীলা বৈকালে ড্রয়িংরুমে নামিয়া আসিয়া বসিয়াছিল। বীণা তাহার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিল, ও মধ্যে মধ্যে অধীর ভাবে জানালার মধ্য হইতে পথের দিকে চাহিতেছিল।

সুস্থ হইবার পর হইতে লীলা বীণার মধ্যে একটা অত্যন্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত। তাহার পূর্ব্বের সে চাঞ্চল্য ও কৌতুকপ্রিয়তা অনেকাংশে ঘুচিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার চোখে-মুখে যে একটা ভোগ-বিলাসের ও অসার দম্ভের প্রখর দীপ্তি সর্ব্বদা বিরাজ করিত, তাহা লুপ্ত হইয়া একটি কোমল মধুর ভাব তাহার অপূর্ব্ব-সুন্দর মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লীলার রোগের সময় হইতে সে তাহার সমস্ত আমোদ-প্রমোদ ভুলিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—সাধ্যমত তাহার সেবা করিত। লীলা অনুতপ্ত মুগ্ধচিত্তে ভাবিত, এই বীণাকে সে এতদিন হৃদয়হীনা অসার-প্রকৃতি বলিয়া কত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, কত অবহেলা করিয়াছে।

দুই ভগিনীর আলাপের মধ্যে কুমার গুণেন্দ্রভূষণ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

"এই যে! আপনি আজ নেমে আসতে পেরেচেন!" কুমার অত্যন্ত বিনম্রভাবে লীলাকে নমস্কার করিয়া বীণার পার্শ্বে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। পরে লীলাকে উদ্দেশ করিয়া আবার বলিলেন—"কি চেহারাই হয়ে গেছে আপনার—ঠিক যেন ছোট পাখীটির মত! যাহোক্ ভালো হয়ে উঠেছেন যে, সেইটাই লাভ! যে ভয় আমাদের হয়েছিল!"

লীলা একটু হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিল।

কুমারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বীণার মুখ আগ্রহে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল—"জানো লিলি, তোমার অসুখের সময় ওঁর যে কি ভাবনা, আর কি ভয়, সে যদি দেখতে! বাড়ীতে স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না, সকালে চা খেয়েই এখানে এসে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত বসে থাকতেন। আবার ফিরে গিয়ে নাওয়া খাওয়া সেরে সেই যে চলে আসতেন, একবারে রাত দশটা পর্য্যন্ত! কতদিন বাড়ী যেতেই চাইতেন না,—মা কত বুঝিয়ে, কত করে পাঠিয়ে দিতেন। সারাক্ষণ ভেবে ভেবে অস্থির!"

"ভাবনা হবে না? সে কি সহজ কাণ্ডটি হয়েছিল, বীণা? আর তা ছাড়া, আমি এ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তোমাদের সুখ-দুঃখ ঠিক তোমাদের মতই সমান ভাবে আমি অনুভব করি। বাইরের লোকের মত একবার এসে খোঁজ-খবর নিয়ে চলে গেলে ত আমার মন বুঝতো না!" কুমার অত্যন্ত কোমল স্বরে বীণাকে কথাটা বলিয়া লীলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত আমার কিসে লেগেছিল জানেন? কেবলি আমার মনে হ'ত যে, যে-দিনই আমার সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হলো, তার দু'-ঘণ্টা না যেতে যেতেই কি সেইখানে সঙ্গে সঙ্গে এমন শক্ত অসুখ? তখনো ভালো করে একটা কথা পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে কইতে পারি নি, অথচ পিসীমার কাছে আপনাদের কথা শুনে পর্য্যন্ত আলাপ করবার জন্য এত আগ্রহ এত ইচ্ছা কতদিন থেকে মনে রয়েছে। নানা কার্য্য-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আসা আর হয়ে উঠছিল না। তা যদি বা অনেক কষ্টে কোন মতে আসা হলো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপার—কি জানি তখন কেমন আমার মনে হত যে, আমার সঙ্গে দেখা না হলে হয় ত আপনার এমন অসুখ

হতো না। অবশ্য এ-কথাটার কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। তবু সে সময় খালি ঐ কথাটা মনে হয়ে কেবলি আমার নিজের উপর বড় রাগ হতো!"

কুমারের সঙ্গে লীলার পরিচয় কেবল দু'তিন মিনিটের মাত্র, তবু তিনি এমন নম্র মৃদু ভাবে, এমন আত্মীয়তার ভঙ্গীতে কথাগুলি বলিলেন, যে, লীলা অপরিচিতের এত ঘনিষ্ঠতার অধিকার লওয়ায় বিরক্ত হইতে পারিল না।

সে বলিল—"আপনি আমার কথা ভেবে এত দিন কষ্ট পেয়েছেন, আমি তার কিছুই জানতুম না। সংসারে বন্ধুবান্ধব অবশ্য অনেক পাওয়া যায়, তবে প্রকৃত ব্যথার ব্যথী বন্ধু লাভ অনেক সৌভাগ্যের কথা। আপনাকে অকৃত্রিম বন্ধু রূপে পেয়ে আমিও খুব সুখী হলুম। এখন এখানেই ত থাকবেন কিছু দিন?"

"—সেই রকম ইচ্ছেই ত আছে। অবশ্য আবার সেখানে বিশেষ দরকার যদি না পড়ে। তা আপনি এখন বেশ সুস্থ আছেন ত মিস্ রায়? আর ত কোন রকম অসুখ নেই?"

লীলা বলিল—"অসুখ বিশেষ কিছু নেই,—এখন গায়ে আর একটু বল পেলেই বাঁচা যায়। অসুখের চেয়ে এই ঘরের মাঝে বন্দী হয়ে থাকাটা যেন আরো কষ্টকর হয়ে উঠেছে! কতকাল যে বাড়ী থেকে বেরোই নি, তা মনেই পড়ে না! মনে হচ্ছে যেন আজন্মকাল এমনি ঘরে বসেই কেটেছে!"

"—সত্যি! বাড়ীতে বসে বসে এমনি অস্বস্তিই ধরে বটে! আমি ত কাজকর্ম্মের সময় ছাড়া এক মুহূর্ত্ত বাড়ীতে বসে থাকতে পারি না। বড়দিনের সময় আমরা সকলে মিলে শিকারে যাব স্থির হয়েছে। এখানে শিকার আর কি—এই একটু বেড়ানো, আমোদ-আহ্লাদ, আর দু'-

একটা পাখী মারা—এই আর কি! মেয়েরাও কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে যাবেন ঠিক হয়েছে। তত দিনে আপনি যদি আর একটু সারেন, তা হলে আমাদের সঙ্গে বেরোবেন—আপনি ত খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারেন শুনেছি। খুব বেড়ানো হবে সমস্ত দিন—আপনার বেশ ভালোই লাগবে।"

"—দেখা যাক্, যদি পারি, নিশ্চয়ই যাব—ফাঁকা হাওয়ায় যাবার জন্যে আমার মন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।"

লীলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কিরণ মিসেস্ রায়কে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে প্রতিদিনই এই সময় তাঁহাকে ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরাইয়া দিতে আসিত। প্রতিদিনই তাহার আশা হইত, যদি লীলার সঙ্গে দেখা হয়। আজ তাহাকে দেখিয়া সে তাহার পাশে চেয়ার টানিয়া বসিল।

মিসেস্ রায় কুমারকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"এই যে গুণেন্দ্র! তুমি এখানে! ক্লাবে সকলে আমায় তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল! ওরা বলছিল, তুমি যে ক্লাবে যাওয়া, সকলের সঙ্গে দেখা-শুনা করা সবই ছেড়ে দিলে—ব্যাপারটা কি! তা আর যাও না যে?"

কুমার বলিলেন—"গিয়ে কি হবে বলুন? আমার ও-সব সঙ্গ আর ভাল লাগে না। যাদের সঙ্গ মন থেকে ভাল লাগে, সেইখানেই ঘুরে-ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়, সেইখানে বসেই সময় কেটে যায়—পাঁচ জায়গায় যাবার সময়ই বা কোথা?" কথাটা বলিয়া কুমার হাসিয়া বীণার মুখের দিকে চাহিলেন।

"—তা বেশ বাছা! যেখানে ভাল থাক সেখানেই থেক। লীলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?" বলিয়া মিসেস্ রায় প্রীতি-প্রফুল্লমুখে

বলিলেন—"গুণেনের সঙ্গে আলাপ করো লীলা! অমন গুণের ছেলে আর হবে না! কিরণ, বসো তোমরা, আমি কাপড় ছেড়ে এখনি আসছি।"

মিসেস্ রায় চলিয়া গেলে, লীলা কুমারের উদ্দেশে বলিল—"আপনারা বসুন, ঠাণ্ডা পড়ছে, আমি এবার ঘরে যাই।"

কিরণ তখন বলিল, "তুমি বেড়াতে যাবার কথা বলছিলে না? কবে একটু বাইরে যেতে পারবে বলো? তা হলে আমি বিকেলে এসে তোমায় নিয়ে যাব!"

লীলার মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস জমিয়া উঠিল! কিরণের সঙ্গে একা বেড়াইতে যাইবার কথায় আজ আর সে সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বীণা বলিল—"আজ সকালে বাবা বলছিলেন, কাল থেকে আমাদের ক্লাবে ছেড়ে দিয়ে তিনি লিলিকে সন্ধ্যেবেলা একটু করে বেড়িয়ে আনবেন। ডাক্তার মত দিয়েছেন।" তার পর সে একটু হাসিয়া আবার বলিল—"জানেন কিরণ বাবু! অসুখের পর থেকে বাবার যত টান সব লিলির উপর! আমার কথা আজকাল তাঁর একবারও মনে পড়ে না!"

কিরণ হাসিয়া বলিল—"তাই না কি? এটা ত তাঁর বড় অন্যায় পক্ষপাত বলতে হবে! আচ্ছা! এবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি এ কথা বোলবো তাঁকে। তা হলে আমি কাল বেলা চারটের সময় এখানে আসবো কি লিলি? যেতে পারবে ত?"

লীলা বলিল—"তাই এসো! বাবুকে আমি বলে রাখবো, তিনি তাতে খুসি হবেন। আমি এখন কতকটা বল পেয়েছি। গাড়ীতে তোমার সঙ্গে যেতে কষ্ট হবে না বোধ হয়।"

রাত্রে একা বিছানায় পড়িয়া লীলা নিজের ভাবনা আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। কিরণের সঙ্গে যখন তাহার কোন সম্বন্ধ হইবার উপায় নাই, তখন আর এ-ভাবে তাহার সঙ্গে মেলামেশা করিয়া মনকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। এ কয়দিন সে নিজের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করিয়াছে, কিরণের কথা ভুলিয়া অরুণকে ভাবিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সবই বৃথা! কিরণের সেই আবেগময় কণ্ঠস্বর, তাহার সেই অনুরাগদীপ্ত অনিমেষ দৃষ্টি, প্রেমপূর্ণ মধুর কথা লীলা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। কিরণের একাগ্র প্রশান্ত দৃষ্টি তাহাকে বলিয়া দিত, সে তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু লীলা যে নিশ্চিতই জানে তাহার এ অপেক্ষা বৃথা—অরুণের উপর সবই নির্ভর করিতেছে। অরুণ ত কোন দিনই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। কিরণের জন্য বেদনায় দুঃখে অনুক্ষণ তাহার প্রাণ কাঁদিতেছিল। যাহার সঙ্গে মিলন তাহার কাছে স্বর্গ-সুখেরও অধিক প্রার্থনীয়, কর্ত্তব্যের খাতিরে তাহাকে ছাড়িয়া হয় ত অরুণকে বিবাহ করিতে হইবে,—অরুণের সাধ্বী সেবাপরায়ণা পত্নী হইতে হইবে!

কিন্তু তবু যখন তাহার সেদিনের কথা মনে পড়ে, তখন যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা পুলকের শিহরণ তড়িতের মত বহিয়া যায়! তাহার অন্তর দুর্নিবার আনন্দের বন্যায় ভাসিয়া যায়! কিরণ—কিরণের মত অসাধারণ লোক তাহাকে ভালবাসে!

মনের এই অদম্য আবেগ ভুলিয়া কিরণকে পূর্ব্বের মত কেবলমাত্র বন্ধুভাবে ভাবিবার জন্য লীলা প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুঝিতেছিল। সে অপরের নিকট বিবাহ-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ—কিরণের প্রতি মনের এ-ভাব তাহার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত—এই চিন্তা তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চিত্তকে

নিয়ত পীড়া দিত, অথচ সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ একা ঘরে পড়িয়া পড়িয়া সে এ-চিন্তা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না।

সেদিন ক্ষান্ত একটু সকাল সকাল শুইতে আসিল। লীলাকে জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল—"এই যে তুমি এখনো জেগে আছ? আমি তাই একটু সকাল করে এলুম—বলি—তুমি যদি আবার ঘুমিয়ে পড়!"

লীলা বুঝিল—ক্ষান্ত আজ কোথা হইতে নূতন কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সে বলিল—"কেন—এত রাত্রে তোর আবার আমার সঙ্গে কি দরকার পড়লো?"

"—দরকার এই যে বলি।" বলিয়া ক্ষান্ত সেইখানে বসিয়া পড়িল—তাহার পর বিষম উত্তেজিত ভাবে আরম্ভ করিল—"হ্যাঁ গা দিদিমণি! তোমাদের এ কেমন ধারা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড বল দেখি? একে ত এই সব সোমত্ত সোমত্ত মেয়ে দিবে-রাত্তির যত পুরুষমানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেচে বেড়ানো! তার উপর ওই যে সব মড়ুইপোড়ারা এখানে ধেই ধেই করে নাচতে আসে, তাদের একটু দেখে শুনে খবর নিয়েও কি আনতে নেই? যে সে এসে ঘরে ঢুকলেই হলো? গড় করি বাছা! তোমাদের পায়ে আর তোমাদের মা-বাপের পায়ে! এমন কাণ্ড আমার বাবার জন্মে কখনো দেখিও নি—দেখবোও না—ছি! ছি! ছি! ছি! লজ্জায় ঘেন্নায় আমার যে মরতে ইচ্ছে করছে!"

লীলা বলিল—"এই! আজ আবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে দেখছি! কি হয়েছে কি? সেইটা আগে বল্ না—মরতে ইচ্ছে হয়, তার পরে মরিস্ এখন! অমন করে বকে মরছিস্ কেন?"

"—বকে মরছি কেন? তোমাদের যা রীত্‌চরিত্তির হচ্ছে—তাই দেখে দেখে থাকতে পারিনে—বকে মরি—বলি—আজ বিকেলে

তোমাতে আর বড় দিদিমণিতে বসে যার সঙ্গে গল্প করছিলে—সেই যে গো খুব টক্‌টকে রং—দু-হাতে হীরের আংটি জ্বল্ জ্বল্ করছে—সেই মুখপোড়া মিন্সে এখানে এসে ভাল মানুষের মত কোথা থেকে জুট্‌লো বল ত? বদমাইসের ধাড়ি—শয়তানের বাচ্ছা—ঘাটের মড়া—সাত-ঘর মজিয়ে—”

লীলা ক্ষান্তর গালাগালির উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া অত্যন্ত রাগিয়া বলিল—“আরে মর্! তোর যে বড় বাড় বেড়েছে দেখছি! মুখ সাম্‌লে কথা বলতে পারিস্ না? যত কিছু না বলি—ততই আস্পর্দ্ধা দিন দিন বেড়ে উঠছে! ভদ্রলোকের ছেলেকে তুই অমন করে গাল দিস্ কোন্ আক্কেলে?”

“—ভদ্দর লোক! ওর সাত-পুরুষে কেউ ভদ্দর লোক নয়! পয়সা থাকলেই কি ভদ্দর লোক হয় গা? ও অমনি করে লোকের ঘর মজিয়ে বেড়ায়! সেই যে গো—তোমায় বলি নি? ওই মুখপোড়াই ত সেই ডেপুটি বাবুর ভাইয়ের বউকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে! এখন সে ছুঁড়ীর খোয়ারের অন্ত নেই! তার দিকে একবার ফিরেও চায় না—সে দাসীদের মহলে দাসীদের কাছে পড়ে আছে।”

লীলা চমকিয়া উঠিল। ক্ষান্ত এ কি বলিতেছে! কুমার গুণেন্দ্র-ভূষণ! কুমার সেই শোচনীয় কুৎসিত কাণ্ডের নায়ক? অকস্মাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে নিজে কুমারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয় বটে, তবে যেটুকু সে তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানের পাত্র বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। আর আজ সন্ধ্যার সময় সে তাহার নিজের বাড়ীতে কুমারের যে আদর ও মান্য দেখিয়াছে, তাহাতে তাহার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই। কুমার যে-কোন

ভদ্র-পরিবারে এ-ভাবে মিশিবার উপযুক্ত-পাত্র, তাহার এ ধারণ
হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষান্ত তাঁহার সম্বন্ধে এ-সব কথা কি বলে? ে
কিছু বুঝিতে পারিল না, অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিল—"তুই এ-কথ
জানলি কি করে? উনি আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু, সম্প্রতি
কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন—উনি ত এখানে থাকে
না। ওঁর নামে এ-সব কথা কে বলেছে তোকে? আর জোছনাকে
যে নিয়ে এসেছে—তুই কি তাকে চিনিস্ যে এ-কথা বলতে
এসেছিস্?"

ক্ষান্ত হাত নাড়িয়া বলিল—"আমি তাকে চিনবো কোথা থেকে?
আমাদের সাতপুরুষে কেউ কখনো অমন দুষমনের ছায়া মাড়ায় না।
আমার ধারে এলে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে গায়ের ছাল-চামড়া তুলে দেবো
না? বয়েস যখন আমার অল্প ছিল, তা গৌর বর্ণ না হই কালো-
কোলোতে একটা ছিরি ছিল ত? মাথায় এই এক মাথা মিশ
কালো চুল হাঁটুতে এসে পড়তো, তা গাঁয়ের এক মিন্‌সে গয়লা—"

নীলা ধমক দিয়া বলিল—"ফের! ওই সব আষাঢ়ে গল্প বানাতে
বস্‌লি? যা বল্‌ছি—এক কথায় তার জবাব দে! একটি বাজে
কথা নয়! বল্—তুই ওঁকে চিন্‌লি কি করে?"

"—বাবা! মেয়ে যেন ঘোড়সওয়ার! মেজাজ অষ্ট পহর তেরিয়া
হয়েই আছে! বলি—আমি ওকে চিন্‌বো কোত্থেকে গা? আমি
যদি চিনতুম, তা হলে এই যে তোমার অসুখের সময় থেকে ও এসে
এখানে জমিয়ে বসেছে, যখন-তখন আসছে-যাচ্ছে, বড় দিদিমণির
সঙ্গে দিবে-রাত্তির ফুসফুস গুজগুজ করছে, এ-সব কি হতে পারতো?
মা ত একেবারে ওর নামে গলে পড়ছে। বড় দিদিমণিও তাই!
আমি বলি কে না কে—বড়দিদির সঙ্গে বিয়ে হবে বুঝি? আজ না

কি আমার বোন—সেই যে গো—যে জোছনার কাছে আছে—সে সহরে এসেছিল—তা একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখে—না—বাইরের ঘরে তোমাদের সঙ্গে সে দিব্যি বসে গপ্প করছে! বামা তো দেখে অবাক্! বলে—এ শয়তানটা আবার তোদের এখানে জুটলো কি করে? ভয়ে সে তো আর দাঁড়ালো না, তোমাদের ওই রাজপুত্তুর যদি বামাকে এখানে দেখতে পেতো, তা হলে কি আর ওকে জোছনার কাছে থাকতে দিত? বাড়ী গিয়েই হয় তাকে দেশছাড়া করতো, না হয় আটক করে রাখতো—কথা জানাজানি হবে বলে!"

লীলা স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। কুমারের সহিত বীণার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা আজ সে বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিয়াছে। তাহার পিতামাতা কখনো এ-সম্বন্ধে বাধা দিবেন না। তাহার নিজেরও এ ঘটনা কিছু বিসদৃশ ঠেকে নাই। কিন্তু ক্ষান্তর বর্ণিত ব্যাপার যদি সত্য হয়, সত্যই যদি বাহ্যিক ভদ্রতা ও শীলতার আবরণের ভিতরে কুমারের এইরূপ জঘন্য চরিত্র হয়, তাহা হইলে বীণাকে সময় থাকিতে সাবধান করা উচিত,—এ ঘনিষ্ঠতা আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়! এখন কুমারের সম্বন্ধে আরও ভালরূপে সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

লীলাকে নীরব দেখিয়া ক্ষান্ত আবার বলিল—"বলি সংসারটা কি কেবল পাজি-বদমাইসদেরই আড্ডা গো দিদিমণি? দয়া ধম্ম বলে কি একটা জিনিস নেই? দিন-রাত্তির এখনো সত্যি-যুগের মতই হচ্ছে! এখনো চন্দর-সূয্যি উঠছে! মুখপোড়ারা কি ভাবে যে চার পো্য়া কলির রাজত্বি আরম্ভ হয়েছে? অমন কচি মেয়েটা—কোন দুঃখু জানতো না—কিছু বুঝতো না—হেসে খেলে বেড়াত—তাকে তার ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে এই খোয়ার! ছুঁড়ি এখন

খায় না—নায় না—শুকিয়ে শুকিয়ে মরতে বসেছে—আর দিবে-রাত্তির অঝোর ঝরে কাঁদছে! সে আর কদ্দিনই বা বাঁচবে বল ত?"

লীলা সহসা অন্তরে দারুণ আঘাত বোধ করিল। অভাগিনী জোছনা! তাহার কি পরিণাম হইবে! বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কুমার এখন তাহার সম্বন্ধে এমন উদাসীন হইয়াছে—তাহা সে বুঝিল। জোছনার সম্বন্ধে লীলার পক্ষে উদাসীন থাকা অসম্ভব—কিন্তু লীলা তাহার কি ভাল ব্যবস্থা করিতে পারে?

লীলা বলিল—"সে লোকটা কি জোছনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না?"

"—ওরা আবার কোন্ কালে ভাল ব্যাভার করে গা? ওদের আদর এই ত্বদিন। সে বাড়ী থাকেই বা কখন্? এই ছু' মাস ত দেখছি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এখানেই কাটাচ্ছে! আমার বোন বলে—রাত্তিরে কতকগুলো এয়ার বন্ধু নিয়ে অর্দ্ধেক রাত ইস্তিক বাইরের ঘরে মদ খেয়ে হল্লা করে, তার পর সেইখানেই ঘুমোয়! সে ছুঁড়ির ধারেও যায় না কোন দিন। ওর বউ ওর জালায় বিষ খেয়ে ম.েছে, এই জোছনাও মরে কোন্‌দিন! আরো কত জায়গায় কত কীর্ত্তি করেছে—তা কে জানে? এবার আমাদের বড় দিদিমণিকে নিয়ে পড়েছে!"

লীলা শিহরিয়া উঠিল! কুমারের হাতে পড়িলে বীণারও এই পরিণাম অনিবার্য্য! সে আর কিছু ভাবিতে পারিল না—তাড়াতাড়ি বলিল—"তুই চুপ কর ক্ষান্ত! এ-সব কথা আর মুখে আনিস্ নি। আমি ওদের সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা ভাল ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তোর যে রকম স্বভাব—তোকে বারণ করে দিচ্ছি—খবরদার যেন এ-সব কথা কোথাও গল্প করে বেড়াস নি। যা করতে হয়—সব আমি নিজে কোরবো। কারু কাছে এ-কথা এখন প্রকাশ না হয়।"

ক্ষান্ত বলিল—"না গো না! আমার অমন হালকা স্বভাব নয়—যে যাকে তাকে সব কথা গপ্প করে বলতে যাব। সে সব আক্কেল আমার যথেষ্ট আছে। তুমি কিন্তু দিদিমণি—যেমন করে পার—ঐ লোকটাকে এখান থেকে তাড়াও। ওর ছায়া মাড়ালে পাপ হয়। আর যদি পার, তো—সে ছুঁড়ির একটা হিল্লে করো। বামা তাকে হাতে করে মানুষ করেছে—তার দুর্গতি দেখে এখন সেও তার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে।"

৩২

পরদিন বৈকালে কিরণ মোটরে করিয়া লীলাকে তুলিয়া লইতে আসিল। লীলা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া ছিল,—কিরণের আগমন-সংবাদ পাইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল, ড্রয়িং-রুমে—বীণা ও কুমার গুণেন্দ্রভূষণ!

কুমার লীলাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসিলেন। সহাস্যে নমস্কার করিয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—"আজ আপনাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। খানিকটা বেড়িয়ে এলে শরীর আরো সুস্থ বলে মনে হবে!"

লীলা কোন উত্তর না দিয়া একটু হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিল। আজ দিনের আলোয় কুমারের প্রতি সে একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত চাহিয়া দেখিল—তাঁহার আকৃতি যথার্থই মনোরম—আচরণ ব্যবহার অত্যন্ত নম্র ও ভদ্রতাপূর্ণ—কিন্তু তাঁহার চক্ষের দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল—লীলা সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

গাড়ি ক্রমশঃ সহরের সীমা ছাড়াইয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও আম-বাগানের মধ্য দিয়া চলিল। বহু দিন পরে মুক্ত বাতাসে ও প্রকৃতির

নয়নাভিরাম মুগ্ধকর হরিৎ দৃশ্যে লীলার দেহ-মন যেন জুড়াইয়া গেল। সে উৎফুল্ল নেত্রে কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি সুন্দর সব মনে হচ্ছে আজ!"

কিরণ তাহার প্রীতিফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তাহলে রোজ এমনি সময় আমরা এদিকে বেড়াতে আসবো, কেমন? সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে যাব, যাতে তোমার ঠাণ্ডা না লাগে। তাহলে আর কেউ বারণ করবেন না।"

—"তাই আসা যাবে! আঃ! এত ভাল লাগছে! মনে হচ্ছে, এমন ফাঁকা হাওয়ায় জীবনে আর কোন দিন বেরোই নি!" বলিয়া লীলা একটু থামিয়া বলিল—"কিরণ! কুমারকে তুমি ভাল রকম চেন কি? ওঁকে তোমার কিঁ রকম লোক বলে মনে হয়?"

কিরণ একটু ভাবিয়া বলিল—"আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ নেই—সামান্য পরিচয় আছে মাত্র। অবশ্য ভদ্রলোকের সম্বন্ধে না জেনে-শুনে কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে আমার কি জানি কেন ওঁকে বড় একটা ভাল লাগে না—মনে হয়, যেন সর্বদাই লোকটা একটা মুখোস পরে' বেড়াচ্ছে!"

লীলা বলিল—"তুমি ঠিক ধরেছ কিরণ! কুমার লোক মোটেই ভাল নয়! আমি অসুখ থেকে ওঠবার পরে দেখছি—বীণা তার সঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রায় মিশ্‌ছে। মাও তাকে খুব প্রশ্রয় দিচ্ছেন! বীণার জন্য আমার এত ভাবনা হচ্ছে!"

লীলা কিরণকে জোছনার কথা ও ক্যান্তর মুখে কুমার সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছিল, সমস্তই একে একে বলিয়া গেল।

তাহার পর বলিল, "এখন সে মেয়েটার কি দশা হবে বলো? ও যে-রকম লোক, তাতে আর দু-দশ দিন পরে হয় ত তাকে রাস্তায়

তাড়িয়ে দেবে। তখন তার কি গতি হবে? আমি ত এ-কথা শুনে পর্য্যন্ত তার জন্য ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছি! বীণার সঙ্গে কুমারের দেখা-শুনো বন্ধ করে দিলেই চলবে, কিন্তু জোছনার কি করবো?"

কিরণ সমস্ত শুনিয়া বহুক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"এ-সব অত্যন্ত কুৎসিত বিষয় লিলি! এর মধ্যে তোমার নিজের গিয়ে কাজ নেই। এ-সব ব্যাপার সংসারে অহরহ ঘটছে। তুমি এ-সব কিছু জান না—নতুন একটা আজ শুনেছ—তাই মনে এত লাগছে। ও নিয়ে বৃথা ভেবে কি হবে?"

লীলা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"এটা কিন্তু তোমার উপযুক্ত কথা হলো না কিরণ! তুমি এ-কথা বলবে—আমি তা আশা করি নি। একটা নিতান্ত অল্প বয়সের মেয়ে,—যে সংসারের ভাল-মন্দ কিছুই বোঝে না—তাকে একটা পাষণ্ড জোর করে টেনে এনে রাস্তায় দাঁড় করালে—তার সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে; এক—আত্মহত্যা করে মরা; আর এক আরও অবনতির পথে নেমে যাওয়া। আমি নিজে নারী হয়ে নারীর এই চরম দুর্গতি দাঁড়িয়ে দেখবো, অথচ তার জন্য কোন-কিছুই করতে পারবো না—এ আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। আজ সকালে বাবার কাছে এ-কথা তুলে মেয়েটার বিষয় কি করা যায়, জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও ঠিক তোমার মতই বিরক্ত হয়ে বল্লেন—এ-সব লজ্জাকর বিষয় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি? একটা মানসম্ভ্রম নেই? সত্যি—তোমাদের কাণ্ড দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি!"

কিরণ লীলার অভিমানপূর্ণ কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে সঙ্কোচের সহিত বলিল—"তুমি কিছু মনে করো না লিলি! এই সব ইতর কাজের মধ্যে তোমার কোথাও

কোন সংস্রব আছে, এ চিন্তা পর্য্যন্ত আমায় বড় আঘাত ক[illegible]। সেই জন্য তোমাকে বারণ করেছিলুম। আর তা ছাড়া, তুমি [illegible]ার জন্য কিই বা করতে পারো? তার আত্মীয়স্বজন, এমন কি তার মা-বাপ পর্য্যন্ত, এ ঘটনার পর আর তাকে ঘরে স্থান দেবে না। তুমি নিজে তাকে এনে তোমার ঘরে রাখতে পারবে না; কারণ, তাহলে তোমাদের সমাজেও অত্যন্ত কুৎসিত চর্চ্চা আরম্ভ হবে,—তোমাদের সঙ্গে কেউ তাদের মেয়েদের মিশতে দেবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছো, সাধ করে একটা অনর্থ ঘটাবার জন্য তোমার মা, কিম্বা আর কেউ তাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হবেন না। তার পর, আমাদের দেশে এ-রকম মেয়েদের জন্য, এখনো সে-রকম কোন আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি, যেখানে এই সব লাঞ্ছিতা নারীরা আশ্রয় পাবে। তা-হলে বল, তুমি তার জন্য আর কি করতে পারো?"

লীলা অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া নিরাশ ভাবে বলিল, "তবে কি তার কোন উপায়ই [illegible] না কিরণ? এই ভাবে মেয়েটা তবে কি একেবারেই অকূলে ভেসে যাবে?"

কিরণ বলিল—"কেবল একটি মাত্র উপায় আছে। এখানে খ্রীষ্টান মিশনরিদের মেয়েদের জন্য যে মিশন আছে, যদি তাকে সেইখানে দিয়ে আসতে পারো, তা হলে তাদের কাছে সে আশ্রয় পাবে। সেখানে তারা তাকে ভাল ভাবে রাখবে, লেখাপড়া বা অন্য যে-কোন রকম শিল্প কাজ, যা সে শিখতে চায়, তাই তাকে শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে দেবে। যতদিন সে নিজের খরচ নিজে উপার্জ্জন করে চালাতে না পারে, ততদিন তার সমস্ত ভার মিশনের উপর থাকবে। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আমি ত আর কিছু দেখতে

পাই না। তোমার সঙ্গে ত সেখানকার বড় মেমের আলাপ আছে ?"

লীলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল—"তা যেন আছে। কিন্তু এটা কি-রকম কথা হলো ? আমাদের নিজেদের সমাজে, আমাদের ঘরের মেয়েরা অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে পথে পথে ফিরবে, মানসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে পেটের দায়ে হীন ব্যবসা করতে বাধ্য হবে, আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো, অথচ তাদের মুখে এক মুঠো অন্ন বা একটু আশ্রয় দিতে চেষ্টা করবো না, আর সেই ব্যবস্থা করবে কি না—একদল বিদেশী বিধর্ম্মী সম্প্রদায়—যাদের সঙ্গে তাদের কোন দিক থেকে কোন সম্বন্ধ, কোন যোগাযোগ নেই ? কি চমৎকার ব্যবস্থা ! আমি কোন্ মুখে সেখানে গিয়ে মিস্ নেল্‌সনকে এ-কথা বোল্‌বো ?"

কিরণ গম্ভীর মুখে বলিল—"এটা আমাদের পক্ষে বাস্তবিক বিষম লজ্জার কথা লীলা ! কিন্তু যা সত্য কথা—তা তো বল্‌তে হবে ? শুধু এই একটা কেন—এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। আমাদের দেশের—যাদের আমরা ইতর বলে, অস্পৃশ্য বলে ঠেলে সরিয়ে রেখেছি, দুর্জ্জয় গলিত ব্যাধিগ্রস্ত বলে যাদের কাছে এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দি, ওরা সেই সব অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতকে সুশিক্ষিত ও উন্নত করে তোলবার জন্য কি পরিশ্রম, কি চেষ্টাই না করছে ; সেই সব সংক্রামক রোগগ্রস্তদের জন্য আশ্রম স্থাপন করে, তাদের সুস্থ করবার জন্য, একটু আরামে রাখবার জন্য কি জীবনব্যাপী সেবা ও যত্ন যে করছে, সে কথা বলবার নয়। কিন্তু যাক্ এ কথা। তোমায় আমি বলছি—যদি সত্যিই সে মেয়েটিকে একটা ভাল জায়গায় রাখতে চাও, তবে তাকে মিস নেল্‌সনের কাছে দিয়ে এসো।"

লীলা বলিল—"তাই যাব। যখন এ ছাড়া আর অন্য কোন

উপায় নেই, তখন যেতেই হবে। বেলা পড়ে এলো—এস আজকের মত বাড়ী ফেরা যাক্।"

ফিরিবার মুখে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিরণ বলিল—"অরুণ তোমার জন্ত বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে লিলি! আর তাকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে শান্ত করে রাখতে পারছি না। এর মধ্যে যাবে এক দিন তার কাছে?"

লীলা বলিল—"আমি আর দু-এক দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি তাকে বোলো। আর এবার গিয়ে তাকে সব কথা খুলে বোলবো স্থির করেছি। তার পর সব শুনে সে যা বল্‌বে—"

লীলা কথাটা শেষ না করিয়া মুখ নত করিল। কিরণ ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমার আর কিছুই বলবার নেই লীলা! তোমার অসুখের এই দুমাস নিয়ত তার কাছে থেকে থেকে আমি বুঝেছি—সে তোমায় কি আত্মহারা হয়ে ভালবেসেছে। তোমায় হারালে সে বুঝি আর প্রাণে বাঁচবে না! সে আমার বড় প্রিয়, বড় আদরের বন্ধু। তার উপর, এখন সে অসহায় অন্ধ। আমি বরং দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ দেব, তবু তোমায় তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবো না। তবে যদি সে নিজে—যাক্‌গে—সে-কথা ভেবেই বা আর কি হবে। আমি ত সে-দিন আমার সব কথাই তোমাকে বলেছি। আমার জীবন সম্পূর্ণ ভাবে তোমার। তোমাকে পাই, না পাই, এর পরিবর্ত্তন কোন দিনই হবে না।"

দুই দিন পরে রাত্রি এগারটার সময় লীলার শয়নকক্ষে লীলা ও বীণা কথা বলিতেছিল। বাড়ীর সকলেই তখন নিদ্রিত, কেবল কান্ত সেদিন তখনো শুইতে আসে নাই।

বীণা বলিতেছিল—"কথাটা তোমার কাছে না বলে থাকতে পারছিলুম না লিলি। আমি যে মনের মধ্যে সব সময় কি একটা আনন্দ, কি তৃপ্তি বোধ করছি, সে তোমায় বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে পারবো না ভাই! তাঁকে ভালবেসে মন আমার শান্তিতে আনন্দে ভরে গেছে! যখন তিনি কাছে না থাকেন, ততক্ষণ আমি আর কোন বিষয় ভাবতে, কোন কাজে মন দিতে পারি না। কেবল তাঁর কথাই থেকে থেকে মনে পড়ে—আর অধীর হয়ে উঠি। কিন্তু যখন তিনি আসেন, আমার যেন তখন সব কথা হারিয়ে যায়,—তাঁর মধ্যে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তিনি কথা বলেন—আমি শুধু অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কেবল শুনি, আর মনে হয়, তাঁর কথা যেন শেষ না হয়। এ যে কি তীব্র সুখ—সে আমি তোমায় কি করে বোঝাবো? তুমি সুখী হয়েছ লিলি?"

লীলা উত্তর দিতে পারিল না। বীণার প্রেমে পুলকে ঝলমল মুখখানির দিকে একবার ব্যথিত ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া চক্ষু নত করিল।

বীণা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিল—"কুমারকে দেখবার আগে আমি কোন দিন কারুকে ভালবাসি নি ভাই! চিরকাল সকলকে নিয়ে কেবল খেলা করে, আমোদ করে বেড়িয়েছি। তুমি ত সবই জান, আমি চঞ্চল স্বভাবের বলে তুমি কতদিন আমাকে কত কথা বলেছ, কত বুঝিয়েছ। তখন শুধু পুরুষদের ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই আমার প্রধান আমোদ ছিল। আমি নিজে কোন দিন কারুকে ভালবাসি নি। এখন সে সব কথা মনে হলে লজ্জা হয়। একটা বড় জিনিষ মনের মধ্যে পেয়ে, আমার আগেকার সব চাঞ্চল্য, সব ক্ষুদ্রতা কেটে গেছে ভাই! আমি যেন মনে প্রাণে নতুন মানুষ হয়ে গেছি। তাই আমি ভাবতুম, কত

দিনে তুমি ভাল হয়ে উঠবে—কত দিনে তোমায় এ-সব কথা খুলে বলতে পাব। মা বলেছেন—শীঘ্রই আমাদের এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে যাবে। তুমি খুসী হয়েছ লিলি?”

লীলা এবার বলিল, “আমি যদি খুসী হতে পারতুম,—অন্তর্যামী জানেন, তার চেয়ে সুখের বিষয় আমার কাছে আর কিছু থাকতো না দিদি!”

বীণার মুখ শুকাইয়া গেল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“কেন লিলি—ও কথা বল্লে কেন ভাই? কি হয়েছে?”

লীলা বলিল—“আমার বলবার অনেক কথা আছে দিদি! কিন্তু কি করে যে বলবো, আমি সারাক্ষণ সেই কথাই ভাবছি। আমি তোমাকে বড় ব্যথা দিতেই এসেছি ভাই!”

বীণা সভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া তাহার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

লীলা ম্লান মুখে আবার বলিল—“কিন্তু সে-কথা যে বলতেই হবে—দিদি! তুমি বড় প্রতারিত হয়েছ—কুমার মোটেই ভাল লোক নয়! সে চরিত্রহীন, লম্পট, মাতাল। সে তোমার সঙ্গে মেশবার উপযুক্ত নয়—”

বীণা ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“ও-কথা বোল না লিলি! কুমার—ওঃ! অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুমি তাঁকে জানো না—তাই ও-কথা বল্‌তে পারলে! কে এ-সব তাঁর নামে মিছে করে রটালে?”

“—মিছে নয় ভাই! সব সত্য! তার প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেয়ে কি আমি তোমার কাছে এ-কথা বলতে পারি? আমি খুব ভাল করেই সন্ধান নিয়েছি। ওর স্ত্রী ওর অত্যাচারের জ্বালায় বিষ খেয়ে মরেছে—”

বীণা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"ওর স্ত্রী? কুমার কি তবে বিবাহিত?"

লীলা বলিল—"শুধু বিবাহিত নয়—ওর যে এ-রকম আরও কত কীর্ত্তি আছে—তা বলা যায় না। এবার থেকে আর তুমি ওর সঙ্গে দেখা ক'র না। যদি আসে, তা হলে যা বলবার—তা আমিই বলে দেবো। কোন ভদ্রসমাজে ও লোকটা মেশবার উপযুক্ত নয়। ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত—"

বীণা উন্মাদিনীর মত আকুল হইয়া বলিয়া উঠিল—"না! লিলি! না—এমন করে তাঁকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ো না—আমি মরে যাব তা হলে! সত্যই মরে যাব! আমি নিজে তাঁকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবো! আমি যে এ-সব কথা বিশ্বাস করতে পারছি না! এ কি কখনো হতে পারে? আমি দুমাস ধরে নিয়ত তাঁকে দেখছি যে! লিলি! নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে কিছু,—তিনি কখন এমন হতে পারেন না!"

লীলা গম্ভীর মুখে বলিল—"ভুল যদি হতো, তা হলে আমি যে কত সুখী হতুম, তা তুমি জান না। আমারও ত তাকে খুব ভালই লেগেছিল। কিন্তু তা ত নয়! এই সম্প্রতি ও একটি ছোট মেয়ের কি সর্ব্বনাশ করেছে—শোন—"

লীলা জোছনার কথা একে একে সবিস্তারে বলিয়া গেল। তাহার পর বামা এখানে আসিয়া কি করিয়া তাহাকে চিনিয়া গেল, সব বলিয়া শেষে বলিল—"এখনো কি কিছু অবিশ্বাসের কারণ আছে? বামা তাঁর বাড়ীতে থেকে রোজ দেখছে—সে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত মাতাল হয়ে কাটায়। আর এর চেয়ে কি প্রমাণ চাও? বল ত ক্ষান্তর বোনকে ডেকে তোমার সামনে সব জিজ্ঞাসা করি।"

বীণা সমস্ত শুনিয়া সর্পাহতের মত বিবর্ণ মুখে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

লীলা বলিতে লাগিল,—"আমি যখন প্রথম এ-কথা শুনলুম, তখনি জানি যে, এ ঘটনায় তোমার কত বড় আঘাত লাগবে। তাই আমি কোন কথা প্রকাশ না করে, ভাল করে তার বিষয় সন্ধান করেছি। তোমায় যে-সব কথা বলেছি, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এর পর আর তোমার তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কাল বিকেলে তুমি ড্রয়িংরুমে নেমে যেও না—অন্ততঃ সে আসা পর্য্যন্ত তোমার ঘরেই থেকো। আমি তার জন্য নীচে অপেক্ষা করবো। সে এলে, যা বলবার সব আমিই বলে, এ অপ্রীতিকর বিষয় একবারে শেষ করে ফেলবো। আমি চাই, আর যেন তোমার সঙ্গে তার দেখা না হয়।"

বীণা আবার অস্থির হইয়া উঠিল—সে কিছুতেই লীলার এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না। সে বলিল—"সে কিছুতেই হবে না লিলি! যদি বলতেই হয় এ-কথা, তা হলে আমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। আমারই তাঁকে বলবার একমাত্র অধিকার। তুমি এর মধ্যে কোন কথায় থেকো না। তুমি যে রাগী, হয় ত কি কথায় কি বলে বসবে, আর তিনি কখনো এ-মুখো হবেন না। যদি এ-সব কথা সত্যই হয়, তা হলেও আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটবার পর আর যে তিনি এ-পথে কখনো যাবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে। আমায় তিনি সত্যই অত্যন্ত ভালবেসেছেন।—তুমি ত জান লিলি! মানুষ ভালবাসলে তার মধ্যে কত বড় বড় পরিবর্ত্তন হয়ে যায়, আর তিনি বদ্‌লাবেন না, এ কি কখনো হতে পারে?"

লীলা বলিল, "তিনি তোমার মত আরো অনেককেই ভাল-বেসেছেন, আরো অনেককে বাসবেন,—তার জন্য কোন চিন্তা কোর না। উপস্থিত তোমার সম্বন্ধে আমি যা বলছি, এইটিই সব চেয়ে

ভাল কথা। এতে কোন গোলযোগ হবে না, তোমারও মর্য্যাদার কোন হানি হবে না, কারণ, আমার বিশ্বাস, আমার মুখ থেকে কোন কথার আভাস পাবামাত্র সে নিজের মানের দায়েও এখান থেকে সরে পড়বে। সে বিদেশী লোক, তার এ রকম চলে যাওয়ায় কেউ কিছু মনেও করবে না। কথাটা চাপা পড়েই যাবে। অবুঝের মত কথা বোল না। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ, তা হলেই সব বুঝতে পারবে।"

বীণা কিন্তু লীলার কোন যুক্তি শুনিল না। ইহার মধ্যে ভাবিয়া দেখিবার কি আছে, তাহাও সে বুঝিল না। সে কেবল অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—"লিলি! তুমি বড় নিষ্ঠুর, তোমার প্রাণে একটু দয়ামায়া নেই। আমি তোমায় সত্যই বলছি, আমি কিছুতেই কুমারকে ছাড়তে পারবো না। তাঁকে ছাড়তে হলে আমি আর বাঁচবো না। তুমি ত কোনদিন কারুকে ভালবাসনি,—তুমি আমার অবস্থা বুঝবে কি করে? সংসারে ভাল-মন্দ সব রকম লোকই থাকে,—সকলেই কি একেবারে দেবচরিত্র সাধু পুরুষ হয়ে জন্মায়? যদি তাঁর কিছু দোষ থাকে—নিশ্চয় তিনি তা শুধরে নেবেন। আমি কালই তাঁকে এ-সব কথা বোলবো।"

লীলা বলিল—"বেশ! তোমার যা ইচ্ছা, তাই করো। তবে এটা নিশ্চয় জেন যে, আমি তোমার এই সব অযথা খামখেয়ালির প্রশ্রয় দিতে পারবো না। তোমার যদি নিজের সামান্য কিছু বুদ্ধি থাকতো, তা হলে তুমি নিজেই এ বিষয়টা ভাল করেই বুঝতে। তোমার ভালর জন্যই তোমাকে সাবধান করে দিলুম,—তার চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তার সমস্ত দোষ তোমার চোখের উপর ধরে দিলুম,—তোমার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে মাতাল, লম্পট, বদমাস—যা খুসি হোক্, তবু তাকে তোমার চাই-ই। চমৎকার কথা! আজ সে তোমায় নিয়ে

দুদিন খেলা করে' শেষে জোছনার মত রাস্তায় তাড়িয়েই দিক্—কিম্বা সুখের খেয়ালে আজ বিয়ে করে বাড়ীতে তোমায় ফেলে রেখে নিজে যা-খুসি করেই বেড়াক্—কিছুতে তোমার আপত্তি নেই। শুধু তার সঙ্গে বিয়ে হলেই হল। ধন্য তোমরা! আর ধন্য তোমাদের ভালবাসা! আমি কিন্তু কালই বাবার কাছে কুমারের বিষয় সব বোলবো!"

বীণা পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিত। লীলার রাগ দেখিয়া ও পিতার নামে সে অত্যন্ত দমিয়া গেল। বলিল—"তুমি বড় একটুতেই রেগে যাও লিলি। হঠাৎ বাবার কাছে এ-সব কথা বলে একটা হৈ-চৈ বাধান কি ভাল? যাই হোক, কুমার নিজে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক,—তাঁর নামে এ-রকম একটা কুৎসা রটান, চারিদিকে তাঁর বদ্‌নাম করা কি ভাল হবে? আমাদের নিজেদেরও ত মান-সম্ভ্রম আছে—"

লীলা বাধা দিয়া বলিল, "তা আর তুমি বুঝছো কই? যাতে আমাদের বা তার সম্বন্ধে কারু মনে কোন কথা না ওঠে, সেইজন্যই ত আমি তোমায় তার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করছি। আজ যদি বাবার কাণে এ-কথা ওঠে, আর তিনি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন, তা' হলে সমাজে একটা সোরগোল পড়ে যাবে। তুমি এ দুমাস ধরে তার সঙ্গে যে-ভাবে মিশছো, মা তাকে বাড়ীতে ডেকে এনে যে-রকম ঘনিষ্ঠতা করছেন, সে কি আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এ-ভাবে এত মেশার পর হঠাৎ তাকে তাড়িয়ে দিলে, লোকে তোমার আর তার সম্বন্ধে কি ভাববে,—আর তার পর ঘরে ঘরে তোমার নামের সঙ্গে তার নাম যোগ করে কি-রকম চর্চ্চা চলবে, সেটা একবার ভেবে দেখো। তাই যদি তুমি চাও, বেশ—তাই হবে।"

বীণা ছোট বয়স হইতেই নিজে একটি সামাজিক জীব—এ-সব ব্যাপার ও এই সব কুৎসিত আলোচনার গুরুত্ব সে ভাল করিয়াই

বোঝে। লীলার এ-কথার পর সে সহসা আর কোন উত্তর দিতে পারিল না।

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া লীলা আবার বলিল—"এই ত সে-দিন অরুণকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল, এখনো সবাই সে-কথা ভাল করে ভোলে নি। তার পর দুমাস যেতে না যেতেই আবার এই নতুন একটা কাণ্ড—লোকে বলবে না-ই বা কেন? সকলের ঘরেই আমাদের মত বড় বড় মেয়ে আছে, কিন্তু কারুকে নিয়ে কোন দিন কোন চর্চ্চা ত শুনি নি! আমাদের বেলাতেই বা লোকে চর্চ্চা করবার অবসর পায় কেন? যা হোক, তুমি এখন কি স্থির করলে, বলো—আমি কালই এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা করে ফেলতে চাই।"

বীণা চোখ মুছিয়া বলিল—"আমি এত ঘড়ীর কাঁটার মত চলতে পারবো না। সব-তাতেই তোমার তাড়াতাড়ি। আজকার রাত্রি আমায় ভাল করে ভাবতে দাও। কাল সকালে যা হয়, তখন হবে।"

৩৩

পরদিন অপরাহ্ণে লীলা একা ড্রয়িংরুমে বসিয়া কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিসেস্ রায় সেদিন বীণাকে লইয়া তাঁহার এক বন্ধুগৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। লীলার অনেক চেষ্টা যত্ন ও শাসনের ভয়ে বীণা শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইয়াছিল।

ফটকের বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। পরক্ষণেই কুমার গুণেন্দ্রভূষণ ঘরে প্রবেশ করিয়া সহাস্যে লীলাকে নমস্কার করিয়া

বলিলেন—"আজ যে আপনি এখানে একা বসে আছেন মিস্ রায় ?" এঁরা সব কোথায় ?"

লীলা প্রতি-নমস্কার করিয়া সংক্ষেপে বলিল—"মা দিদিকে নিয়ে মিসেস্ পালিতের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণে গেছেন। আমি আজ একাই বাড়ীতে আছি।"

বীণা বাহিরে গিয়াছে শুনিয়া কুমারের মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তাঁদের আস্তে বেশি দেরি হবে না বোধ হয় ? চায়ের নিমন্ত্রণ তো ? সে আর এমন কি দেরী হবে ? আমি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে পারি কি ?"

লীলা কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করিবে, তাহাই এক মনে ভাবিতেছিল। কুমারের কথার সে কোন উত্তর দিল না।

কুমার তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিলেন— "আপনি আজ বেড়াতে যাবেন না ? কিরণ বাবু কোথায় ? আসেন নি এখনো ?"

লীলা এবার বলিল—"আজ আমি তাঁকে আসতে বারণ করে দিয়েছি। আমার আপনাকে বলবার গোটা কতক কথা আছে, তাই বেড়াতে না গিয়ে আপনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম।"

কুমার অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া লীলার মুখের দিকে চাহিলেন— বলিলেন—"আমার সঙ্গে কথা আছে ? কি কথা, আজ্ঞা করুন !"

লীলা ক্ষণকাল নীরবে রহিল। কুমার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত মৃদু ও কোমল ভাবে আবার বলিলেন—"এমন কি কথা মিস্ রায়, যা' বলতে আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন ?"

লীলা একবার মুখ তুলিয়া বলিল—"আপনি ঠিক কথাই ধরেছেন কুমার ! কথাটা বলতে আমার নিজের ভদ্রতায় বাধছে ; কারণ,

আমরা সকলেই আপনাকে বিশ্বস্ত বন্ধুরূপেই গ্রহণ করেছিলুম, কুমার! আমার রূঢ়তা মাপ কর্ব্বেন, কিন্তু আমরা আর আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে অক্ষম—আমাদের ইচ্ছা—আমাদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের অবসান হোক্!"

কুমারের প্রফুল্ল হাস্যময় মুখ শুকাইয়া গেল! তিনি কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত লীলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিহ্বল ভাবে বলিলেন,—"আমি কি স্বপ্ন দেখছি না কি? আপনি কি বলছেন মিস্ রায়? আবার বলুন ত!"

লীলা অচঞ্চলস্বরে বলিল,—দুর্ভাগ্যক্রমে এটা স্বপ্ন নয়! আমি সত্যই বল্‌ছি—আপনার সঙ্গে আমাদের আর বন্ধুত্ব থাকতে পারে না।"

কুমারের মুখ ক্রোধে ও অপমানে আরক্তিম হইয়া উঠিল! তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—"গৃহাগত অতিথিকে আপনি যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করতে জানেন—দেখছি! কিন্তু কেন আমায় এ-ভাবে অপমানিত করা হলো, তা ত কিছুই শুনলুম না? সে-কথা জানবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে! আমি কি পথের কুকুর—যে, এক কথায় তাড়িয়ে দিলেই তখনি চলে যাব?"

লীলা তাহার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি কুমারের মুখের দিকে স্থির রাখিয়া বলিল—"কেন যে এ-কথা আপনাকে আমি বলতে বাধ্য হলুম, তার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনি সে-সব কথা শুনতে চান? আপনার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর কথা আমি জান্‌তে পেরেছি। যদি আপনি আঁমাদের পরিবারে সাধারণ বন্ধু হিসাবে মিশতেন, তা হলে হয় ত এ-সব কথা আপনাকে বলবার কোন দরকার হত না। কিন্তু আমি দেখেছি—আপনি বীণার সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন।

আপনার সম্বন্ধে নানা কথা শুনার পর তাঁর সঙ্গে আর আপনার কোন ঘনিষ্ঠতা থাকতে পারে না। কাজেই কথাটা বলতে হলো।”

এবার কুমারের যথেষ্ট ভাবান্তর ঘটিল। তিনি অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে বলিলেন—“আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝলুম না, মিস রায়! বীণার সঙ্গে আমি একটু বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশি বটে, কিন্তু তার মধ্যে গোপনতা কিছুই নেই। মিসেস্ রায় সমস্তই জানেন, তাঁর এতে কোন আপত্তি নেই। কোন দিন তিনি আমায় বাধা দেন নি। আপনারা সকলেই আমায় জানেন; আমার পরিচয় আপনাদের কাছে লুকোন নেই কিছু। তবু আপনি কার মুখে কি একটা উড়ো ভাসা কথা শুনে আমায় এ-ভাবে অপমান করলেন, এটা বড় দুঃখের বিষয়।”

লীলা বাধা দিয়া বলিল—“আমি বাজে কথা শুনে হঠাৎ আপনার মত সম্মানিত ব্যক্তির সম্বন্ধে এ-রকম ব্যবহার করলুম, এই কথা যদি আপনি বুঝে থাকেন, তা হলে কিন্তু আমার প্রতি অবিচার করা হয়। বীণার সঙ্গে আপনার যে কোন সম্বন্ধ হতে পারে না, এর জীবন্ত প্রমাণ আপনার গৃহে এখনো বর্ত্তমান রয়েছে। আমার কথা আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন। আমি জোছনার কথাই বলছিলুম। এর পর আপনার আর কিছু বলবার আছে কি?”

কুমার অত্যন্ত চমকাইয়া লীলার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার সহিত দৃষ্টি মিলিতেই তাঁহার দৃষ্টি নত হইয়া গেল।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া লীলা বলিল—“এই সব বিষয় নিয়ে আমরা সমাজে আপনার দুর্নাম করতে চাই না—আপনাকে তাই বন্ধুভাবে সাবধান করে দেওয়াটাই সমীচীন বলে মনে হলো। আপনি

আমার কথামত চললেই আর কোন গোল হবে না। তা হলে এ প্রসঙ্গের এখানেই শেষ হয়ে গেল।”

কুমার অত্যন্ত হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন, “না! না! সে হবে না মিস্ রায়। আমি এত সহজে বীণার আশা ছাড়তে পারবো না! আপনি যে-কথা বল্লেন, সে-সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য আছে, সে আমি তাকেই বোলবো! এ-কথা আপনার সঙ্গে চলতে পারে না! আপনি একটু ভেবে দেখুন, ভুল-ভ্রান্তি মানুষের জীবনে আছেই, তার জন্য—”

লীলা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজার নিকট যাইয়া ডাকিল—“বেহারা! কুমার সাহেব কা গাড়ী ঠিক করনে বোলো—”

তাহার পর অত্যন্ত গম্ভীর মুখে দৃঢ়স্বরে বলিল—“কিন্তু এ রকম ভুল-ভ্রান্তি যার জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, তার সঙ্গে, আর যাই হোক, কোন ভদ্র মহিলার সম্বন্ধ হতে পারে না। আমি আপনার সঙ্গে কোন রূঢ় ব্যবহার করতে চাই না। যদি আপনি আমার কথা শুনে চলেন, তা হলে সমাজে কোন দিন কোন কথা প্রকাশ পাবে না, আমি কখনো এ-সব কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবো না। কিন্তু এর পরও যদি আপনি বীণার সঙ্গে দেখা করবার বা তাকে চিঠি লেখবার কোন চেষ্টা করেন, তা হলে জানবেন—কোন দিন আর আমি আপনাকে ক্ষমা করবো না। মা আপনার সম্বন্ধে কোন কথা জানেন না বলেই আপনি এখানে এত ঘনিষ্ঠতা করতে পেরেছিলেন। আমি সুস্থ থাকলে কখনো এতটা সম্ভবপর হতো না।”

বেহারা আসিয়া জানাইল, কুমার সাহেবের গাড়ী প্রস্তুত।

কুমার অগত্যা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, “আপনি আজ সামান্য অপরাধে আমার সঙ্গে এমন অন্যায় ব্যবহার

করলেন; এটা কিন্তু পরিণামে ভাল হবে না, বলে রাখ্‌ছি। আমি আবার বলছি মিস্ রায়—আর একবার কথাটা ভাল করে ভেবে দেখুন—আমার যা বলবার আছে, আমি বীণাকে—"

লীলা বাধা দিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল—"এইমাত্র আমি আপনাকে বল্লুম না—সে চেষ্টা করলে আপনি বিষম অপমানিত হবেন? আপনি এখনো বীণার নাম মুখে আনছেন কোন্ সাহসে? লজ্জা হচ্ছে না আপনার? যান—আপনার গাড়ি তৈরি—নমস্কার।"

লীলার উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া বেত্রাহত কুকুরের মত কুমার বেহারার সহিত কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

পরদিন প্রভাতে কিরণের বসিবার ঘরে টেবিলের ধারে অরুণ একা বসিয়াছিল। মেঘমুক্ত নির্ম্মল নীল আকাশ—প্রথম অরুণোদয়ের তরুণ সোনার আলো দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাগানে ঘন আম্র-পল্লবের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া একটা কোকিল থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল।

কিরণ চা খাইয়া তাহার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। সে বলিয়া গিয়াছে—আজ বীণা অরুণের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে। অরুণ একা বসিয়া তাই অধীর আগ্রহে পথের দিকে উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। সম্মুখে টেবিলের উপর তাহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে-দিকে আজ আর সে মনঃ সংযোগ করিতে পারিতেছিল না।

আজ দীর্ঘ দুই মাসের অধিক কাল সে তাহার বীণার দেখা পায়

নাই,—তাহার একটি কথা শুনিতে পায় নাই। মন তাহার অনুক্ষণ তৃষিত চাতকের মত লীলার আশায় উন্মুখ হইয়া থাকিত। কিরণ তাহার নিজের কাজ-কর্ম্ম ভুলিয়া অধিকাংশ সময় তাহারই নিকট কাটাইত,—তাহাকে পুস্তক পড়িয়া শোনাইত,—তাহার রচনা সংশোধনের সময় সাহায্য করিত। গল্প করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা করিত। কিন্তু অরুণ কিছুতেই মনে শান্তি পাইত না। তাহার গল্পের মধ্যে কেবল লীলার প্রসঙ্গ। লীলার কথা সর্ব্বক্ষণ নানা ভাবে নানা রূপে বলিয়া ও শুনিয়া কিছুতে সে তৃপ্তি পাইত না। কিরণের অনুপস্থিতির সময় সহর হইতে কিরণের যে-সব বন্ধু-বান্ধব তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত, সে তাহাদের সহিতও অনেক সময় কেবল জজ সাহেবের মেয়েদের বিষয় আলোচনা করিয়া কাটাইত। লীলার স্মৃতি, লীলার ভালবাসা তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল,—তাহার অন্তরে আর কোন চিন্তার স্থান ছিল না।

রাস্তার উপর পরিচিত অশ্ব-পদ-শব্দ শুনিয়া অরুণ তাহার চিন্তা ত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে কাণ পাতিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই কক্ষের ভিতর তাহার চিরপরিচিত কোমল মৃদু পায়ের শব্দ নিকটে আসিয়া থামিয়া গেল।

পুলকাবেগে অরুণ চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। আন্দাজে লীলার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া সে ডাকিল—"বীণা, এত দিন পরে সত্যই তুমি এসেছ? এসো—আমার কাছে এসো! এলে যদি, দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না।"

তাহার প্রসারিত হস্ত উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া লীলা বলিল, "হ্যাঁ অরুণ! এসেছি আমি! এত দিন আমাদের উপর দিয়ে যে

বিপদের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, সে-সব শুনেছ ত? একটু ছাড়া পেতেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি আমি। খুব বেশি দেরী হয়েছে কি?"

অরুণ তাহাকে নিকটে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া বলিল,—"তোমার এ-কথার আমি কি উত্তর দেব, বীণা? যে আমার কাছ থেকে এক মুহূর্ত অন্তর হলে আমার এক যুগ বলে মনে হয়, তাকে দীর্ঘ দু'মাস হারিয়েও আমায় দিন কাটাতে হয়েছে, এর পর আর কি বোলবো বলো? কিন্তু বীণা! তুমি আজ এত অন্তরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, আমার কাছে আসছো না কেন?"

লীলা বলিল,—"আজ আমার তোমাকে বলবার অনেক কথা আছে, অরুণ! আগে আমি সে-সব বিষয় তোমার কাছে বলতে চাই। তার পরেও যদি তুমি আমায় কাছে ডাক, তখন তোমার নিকটে যাব—"

অরুণের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল,—"দাঁড়াও বীণা আগে আমি একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করে নি। বীণা, সত্য বলো, এই অন্ধের পরিচর্য্যা করে করে তুমি কি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ? তাই যদি তোমার বক্তব্য হয়—"

লীলা বাধা দিয়া বলিল,—"সে-সব কিছুই নয় অরুণ! তুমি ত জান, আমি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গ বরণ করে নিয়েছি। সে-জন্য কোন দিন আমার মনে কিছু হয় নি। আজ আমি যা তোমায় বলতে এসেছি, সে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমি এত দিন ধরে তোমায় বঞ্চনা করে এসেছি অরুণ! তুমি আমায় যা বলে জান, বাস্তবিক আমি তা নয়,—সেই কথা স্বীকার করবার দিন আজ এসেছে।"

অরুণের মুখের কালিমা কাটিয়া গেল। সে উৎফুল্ল মুখে বলিয়া

উঠিল,—"সে-জন্য তোমার ভাববার কোন দরকার নেই, লীলা! আমি সে-কথা ত অনেক দিন থেকেই জানি। তুমি কিছু বল নি, তাই আমিও সে-সম্বন্ধে কোন কথা তুলি নি। তোলবার দরকারই বা কি ছিল? আমার সর্ব্বস্ব বলে যাকে আমি জানি,—তাকে আমি একেবারে আমার নিজস্ব করে পেয়েছি,—তাতেই আমার মন ভরে গেছে! সেই ত আমার পক্ষে যথেষ্ট, লীলা!"

লীলা এক মুহূর্ত্ত ঘোর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল! অরুণ তাহার এতদিনকার ছলনার কথা সবই জানে? লজ্জায় ও ধিক্কারে প্রথমে তাহার মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তাহার পরই কিরণের কথা ভাবিয়া তাহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল! আর তাহার কোন আশাই রহিল না।

অরুণ লীলার লজ্জা ও স্তব্ধ ভাব অনুভব করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া নিজের পাশে বসাইল। তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"এ কি লীলা? কি হয়েছে? কাঁদছো কেন?"

লীলা বিস্তর আয়াসে নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে রুমালে চোখ মুছিয়া বলিল,—"আমি ভেবেছিলুম, তুমি সব কথা জানতে পারলে আমায় দূর করে তাড়িয়ে দেবে!"

"—তোমায় তাড়িয়ে দেব? এত দিন আমায় দেখে—আমায় ভাল করে বুঝে শেষে তুমি এই কথা ভাবতে পারলে, লীলা! তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো বলো?" অরুণ অত্যন্ত বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া এই কথা বলিল।

লীলা বলিল,—"আমি যে বড় দোষ করেছি, অরুণ!

তোমায় এত দিন ধরে বঞ্চনা করে ধাঁধায় ফেলে রাখা কি কম অন্যায় ?"

অরুণ উত্তেজিত ভাবে বলিল,—"হ্যা অন্যায় ! কিন্তু তুমি কার জন্য এ অন্যায় করেছিলে, লীলা ? আমি কে তোমার ? আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব দূরে থাক্, কখনো যাকে চোখেও দেখ নি, তার দুর্দ্দশা দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য, তাকে আনন্দ দেবার জন্য তুমি অযাচিত ভাবে ছুটে এসেছিলে ! আমি ত মরতেই বসেছিলুম, সংসারের সকল আশা, আনন্দ, সকল সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবনে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। হয় ত আর কিছুদিন ঐ ভাবে থাকতে হ'লে আত্মহত্যা করে সকল জ্বালার অবসান করতে হতো ! আমাকে আবার নব জীবন, নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা দিয়ে, গভীর আঁধারের মধ্যে এ আলোর পথে কে নিয়ে এলো ? আমার এ জীবনের যা-কিছু আবার ফিরে পেয়েছি, তুমি ত সে-সবের মূল, লীলা ! তুমি লীলাই হও, আর বীণাই হও, তাতে আমার কি যায়-আসে ? তুমি যে আমার—এই আনন্দেই ব্যর্থ জীবন আমার ধন্য হয়ে গেছে !"

অরুণের কথা শুনিতে শুনিতে লীলা একমনে ভাবিতেছিল, যাই হোক, এই যে তাহার জীবনের গতি এক দিকে নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল, এ ভালোই হইল ! যে ভাগ্যলিপি সে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারই হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া সে আর সব চিন্তা ভুলিয়া অনন্যচিত্তে অরুণের বিশ্বস্ত পত্নী হইয়াই এবারকার জীবন কাটাইয়া দিবে,—আর দোটানার মধ্যে পড়িয়া উদ্বেগ ও অশান্তির তাড়নায় তাহাকে পীড়িত হইতে হইবে না।

অরুণের কথা শেষ হইলে সে বলিল,—"আজ আমার বুকের উপর

থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। এত দিন কথাটা তোমার কাছে বলতে না পেরে আমি যে কি অশান্তি ভোগ করেছি, সে আর তোমায় কি বোলবো! যা হোক্, এখন কি করে এ ব্যাপার যে ঘটলো, সেটা শোন। যেদিন প্রথম বীণার কাছে তোমার সেই চিঠিটা এলো,—ঘণ্টা-দুই মা আর বীণা অনেক দুঃখ, বিলাপ কান্নাকাটি করে শেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে, তোমার সঙ্গে বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়াই ভালো। বীণা তখনি তোমায় একটা চিঠি লিখে ফেললে। আমি কিন্তু সে-কথা মোটে ভাবতেই পারলুম না। এখন—যখন তোমার জীবনে বেশি ভালবাসা, বেশি সেবা-যত্নের দরকার—তখন তোমার বাগ্দত্তা পত্নী যে তোমায় এক কথায় এমন করে ঝেড়ে ফেলে দেবে, এ আমার মোটেই ভাল লাগলো না—মাকে বীণাকে অনেক বোঝালুম, কোনও ফল হলো না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন কিরণ এক দিন বল্লে—তুমি তার বাড়ীতেই আছ। আমি কিরণকে বলে এক দিন তোমার সঙ্গে দেখা করবো, স্থির করলুম। আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'লে, আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে তোমার নিঃসঙ্গ অবসর কথায়-বার্ত্তায়, গল্পে কতকটা আনন্দে কাটিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু কার্য্যকালে সবই উল্টো হয়ে গেল। আমার একটা কথা শুনেই তুমি আমাকে বীণা বলে ভুল করে বসলে! তাতেই সব গোলমাল হয়ে গেল।"

অরুণ লীলার হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "সেই ভুলটা ভাগ্যে করেছিলুম, তারি ফলে ত তোমায় পেয়েছি। না হলে আমার কি আর দাঁড়াবার স্থান থাকতো?"

লীলা বলিতে লাগিল, "আমায় বীণা বলে জেনে তোমার মুখে যে আনন্দের জ্যোতি দেখলুম, তাতে আমার কেমন দুর্ব্বলতা আসতে

লাগলো। কতবার মনে ভাবলুম, কাজটা অন্যায় হচ্ছে—আমার পরিচয় দিয়ে তোমার ভুল ভেঙ্গে দি। কিন্তু কিছুতে তা পারলুম না। তখন মনে হলো, কিছুদিন যাক্—আমার মাঝে মাঝে আসা-যাওয়ার ফলে যখন তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জন্মে যাবে, তোমার মনটাও আরো শান্ত হয়ে আসবে, সেই সময় এক দিন সব কথা গুছিয়ে তোমায় বোলবো। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আমার অসুখ হয়ে পড়লো। সেই জন্য যা ভেবে রেখেছিলুম, তার কিছুই হলো না।"

লীলা তাহার বুকের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া অরুণের হাতে দিয়া বলিল, "এই চিঠিখানা বীণা লিখে আমার হাতে দিয়েছিল, তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য। আমি ভেবেছিলুম, সময়মত এখানা তোমাকে নিজেই দেব। তবে ঘটনা-চক্রের ফলে এত দিন এটা দেবার আর সময় হচ্ছিল না। এই চিঠিখানি আমার দুষ্কৃতির প্রমাণ স্বরূপ আমার কাছে থেকে আমার জীবনটা অশান্তিময় করে তুলেছিল।"

অরুণ চিঠিখানি লইয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া লীলার হাতে দিয়া বলিল—"এ চিঠিখানার আর দরকারই বা কি আছে? যা হোক—তুমি একবার পড়ে আমায় শোনাও।"

লীলা বীণার পত্রখানা পড়িতে লাগিল। অরুণ নীরবে শুনিয়া তাহার হাত হইতে পত্রটা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"বীণার পক্ষে যা উচিত, সে তাই করেছে; কিন্তু আমি এজন্য তার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো, লীলা! সে-ই আমার আজকার সকল সৌভাগ্যের মূল। সে যদি এক কথায় আমায় এমন করে দূরে ঠেলে না দিতো, তা হলে আমি হয় ত তোমাকে জানতেও পারতুম না। অন্য কেউ এসে তোমায় নিয়ে যেত।"

লীলা এ-কথা চাপা দিয়া বলিল,—"কিন্তু অরুণ! তুমি কি করে আমায় চিনেছিলে? আমার এটা এত আশ্চর্য্য লাগছে! আমি কোন দিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি, বা আমার সন্দেহ হয় নি যে, তুমি আমায় জান। কিরণকে আমি বলতে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছিলুম, সে কখনো বলে নি—এটা নিশ্চয়। তবে তুমি কি করে জানলে?"

অরুণ হাসিয়া বলিল,—"সেটা জানা কি এতই কঠিন—লীলা? ভুল-ভ্রান্তি মানুষ এক দিনই করে—চিরদিন সে ভুলের জের টান্‌লে চলবে কেন? বিশেষ, বীণার সঙ্গে তোমার যে প্রভেদ—সে তুমি কতদিন লুকিয়ে চলতে পারো? তোমার কথাবার্ত্তা শুনে, তোমার চাল-চলন দেখে দু'এক দিনের মধ্যেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। বীণাকে কি আমি জানতুম না? তার হাবভাব, তার কথা-গল্প, তার সমস্ত অসার প্রকৃতির সঙ্গে আমি যে বেশ ভাল করেই পরিচিত ছিলুম। তাই সন্দেহ হতেই আমি গল্পচ্ছলে কিরণের সঙ্গে কেবল তোমার বিষয় আলোচনা করতে আরম্ভ করলুম। কিরণ যখন বাড়ী না থাকতো, তখন তার বন্ধু-বান্ধব যারা এসে আমার কাছে বসতো, প্রসঙ্গক্রমে তাদের কাছেও আমি তোমারি কথা পাড়তুম, তোমার বিষয় জানতে চাইতুম। তার পর তুমি যখন আমার কাছে আসতে, তখন তাদের বর্ণিত চিত্রের সঙ্গে তোমার প্রত্যেক কথা, হাসি, গান, গল্প মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতুম। এর পরেও কি আমার পক্ষে তোমায় চেনা শক্ত কথা? তবে তুমি এ-সম্বন্ধে কিছু বল না কেন, সেইটাই মাঝে মাঝে অদ্ভুত বলে মনে হতো। আমার নিজের দিক থেকে এ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না, আমি ত তোমাকে পেয়েই সুখী। তবে তোমার দিক থেকে যে কিসে কি হলো—সেইটাই সময় সময় ভাবতুম। আজ তোমার কথা শুনে সব স্পষ্ট হয়ে গেল।"

তাহার পর অরুণ বলিল,—"এখন এ-সব কথা ছেড়ে দাও লীলা! আমাদের মধ্যে যা-কিছু এত দিন অস্পষ্ট ছিল, সে সবই আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে, আর ও-সব কথার কিছু দরকার নেই। এখন আমি আর কত দিন এ-ভাবে পড়ে থাকবো বলো? তোমাকে ছেড়ে একা একা আমার দিন যে আর কিছুতেই কাটতে চায় না। এই দীর্ঘ ছ' মাস আমি যে শরীরে মনে কি অশান্তি, কি উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়েছি, সে তুমি বুঝতে পারবে না। আর আমি পারছি না। আমায় কবে তোমার কাছে নিয়ে যাবে, লীলা?"

লীলা সস্নেহে বলিল,—"আর ত বেশি দেরি হবে না, অরুণ! এত দিন আমাদের নিজেদের মধ্যে এই গোলযোগ ছিল, এটা না মিটে গেলে ত বাড়ীতে কোন কথা বলতে পারি না। তাই এত দেরী হ'ল। আজ আমার সব কথা বলা হয়ে গেল। আজই বাড়ী গিয়ে এ-কথা মাকে বাবাকে বলবো। তার পরে আর কতই বা দেরী হবে?"

অরুণ উদাসভাবে বলিল,—"কিন্তু এই কথাটা শুনলেই কেন জানি না, মনটা আমার বিষণ্ন হয়ে যায়। কেবল মনে হয়, তাঁরা, বিশেষ করে তোমার মা, কি এতে সন্তুষ্ট হবেন? তিনি হয় ত আপত্তি করতে পারেন। তা হলে আমার দশা কি হবে?"

লীলা হাসিয়া বলিল,—"তুমি এই সামান্য কথা ভেবে মন খারাপ কর কেন? আমি ত তোমায় কত দিন বলেছি যে, আমি শুধু আমার নিজের মতেই চলি। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের জীবনের ব্যাপার। আমি যদি তোমায় নিয়ে সুখী হই, তাতে তাঁদের আপত্তি করবার কি আছে? আর করলেই বা আমি সে-কথা শুনবো কেন? তবে মা প্রথমে একটু গোল করবেন, এটা ঠিক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার কথাই থাকবে—সে-জন্য তুমি ভেবো না, নিশ্চিন্ত থাক।"

অরুণ তৃপ্তচিত্তে বলিল,—"তবে তাই করো, লীলা! যত শীঘ্র পার, আমায় এখান হতে তোমার নিজের কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। আমি অধীর হয়ে উঠেছি।"

৩৪

সেদিন প্রভাত হইতে কিরণের মনের উৎকণ্ঠা ও অশান্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। আজ লীলা অরুণের কাছে গোপন রহস্য প্রকাশ করিতে আসিবে। আজ কিরণের ভাগ্য-পরীক্ষার দিন। আজ সে কিছুতে বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। চা খাওয়া সাঙ্গ হইতে না হইতেই ব্যগ্র অশান্ত চিত্তে সে বাহির হইয়া পড়িল। এখনি হয় ত লীলা আসিয়া পড়িবে! লীলাকে অরুণের সঙ্গে একত্র দেখা তাহার পক্ষে অসহ্য! একান্ত অসহ্য ব্যাপার!

বাহিরে আসিয়া সে তাহার নিজের কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারিল না। ফল যাহা হইবে, তাহা ত জানা কথা—সে-কথা মনে পড়িলে সে পাগল হইয়া উঠে। একটা নির্জ্জন বাগানের মধ্যে আসিয়া সে দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

মানুষ ঘোর নিরাশার ভিতরও আশার ক্ষীণ রেখাটুকু প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া কিরণের মনেও একটা অনিশ্চিত আশার আলো জাগিয়া উঠিতেছিল—যদি সব শুনিয়া অরুণ শেষ পর্য্যন্ত লীলাকে তাহার সর্ত্ত হইতে মুক্তি দেয়! কিরণ নিজের অনুকূল যুক্তি দ্বারা মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে, অরুণের পক্ষে ইহাই সম্ভব ও উচিত। সে যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে ছাড়িয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও সে কেমন করিয়া বিবাহ করিবে? এই যে সে

লীলাকে ভালবাসে, সে কি কোন বিশেষ অবস্থা-চক্রে পড়িয়া লীলার পরিবর্ত্তে অন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে পারে? অন্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইতে পারে, বন্ধুত্ব হইতে পারে; কিন্তু বিবাহ! সে ত সম্পূর্ণ অসম্ভব!

লীলার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর তাহার সহিত প্রথম পরিচয়ের সময় হইতে সব কথা একে একে কিরণের মনে পড়িতেছিল। সে-দিনের কি নিশ্চিন্ত আনন্দময় জীবন! তখন লীলা একেবারে সম্পূর্ণ তাহারই আয়ত্তের মধ্যে ছিল। সে তখন সহজেই তাহাকে নিজের করিয়া লইতে পারিত। লীলা বা তাহার পিতা মাতা—কাহারও তাহাতে কিছু আপত্তি থাকিত না। তাহা না করিয়া সে কেবল ছেলেমানুষি করিয়া খেলায় ও আমোদে মাতিয়া কাটাইয়া দিল। মানুষের জীবনে সুযোগ দৈবাৎ আসে। সে সময় তাহাকে লইতে না পারিলে যাবজ্জীবন মনস্তাপে কাটাইতে হইবেই ত!

কিরণ নিজের নিশ্চেষ্টতা ও মূঢ়তার কথা ভাবিয়া নিজের উপর অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল। ধরিতে গেলে সেই ত একরূপ তাহার লীলাকে অরুণের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এখন আর সেজন্য অনুতাপ করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়া লাভ কি?

মাথার উপর রৌদ্র ক্রমশঃ প্রখর হইতে হইতে যখন বেলা প্রায় বারোটা বাজিয়া গেল, তখন আর বসিয়া থাকা অসম্ভব দেখিয়া কিরণ শ্রান্ত অবসন্ন শরীরটা কোন মতে টানিয়া টানিয়া শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাহিরের ঘরে অরুণ প্রসন্ন মুখে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। তাহার পায়ের শব্দ শুনিয়াই সে ডাকিতে লাগিল—"কিরণ! এসো, এ ঘরে! আগে এসো। তোমায় বলবার অনেক কথা আছে।

'আমি কতক্ষণ থেকে তোমার জন্ম যে বসে রয়েছি! আজ তুমি বড় দেরি করেছ কিন্তু!"

কিরণ ঘরে আসিয়া অরুণের পাশে একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িল। অরুণের হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখিয়া তাহার ব্যাপার বুঝিতে বেশি বিলম্ব হইল না।

অরুণ বলিতে লাগিল,—"কিরণ! আজ আমাদের দুজনের সব বিষয় ঠিক হয়ে গেছে, ভাই। লীলা আজ এসেছিল। সে আজ আমায় সব কথাই বলে গেছে—যদিও আমি আন্দাজে অনেক দিন আগে থেকেই সব জানতুম,—"

কিরণ শুষ্কভাবে বলিল,—"জানতে? কি করে জানলে?"

অরুণ হাসিয়া বলিল,—"জানতুম বৈ কি! তোমাদের বর্ণনা আর কথা শুনেই ধরে ফেলেছিলুম। তুমিও ত সব জানতে ভাই! সব জেনে-শুনেও তুমি ত এতদিন আমায় কোন কথাই বল নি। যা হোক সে-জন্ম আমি তোমায় কিছু বলতে চাই না। লীলার অনুরোধ—সে যে কি জিনিষ, তা আমার বুঝতে বাকি আছে? আজই সে বাড়ী গিয়ে মিঃ রায় ও মিসেস্ রায়কে এ-কথা জানাবে বলে গেছে। তার পরে আমাদের বিবাহের আর বেশি বিলম্ব হবে না।"

কিরণ নিঃস্পন্দ দেহে চৌকির উপর হেলিয়া পড়িল। অরুণের কথার উত্তর দিবার, বা তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিবার মত তাহার দেহে আর শক্তি ছিল না। বিরূপ সম্ভাবনার যে শাণিত তরবারি এতদিন উপরে উদ্যত থাকিয়া কোন্ সময়ে তাহারই মাথায় পড়িবে বলিয়া তাহার আশঙ্কা ও উদ্বেগের সীমা ছিল না, আজ তাহা বজ্রের বেগে তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে! আজ হইতে আর তাহাকে অশান্তি ও উৎকণ্ঠার দহনে উৎপীড়িত হইতে হইবে না! অনিশ্চিত এতদিনে সুনিশ্চিত

হইয়া গেল! আজ তাহার সব শেষ! আশা, আনন্দ, সুখ তাহার জীবন হইতে চির-বিদায় লইল! তবে আর কেন তাহাকে লইয়া টানাটানি?

অরুণ তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়াই নিজের আনন্দে নিজে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিল—"যে রকম দেখছি, তাতে মনে হয়, আমাদের বিয়ে হতে হতে গরম পড়ে আসবে! আমি তাই ভাবছি, বিয়ের পর এখান থেকে লীলাকে নিয়ে নইনিতাল কি মুসুরি পাহাড়ে চলে যাব। গরমটা সেইখানেই কাটিয়ে তার পর দেশে ফেরা যাবে। এর মধ্যে তোমাকে অনেকগুলো কাজ করতে হবে, ভাই! আমি ত এ পর্য্যন্ত লীলাকে কিছু দিইনি। বিয়ের সময় ওঁরা যা দেবেন, সে তো আছেই। আমার দিক থেকে তুমি সেদিন তোমার মনের মত করে তাকে সাজিয়ে দিও। তোমার রুচি আছে। তুমি তাকে অনেক দিন থেকে দেখছো। তুমি তাই বেশ ভাল করেই বুঝবে, কোন্ কোন্ কাপড়ে, কি কি গহনায় তাকে ভাল মানাবে। আমার ত চোখ নেই যে, আমি সে-সব বুঝতে পারবো? আর আমার তুমি ছাড়া আছেই বা কে, যাকে এ-সব কথা বলতে যাব। তাই তোমাকেই বলছি কিরণ, টাকার দিকে চেও না, শুধু সেদিন আমার লীলাকে আমার হয়ে তুমি মনের মতন করে সাজিয়ে দিও, ভাই!"

বলিতে বলিতে অরুণের গলার স্বর ভারি হইয়া আসিল। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—"বাস্তবিক কিরণ! এটা বড় আশ্চর্য্য বলে মনে হয় যে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন শেষ নেই! এই আমায় দেখ—যে দুর্দ্দশা আমার হয়েছিল, তাতে আমারও এবার-কার মত সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু পেয়ে আবার আমি মন স্থির করে দাঁড়াতে পারলুম, তাও যে পাব, এমন কোন আশা ছিল না। তবু দেখ, আজ আমি কোন মতে মন স্থির করতে পারছি না। খালি

আমার মনে আক্ষেপ আসছে, যদি একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতুম! আমার লীলার প্রিয়-সুন্দর মুখখানি আমি জীবনে কখনো দেখতে পাব না। একবার সেদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখে নিয়ে আবার যদি আমার দৃষ্টি লোপ পেয়ে যেত, সত্য বলছি— আমি কোন দিন তার জন্য দুঃখ করতাম না।"

তাহার পর সে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, —"যাক্ গে, যা হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে আর কি হবে! তবু আজ এই মনে করে আমার প্রাণে শান্তি আছে যে, আমার প্রচুর টাকা আছে। যাকে আমি ভালবেসেছি, যে নিজে আমায় ভালবেসে, আমার জন্য জীবনব্যাপী এত বড় ত্যাগ স্বীকার করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে আমি যেমন ইচ্ছা হবে, তেমনি করে সাধ মিটিয়ে সাজাতে পারব, সুখে রাখতে পারবো,—টাকার জন্য কোন দিন মনের ক্ষোভ মনে মেরে চলতে হবে না। টাকা আছে বলে এত সুখ কখনো পাই নি, আমার সেই ঐশ্বর্য্যের যে এক দিন এমন সদ্ব্যবহার করবার দিন আসবে, তাও কোন দিন আশা করি নি। কিন্তু কিরণ! তুমি কোন কথা বল্লে না যে!"

এতক্ষণ পরে অরুণের চৈতন্য হইল, যে, কিরণ এ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলে নাই। সে তখন অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—"কিরণ! আজ তোমার কি হলো? আমার এত-বড় আনন্দ ও সৌভাগ্যের খবরে তুমি আমায় অভিনন্দন করলে না, কোন আনন্দ প্রকাশ করলে না—এটা যে আমার বড়ই বেসুরো লাগছে। তুমি ছাড়া আমার প্রকৃত আত্মীয় বা বন্ধু কেউই নেই ত! আমি যে সর্ব্বপ্রথম অভিনন্দন তোমার কাছ থেকেই পাব আশা করেছিলুম। আজ তুমি এমন চুপচাপ করে আছ কেন, ভাই?"

সে চৌকি হইতে হেলিয়া পড়িয়া কিরণের হাত ধরিতে গিয়া হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে হাত তুষার-শীতল, অবশ, নিঃস্পন্দ—যেন তাহাতে জীবনের কোন স্পন্দন নাই।

তখন সহসা বিদ্যুচ্চমকের মত একটা অস্পষ্ট সংশয়ের রেখা অরুণের মনে উদয় হইয়া তাহাকেও একেবারে স্পন্দনহীন করিয়া দিল। কত দিন—কতবার কিরণের ব্যবহারে, কিরণের কথায় তাহার সন্দেহ হইয়াছে যে, কিরণ হয় ত লীলাকে ভালবাসে। কিন্তু সে কখনো মন হইতে সে-কথা বিশ্বাস করিত না, এবং এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিবার মত তাহার সময় বা অবসরও ছিল না। সে তখন নিজের ভাবনা, নিজের আনন্দেই বিভোর।

আজ তাহার মনে হইল, তাহার শত অনুরোধ ও আগ্রহ সত্ত্বেও কোন দিন কিরণ তাহার ও লীলার সঙ্গে একত্র আলাপে যোগ দেয় নাই। লীলার আসিবার উপক্রমেই সে ভূত-তাড়িতের মত বাড়ী হইতে ছুটিয়া পলাইত। লীলা চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ অতীত হইয়া না গেলে সে বাড়ী ফিরিত না। সে নিজে কোন দিন ইচ্ছাক্রমে লীলার নাম মুখে আনিত না। কিন্তু অরুণের বারবার জিজ্ঞাসার দরুণ যদি কখনো সে লীলার প্রসঙ্গ তুলিত, তবে সেদিন আর সে-কথা কিছুতে থামিতে চাহিত না। লীলার কথা বলিতে বলিতে সে যেন আনন্দে আবেগে আত্মহারা হইয়া পড়িত, তাহার সে-কথা শেষ হইত না। অরুণ সত্যই অন্ধ,—সে কোন দিন এ-সব কথা বুঝিয়াও বুঝিল না।

এই অপ্রীতিকর বিসদৃশ ঘটনার মধ্যে পড়িয়া অরুণের সমস্ত হাসি-খুসি শুকাইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া শেষে ডাকিল —"কিরণ!"

অরুণের সেই বেদনাপ্লুত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কিরণের শরীরে যেন

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"কি অরুণ? কি বোলছো ভাই?"

—"কিরণ! আমি সবই বুঝেছি! আমার আরো আগে বোঝা উচিত ছিল, আমি নিতান্ত মূর্খ—তাই—কিন্তু কিরণ! আমি ত অনেক দেরিতে এসেছিলুম ভাই! তুমি অনেক আগে থেকে তাকে ত জানতে,—কেন তাকে নিজের করে নাও নি এত দিন? তা হলে আজকার এ কাণ্ডটি ঘটতো না ত।"

এতক্ষণ যে রুদ্ধ বেদনা বিরাট পাষাণ-ভারের মত কিরণের হৃদয়ে চাপিয়া থাকিয়া তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিতেছিল, অরুণের কোমল সহানুভূতিপূর্ণ কথায় তাহা গলিয়া অশ্রুরূপে কিরণের নয়ন ভিজাইয়া দিল।

সে রুমালে চোখ মুছিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া সহজ স্বরে বলিতে গেল,—"তার জন্য আর বৃথা ভেবে কি হবে অরুণ? আমি ঈসপের গল্পের খরগোসের মত দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি, এখন জেগে উঠে অনুতাপ করে আর কি হবে? তোমরা দুজনে দুজনকে ভালবেসে সুখী হও, তোমাদের জীবন পরস্পরের প্রেমে আনন্দে পূর্ণ হয়ে ধন্য হয়ে উঠুক,—আমি তোমাদের উভয়ের বন্ধু, তাই দেখে সুখী হই,—এখন এই আমার আন্তরিক কামনা।"

অরুণ বলিল, "আমি কিন্তু এতে শান্তি পাচ্ছি না ভাই! তোমার এ অভিনন্দন আমি কি মূল্যে কিনেছি—তা ত আমি নিজে জানি! আমি বড় হতভাগা। আমি যেখানে যাব, দুঃখ-বেদনা যেন আমার সঙ্গের সাথী হয়ে, আমার সংস্রবে যারা থাকে তাদের শুদ্ধ পুড়িয়ে মারবে। আমার প্রতি তোমার এত দিনের এত যত্ন ভালবাসা, আদরের কি চমৎকার প্রতিদানটাই তুমি আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে পেলে! এ কি হলো, কিরণ! আমি এ কি করলুম?"

কিরণ অরুণের ভাবপ্রবণ প্রকৃতি ভালরূপেই বুঝিত। সে নিজের দুঃখ ভুলিয়া তখন তাহাকে শান্ত করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

অরুণের পিঠ চাপ্ড়াইয়া সে হাসিয়া বলিল,—"এ কি পাগলামো সুরু হলো, বল ত ? একবার মাথায় একটা-কিছু ঢুকলেই হলো—আর রক্ষে নেই। তার পর সেই নিয়ে হা-হুতাশ চললো কিছু দিন! আর আমার জন্য এত ভাবনাই বা কিসের ? প্রথম আঘাতটা লাগলেই দু-দণ্ডের জন্য মন মুষড়ে যায়। সেটা কি কখন বরাবর কারু মনে থাকে, না কেউ মনে রাখতে পারে ? এই আজ আমায় একটু দমে যেতে দেখে তোমরা এত ভাবছো,—হয় ত দুমাস পরেই দেখবে, একটি বিবাহ করে এনে দিব্যি ঘরকন্না জুড়ে দিয়েছি !"

অরুণ বলিল,—"তা যদি হতো, তা হলে আর এত ভাববার কিছু থাকতো না। তুমি সেই ধরণেরই মানুষ কি না ? আমি যেন আর তোমায় চিনি না, তাই ও-কথা বিশ্বাস কোরবো।"

কিরণ বলিল,—"আচ্ছা, তুমি ত আমায় বেশ ভাল করেই চেন, —বল দেখি, আমার মধ্যে ও-সব প্রকৃতি তুমি কবে লক্ষ্য করেছো ? আমি চিরদিন কাজের মানুষ—কাজ-কর্ম্ম করি, খাই-দাই, আমোদ করে বেড়াই—এই পর্য্যন্ত। মরীচিকার পিছনে হা-হুতাশ করে ছুটে বেড়ান আমার ধাতে নেই। বুঝতেই ত পারছো—সেদিকে বেশি আগ্রহ থাকলে, এতদিন আমার বিয়ে কোন্ কালে হয়ে যেত। তুমি এ-কথা নিয়ে মিছে মন খারাপ করো না। বেলা হয়ে গেছে অনেক। আমি স্নান-আহারের পালাটা আগে সেরে আসি,—তার পর বসে তোমার বিবাহের বিষয় পরামর্শ করা যাবে।"

* * * *

লীলা সেদিন বাড়ী ফিরিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মিসেস্ রায়ের ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন। বীণা নিকটে বসিয়া একখানা উপন্যাস্ পড়িয়া তাঁহাকে শোনাইতেছে।

লীলা কোন ভূমিকা না করিয়া সহজভাবে বলিল, "মা! আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি। আমি অরুণকে বিবাহ করতে চাই, আজ তাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত কথা দিয়ে এলুম।"

বীণা কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লীলার মুখের দিকে চাহিল, কোন কথা বলিল না।

মিসেস্ রায় প্রথমে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলেন—যেন কথাটা তিনি কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাহার পর বলিলেন, "অসুখ থেকে উঠে মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? কি বোলছো, আবার বল ত?"

লীলা আবার বলিল "আমি অরুণকে বিবাহ করতে চাই, আজ সকালে তাকে এ বিষয়ে কথা দিয়ে এসেছি।"

মিসেস্ রায় অবাক্ হইয়া বলিলেন—"কে অরুণ? অরুণ ঘোষাল? তার সঙ্গে তোমার দেখা হলো কোথায়? আর কোথাও কিছু নেই, আমরা কোন কথা জানলুম না, শুনলুম না, তুমি একেবারে কথা দিয়ে এলে কি রকম?"

লীলা বলিল, "তার সম্বন্ধে নতুন করে জানবার তোমাদের আর কি আছে? তার সব বিষয়ই ত তোমরা বেশ ভাল করেই জান। তার সঙ্গে এ-রকম সম্বন্ধ হওয়ার বিষয়েও তোমাদের কোন আপত্তি ছিল না। যা নিয়ে তোমরা গোল করছিলে, আমার তাতে কোন অমত নেই। আমি ত তখনি তোমাদের বলেছিলুম, তার অন্ধত্ব আমার মতে বিবাহ ভঙ্গের কারণ হতে পারে না।"

মিসেস্ রায় অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ও-সব কথা এখন যেতে দাও। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর আগে চাই। সে এখন আছেই বা কোথা, আর তোমার সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠতা কবে থেকে আর কি করেই বা হলো ?"

লীলা এবার একটু বিব্রতভাবে বলিল, "সে বসন্তপুরে কিরণের বাড়ীতে আছে, তোমরা সকলেই ত সে-কথা জান! আমি সকালে বেড়াতে যাবার সময় মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতুম।"

বীণা লীলার এ দুঃসাহসের কথা শুনিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কিরণের বাড়ী? যেখানে একটা মেয়ের সংস্রব নেই, সেইখানে শুধু অরুণ আর কিরণের কাছে লীলা যাওয়া-আসা করিত? ছি! ছি! কি লজ্জা ও ঘৃণার কথা!

মিসেস্ রায় প্রথমটা বিস্ময় ও ক্রোধে রুদ্ধবাক্ হইয়া রক্তিম নয়নে লীলার দিকে চাহিয়া রহিলেন! এ মেয়েটা বলে কি? তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার নিজ কন্যার দ্বারা এ-সব কি লজ্জা ও কলঙ্কের কাজ হইতে আরম্ভ হইল? এ-কথা যদি প্রকাশ হয়, তিনি সমাজে মুখ দেখাইবেন কিরূপে?

প্রথম উত্তেজনার দুই এক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেলে তিনি সবেগে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, "তুমি আজ এ-সব কি যে বোলছো, আমি ত কিছু বুঝে উঠতে পারছি না! তুমি—তুমি একা বসন্তপুরে কিরণের বাড়ী অরুণের সঙ্গে দেখা করতে যেতে? এ যে কি করে সম্ভব হতে পারে, তা ত আমার মাথায় আসছে না!"

লীলা বলিল—"অসম্ভবই বা কেন হবে—তা-ও তো আমি কিছু বুঝি না! তোমরা দুজনে কথাটা শুনে পর্য্যন্ত এমন ভাব দেখাচ্ছ—

যেন কি একটা কিম্ভূত-কিমাকার কাণ্ড ঘটেছে। তোমাদের ভাব-গতিক দেখলে সহজ মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়!"

মিসেস্ রায় সরোষে বলিলেন,—"আবার এর উপর তর্ক করতে লজ্জা হচ্ছে না? অবাধ্য নির্লজ্জ মেয়ে! সমাজে আমার মাথাটা ডুবিয়ে দিলে একেবারে! কিরণের বাড়ী! যেখানে কেবল কতকগুলো পুরুষ মানুষের জটল্লা—একটা আড্ডাখানা বল্লেই হয়, সেখানে কোন ভদ্রলোকের মেয়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারে কখনো? নিজের মান-সম্ভ্রম বলেও কি একটা জ্ঞান-চৈতন্য নেই? তাই দিন কতক ধরেই দেখছি, যেখানেই যাই, মনে হয় মেয়েরা কি একটা কথা নিয়ে কেবলি কাণাকাণি হাসাহাসি করছে—আমায় দেখলেই সব অমনি চোখে চোখে ইসারা করে চুপচাপ! আমি বলি, কি-না-কি! আমি ত জানিনি যে আমারই গুণের মেয়ে কীর্ত্তির ধ্বজা ওড়াচ্ছেন! কি ঘেন্নার কথা! ছি! ছি! ছি! মনে হলে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!"

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া মিসেস্ রায় হাঁপাইয়া পড়িলেন। বিষম ক্রোধ ও লজ্জায় তাঁহার মূর্চ্ছা আসিবার উপক্রম হইতেই তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে স্মেলিংসল্টের শিশিটা লইয়া সজোরে তাহার ঘ্রাণ লইলেন। তাহার পরে রুমালে ঘর্ম্মাক্ত ললাট ও মুখ মুছিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বীণা একখানা পাখা লইয়া মাকে বাতাস করিতে লাগিল।

লীলা বিষম বিরক্তি ও রাগে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে ফুলিতেছিল। মিসেস্ রায় ক্ষণকাল পরে তাহার দিকে চাহিয়া আবার আরম্ভ করিলেন—"এই যে বাড়ীতে আরো একটা মেয়ে রয়েছে—কই, কখনো তার জন্য আমাকে কোন দিন একটা কথা শুনতে হয়েছে? সমাজেও আরো পাঁচটা মেয়ে আছে, কিন্তু এ-রকম বেয়াড়া বিঙ্গী মেয়ে

আমি কখনো দেখি নি! মিসেস্ দত্ত এখন কলকাতায় আছেন, তাই আমি এতদিন তোমার এ-সব কীর্ত্তির কথা জানতে পারি নি। তিনি পাঁচ যায়গায় যান, সব খবরই তাই আগে তাঁর কানে আসে। এখন এই যে কথাটা সমস্ত সহরময় লোকের মুখে মুখে রটনা হতে লাগলো, কার মুখে হাত চাপা দেওয়া যাবে, তাই শুনি? আমি বহুকাল থেকেই জানি, যে, এই মেয়ের জন্যই আমায় কোন দিন ঘরছাড়া হতে হবে। অবশেষে ঘট্‌লোও তাই! বীণা! তোমার বাপকে ডেকে আন, তাঁকে সব কথা বলি আগে। এর কিছু বিহিত করেন তো করুন, না হলে আমি এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যাব! তাঁর আদরের মেয়েকে নিয়ে তিনি থাকুন! আমার নিজের বাড়ীতে আমার একটা কথা চলে না—আমি আমি যেন বাড়ীর ঝিয়েদের সামিল। বাইরের লোকে ত তা বুঝবে না—তাদের কাছে এ-সব কাণ্ডের যত-কিছু লজ্জা-অপমান সব আমাকেই পোহাতে হয়।"

বীণাকে আর মিঃ রায়কে ডাকিতে হইল না। মিসেস্ রায়ের উচ্চ স্বর ও গোলমাল শুনিয়া তিনি নিজেই ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিসেস্ রায়ের সম্মুখে লীলাকে ওভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার বেশি বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন,—"এত গোলমাল কিসের? লীলু মা, আজ আবার কিছু করেছ না কি?

তাঁহাকে হাসিমুখে কথা বলিতে শুনিয়া অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। মিসেস্ রায় বলিলেন,—"তোমার লীলু-মাকে নিয়ে তুমি থাক, আমার মেয়ে নিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি! আমাদের মত মন্দ লোকের এখানে ত স্থান নেই! উনি এলেন তামাসা করতে—এত বেয়াদবি আমি সহ্য করতে পারবো না! এতে সব মেয়ে আস্কারা পাবে না?"

মিসেস্ রায় উঠিবার উপক্রম করিতেই মিঃ রায় বলিলেন,—"আরে যাও কোথাও ? কি হয়েছে তাই শুনি না আগে ?"

মিসেস্ রায় বলিলেন,—"শুনবে আর কি ? তোমার শিষ্ট শান্ত মেয়ে অরুণ ঘোষালকে বিবাহ করবেন, কথা দিয়ে এসেছেন ! আমরা আর কে—আমাদের তাই এত দিন কোন কথা বলা দরকার মনে করেন নি। সে বসন্তপুরে কিরণের বাড়ী থাকে। সেইখানে রোজ ঘোড়া ছুটিয়ে উনি তার সঙ্গে আড্ডা দিতে যেতেন। তোমার চোখে ত কিছুতেই দোষ নেই ! তবে সমাজের লোকেরা অত উদার আর বিদ্বান্ নয় তো ! কাজেই কথাটা নিয়ে বেশ চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে—আরো হবে। কার মুখ বন্ধ করবে, তুমি ? জজের মেয়ে বলে কেউ কি ছেড়ে কথা কইবে ?"

মিঃ রায় এ-কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত নেত্রে লীলার মুখের দিকে চাহিলেন—এ আবার কি কথা ! তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল—তাঁহার আদরের লিলির হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা একমাত্র কিরণকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠিতেছে।

—"এ-কথা কি সত্য লিলি ?"—মিঃ রায় অতিশয় গম্ভীর মুখে লীলার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

লীলা শুধু বলিল—"মা সত্য কথাই বলেছেন !"

—"বেশ ! তবে তুমি আমার সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে চলে এসো—সেইখানে সব কথা হবে !"

দুইজনে লাইব্রেরীতে আসিয়া বসিলে, মিঃ রায় কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন,—"এইবার গোড়া থেকে সব কথা আমায় গুছিয়ে বল তো ? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না !"

লীলা এতক্ষণে একটু শান্ত হইয়া তাঁহাকে একে একে সব কথা বলিয়া চলিল। যখন সে অরুণের ভুল সংশোধন না করিয়া নিজেকে বীণা বলিয়া চালাইবার কথা বলিল, মিঃ রায় তখন সেইখানে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এইখানে তুমি বিষম ভুল করেছ, লিলি! এ কাজ কিছুতে তোমার উপযুক্ত হয় নি! যাক—তার পর?"

লীলা আবার বলিতে আরম্ভ করিল। সব বলা শেষ হইলে মিঃ রায় বলিলেন,—"যাক্ সব ভালো যার শেষ ভালো। তার সম্বন্ধে কোন দিন তোমার ক্লান্তি বা অবসাদ আসবে না—এটার বিষয় তুমি স্থির-নিশ্চয় তো?"

লীলা বলিল, "আমি ত বলেছি—সে অসহায় অন্ধ বলেই আমি তাকে ছাড়া অসম্ভব বলে মনে করি! সে জন্য কিছু আটকাবে না।"

মিঃ রায় বলিলেন,—"বেশ, তা হলে আমাদেরো এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। তোমার মাকে আমি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবো। তবে তুমি আর সেখানে এ-ভাবে যাওয়া-আসা কোরো না। সমাজে একটা কুৎসার অবসর দেওয়া আর মার মনে বৃথা কষ্ট দেওয়া কি ভালো? এ-গুলো তোমার এখন বুঝে চলা উচিত।"

লীলা বলিল,—"বাবা! তুমি জান না, আমার সেখানে যেতে দু' এক দিন দেরী হলে সে কি ব্যাকুল হয়ে ওঠে! তাই—!"

মিঃ রায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"কিছু ভেবো না, আমি সব ব্যবস্থা করবো।"

সেই দিনই সন্ধ্যায় মিঃ রায় বসন্তপুরে গিয়া অরুণকে পরম সমাদরে নিজের গৃহে আনিয়া রাখিলেন। তাহার পর হইতে কিরণকে পাটনা সহরে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

৩৫

গভীর রজনীর অন্ধকারের মধ্যে নির্ম্মলা তাহার ঘরের জানালায় বসিয়া দূর আমবাগানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। চারিদিকের ঘন অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আমবাগানের উপর জমাট বাঁধিয়া বাসা করিয়াছে। মাঝে-মাঝে সেই ঘোর আঁধারের মাথায় শত শত জোনাকির আলো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছিল। আকাশে সেদিন চাঁদ ছিল না। কেবল গোটা কয়েক তারা বহুদূর হইতে ঘুমন্ত স্তিমিত চোখে এই রহস্যময়ী ধরণীর দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল।

নির্ম্মলার চোখে সেদিন কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। বহুক্ষণ ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া জানালায় আসিয়া বসিল। ক্লান্তি ও অবসাদে তাহার শরীর-মন যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

অসিতের সেদিন অভুক্ত অবসন্ন অবস্থায় তাহার পিতার নাম শুনিবামাত্র, সেইভাবে তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত সে নিঃস্পন্দ জড়প্রায় হইয়া কাটাইল। তাহার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, বিচার করিবার ক্ষমতা সমস্তই যেন মূর্চ্ছিত, স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন সে কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে বা মনে করিতে পারিত না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে নিরুত্তরে কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। মিঃ ঘোষ নিজের ভাবনায় ও পিসীমা সংসারের ভারে ব্যস্ত থাকায়, তাহার এ ভাবান্তর আর কেহ বিশেষ বুঝিতে পারিল না।

অতর্কিত বিষম আঘাতে তাহার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী এইভাবে কিছুদিন অবসাদগ্রস্ত ও মূর্চ্ছিত থাকিবার পর, আবার ধীরে ধীরে তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। যেদিন নির্ম্মলা

সেদিনকার সমস্ত ঘটনা স্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে পারিল, সেদিন তাহার মনে হইল, সংসার তাহার পক্ষে সবই শূন্য। এখানে সে আর কাহারও নয়, তাহারও কেহ কোথাও নাই। তাহার চারিদিকের সমস্ত বন্ধন যেন এক নিমেষে সর্ব্বদিক হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান তাহার পক্ষে মৃত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মরুময়, আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই লুপ্ত। কেন যে সে এই অসীম শূন্যতার মাঝে তাহার ব্যর্থ জীবনভার টানিয়া টানিয়া বেড়াইতেছে, তাহা সে নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না।

অসিতের কথা মনে পড়িলে নির্ম্মলা তীব্র বেদনায় আকুল হইয়া বুকফাটা কান্না কাঁদিল। এবার সে বেশ বুঝিয়াছে, যে-কোন কারণেই হোক, অসিতের সঙ্গে তাহার পিতার মর্ম্মান্তিক শত্রুতা আছে। অসিত এই কারণেই তাহাদের বাড়ী কোন দিন আসে নাই, ভবিষ্যতেও কোন দিন আসিবে না। তাহার নিজের অজ্ঞাতে দৈবাৎ সেদিন আসিয়া পড়িয়াছিল, পরিচয় পাইবামাত্র ঘৃণায় তাহাদের সঙ্গ ও আতিথ্য পরিহার করিয়া সেই মুহূর্ত্তে চলিয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত নির্ম্মলা বেশ বুঝিতে পারে। কিন্তু অসিত না খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, এই একটা সামান্য ঘটনায় তাহার জীবন কেন যে এমন মরুময় হইয়া উঠিল, এই কথাটা এখনো সে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। যদি তাহার অনুমান সত্য হয়, যদি সত্যই অসিতের সঙ্গে তাহার পিতার কোনও শত্রুতা থাকে, তাহা হইলে অসিত কখনো তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না, এটা স্থির-নিশ্চয়। কিন্তু নাই-বা সে এখানে আসিল? নাই-বা তাহার সহিত কোন সংস্রব থাকিল—তাহাতে এমনই বা কি যায়-আসে? সে কে তাহাদের? একবার দৈবচক্রে দুই ঘণ্টার জন্য তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল—এইমাত্র তাহার সঙ্গে তাহাদের পরিচয়। এই পরিচয়ে নির্ম্মলার জীবনে সে এতখানি

স্থান করিয়া লইল কিরূপে ? সে যাক্ বা থাক্—নির্ম্মলার তাহার জন্য এত ভাবিবার কি আছে ?

নির্ম্মলা অসিতের চিন্তা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য এইসব কথা ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু সে ভুলিতে চাহিলেও তাহার অন্তর এসব যুক্তির দোহাই মানিতে চাহিত না। অসিতের সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হইবে না, এই কথাটা মনে পড়িলেই তাহার বুকের ভিতর হইতে একটা নীরব হাহাকার ঠেলিয়া উঠিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত। তাহার নয়নের মুক্ত অশ্রু আর বাধা মানিত না,—মনে হইত, তাহার ইহ-জীবনের যাহা কিছু একমাত্র কাম্য ও প্রিয়তম বস্তু, তাহা হইতে কে যেন তাহাকে একবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে ! যাহা সে হারাইল, কোন দিন আর তাহা সে ফিরিয়া পাইবে না !

মাঝে মাঝে অসিতের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সে উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিত। সে স্থির বুঝিয়াছিল,—অসিত বা মিঃ ঘোষ কেহই পরস্পরের কাছে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা ত উভয়েই বেশ প্রফুল্লভাবে প্রথমে আলাপ করিয়াছিলেন। সে যখন শেষে গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছে, তখনো মিঃ ঘোষ হাসিয়া হাসিয়া নিজের নাম ও পরিচয় দিয়া অসিতকে তাহাদের বাড়ী আসিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাহাও সে শুনিয়াছে। তাহার পর সে একটু অন্যমনস্ক হইয়া অন্য দিকে চাহিয়াছিল,—পরের কথা আর কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু বার বার একই বিষয় মন দিয়া ভাবিতে ভাবিতে সে এটা বেশ বুঝিয়াছিল যে, সেখান হইতে ফিরিয়াই মিঃ ঘোষের ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। তাহার পর হইতে আর তিনি কখনো

তাহাদের নাম করেন নাই। নির্ম্মলা দুই একবার সে চেষ্টা করিলে, তিনি তাহাকে থামাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার ক্রমশঃ সদা-সশঙ্কিত ভাব,—সর্ব্বক্ষণ নিজের ঘরে একলা থাকা—ঘুমের ঘোরে ভয় পাওয়া,—রাত্রে উঠিয়া নিজের অজ্ঞাতে বিচরণ,—এই সব রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহার পিতার দ্বারা অসিতের কোন বিষম অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তিনি সেদিন আত্মপরিচয় দিবার পরই তাঁহারা দুই জনে পরস্পরকে চিনিয়াছিলেন। তবে দুই একটা কথা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না। মিঃ ঘোষ তাঁহার রাত্রির স্বগত উক্তির মধ্যে প্রায়ই রামগোবিন্দের নাম করিতেন। এ রামগোবিন্দ কে? নির্ম্মলা মনে মনে এ-সব বিষয় আলোচনা করিয়া অনেক বিষয় মিলাইতে পারিত, —আবার অনেক কথা তাহার কাছে অস্পষ্ট রহস্যের মত ছায়াচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইত।

এক এক সময় তাহার মনে হইত, যে তাহার পিতার জীবনের এমন মর্ম্মান্তিক শত্রু, যাহার জন্য তাহার বৃদ্ধ পিতা সর্ব্বদা আতঙ্কে উদ্বেগে মনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় দিন কাটাইতেছেন, সে কোন্ লজ্জায় অহরহ তাহাদের সেই প্রবল শত্রুর ধ্যান করিয়া কাটাইতেছে? মিঃ ঘোষের তন্দ্রাচ্ছন্ন পাংশুবর্ণ মৃতবৎ মুখ মনে পড়িয়া লজ্জায় ধিক্কারে তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে চাহিত। সে তখন প্রাণপণে অসিতকে ভুলিবার, অসিতের প্রতি বিরুদ্ধভাব আনিবার জন্য নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে শ্রান্ত ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিত। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! সে কাহার জন্য কাঁদিবে? কাহার কথা ভাবিবে? উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত দুইজনের জন্যই যে তাহার হৃদয় বেদনায় দুঃখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

কাহাকে রাখিয়া সে কাহার কথা মনে করিবে? নির্ম্মলা কোন দিকে কোন উপায় দেখিল না। দিনের পর দিন এই অনিশ্চিত অবস্থায় ও নিজের ভাবনায় তাহার জীবনে একটা উদাস ভাব আসিয়া তাহাকে একবারে মুহ্যমান করিয়া দিয়াছিল। সংসারের কোন চিন্তা, কোন বিষয় আর তাহার চিত্তে সুখ-দুঃখের কোন তরঙ্গ তুলিতে পারিত না। তাহার উদাস দৃষ্টির সম্মুখে বাড়ীতে সকলের চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম্ম, হাসি-গল্প—সবই যেন ছায়াবাজির পুতুলের নৃত্যের ন্যায় মনে হইত। এক দল আসিতেছে, অপর দল ফিরিয়া যাইতেছে—লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিত,—পিসীমার সঙ্গে মিশির ঠাকুরের রান্না লইয়া গণ্ডগোল আগের মতই এক একদিন তুমুল কাণ্ডে পরিণত হইত। পিসীমার অপার ভাষাজ্ঞানের ক্ষমতায় বিহারী বাজারের হিসাব বা অন্য কোন কাজের ফরমাসে, আগের মতই মধ্যে মধ্যে এক একটা অঘটন ঘটাইয়া তাহার মেড়ুয়াবাদিত্ব সকলের চোখের সামনে প্রমাণ করিয়া তুলিত। কিন্তু এ-সব বিষয় আর কোন দিন তাহার অন্তরে সামান্য কৌতুক-স্পৃহাও জাগাইয়া তুলিতে পারিত না।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একা বসিয়া বসিয়া নির্ম্মলা অসিতের কথাই নিজের মনে মনে ভাবিতেছিল। সে যে আর কোন দিনই তাহাদের দিকে আসিবে না, তাহাদের কোন সংস্রবে থাকিবে না,—তাহার সে দিনের ব্যবহারের পর নির্ম্মলা তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াছিল। কিন্তু তবু মানুষ প্রাণ থাকিতে একেবারে আশা ছাড়িতে পারে না। নির্ম্মলার অন্তরের কোন নিভৃততম প্রদেশের এক কোণে একটি অতি ক্ষীণ আশার রেখাও মাঝে মাঝে ফুটিয়া ওঠে—হয় তো আবার সে একদিন আসিতেও পারে! কেন সে আসিবে—কাহার জন্যই বা আসিবে—সে-সব সে কিছুই ভাবে না—জানেও না। তবু কেমন করিয়া

তাহার যেন মনে বিশ্বাস হয়, না আসিয়া সে থাকিতে পারিবে না। আর সমস্ত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র অসিতের চিন্তাই দিন দিন তাহার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অসিত তাহাকে কি-ভাবে দেখে, নির্ম্মলা মাঝে মাঝে তাহাই ভাবিয়া দেখিত। প্রথমে সে তাহাকে সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহিলা হিসাবেই দেখিয়াছিল, ও সেইরূপ ভদ্র ব্যবহারও করিয়াছিল। সে যে কত যত্নে, কত সন্তর্পণে তাহার আহত রক্তাক্ত হাতখানির সেবা করিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট-কাতর মুখের দিকে সে কি কোমল সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ছিল,—আজো তাহা নির্ম্মলার চিত্তে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহার হাতের উপর অসিতের সেই মৃদু-কোমল স্পর্শের কথা মনে পড়িলে আজো নির্ম্মলার স্পন্দহীন অসাড় চিত্ত চঞ্চল করিয়া একটা পুলকের শিহরণ তড়িৎ-রেখার মত বহিয়া যায়। কিন্তু তাহার পর? যখন হইতে সে তাহাকে তাহার পরম বৈরীর কন্যা বলিয়া জানিয়াছে, তখন হইতে নির্ম্মলার প্রতি তাহার ব্যবহারও বদ্‌লাইয়া গেল। সে তাহার হস্তের সেবা স্পর্শ না করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! তাহার কাতর অনুরোধ গ্রাহ্য না করিয়া অবহেলায় তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন হয় তো নিশ্চয়ই সে নির্ম্মলাকে মনে মনে ঘৃণা করে।

এ চিন্তায় নির্ম্মলার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিল। এ কয়েক মাস অনন্যচিত্ত হইয়া নিশিদিন যাহার চিন্তা তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদানে তাহার ঘৃণা মাত্র সার করিয়া তাহাকে এ দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহিতে হইবে! তাহার ভাগ্যে এমন অঘটন কাহার দোষে ঘটিল? এ চিন্তায় তাহার উভয় নয়ন বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। এই সংসারে তাহার মত কত মেয়ে—যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে পাইয়া

নিশ্চিন্ত আরামে ঘর করিতেছে। তাহাদের জীবনে কোথাও কোন বাধা নাই—কোন বিপত্তি তাহাদের জীবন অশান্ত করিয়া তোলে নাই। আর তাহার বেলা সবই বিপরীত! এই যে তাহার এতদিনকার সরল স্বচ্ছন্দ জীবনে এমন জটিলতা আসিয়া জড়াইয়াছে, এর পরিণাম কোথায়, কি ভাবে দাঁড়াইবে, কে জানে?

মাথার উপর দিয়া কি একটা অজ্ঞাত পাখী ঝটফট করিতে করিতে উড়িয়া গেল! নির্ম্মলা সেই শব্দে চকিত হইয়া চোখ মুছিতেই, সহসা একটা কথা মনে পড়ায়, সে তাহার পূর্ব্বের চিন্তা ভুলিয়া গেল!

বিহারীর সঙ্গে অতিথি-সৎকারের জন্য যখন সে, অতিথি কে তাহা না জানিয়াই ঘরে ঢুকিয়াছিল, তখন তাহাকে অতর্কিত ভাবে সেখানে দেখিয়া অসিতের মুখে যে হর্ষ ও বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, নির্ম্মলা তখন তাহাই ভাবিতে লাগিল! যে সত্যই তাহাকে ঘৃণা করে, সে কি কখনো তাহাকে দেখিয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারে? আর কেনই-বা সে তাহাকে ঘৃণা করিবে? সে তো বেশ ভালোই জানে—নির্ম্মলা কোনও দোষে দোষী নয়? এ-চিন্তায় সে মনে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইয়া নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সেই সময় বারাণ্ডার ধারে খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। নির্ম্মলা চাহিয়া দেখিল—মিঃ ঘোষ বিজ্ বিজ্ করিয়া বকিতে বকিতে তাঁহার ঘর হইতে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! হাতে এক তাড়া কাগজ! নির্ম্মলা নিজের চিন্তা ভুলিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার নিকট উঠিয়া গেল।

৩৬

অরুণ মিঃ রায়ের গৃহে অতিথিরূপে আসিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ও সুখী হইল। আর তাহাকে লীলার নিকট হইতে বহু দূরে থাকিয়া কেবল তাহার আশাপথ চাহিয়া দিন কাটাইতে হইবে না। এখন সে সর্ব্বক্ষণই প্রায় লীলাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাইত। মিঃ রায় সত্যই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মিসেস্ রায় ও বীণা তাহার প্রতি নিজেদের ব্যবহার স্মরণ করিয়া একটু কুণ্ঠিত হইলেও, তাহার মধুর প্রকৃতির গুণে তাঁহারা আর তাহাকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। মিঃ রায়ের অনেক চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ মিসেস্ রায় লীলার প্রতি বিরাগ ভুলিয়া তাহার বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। সমাজে সকলের নিকটই প্রচার হইয়া গেল—লেফ্‌টেনেণ্ট ঘোষালের সঙ্গে মিঃ রায়ের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।

লীলা সমস্ত দিন তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজগুলির মধ্যেও অরুণের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। সন্ধ্যায় কোন কোন দিন তাহার মা ও বীণার সঙ্গে ক্লাবে আসিত, কিম্বা অরুণের নিকট থাকিয়া তাহার লেখার সাহায্য করিত। মনের অবস্থা ভাল থাকায় অরুণের পুস্তক দ্রুত পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার শরীর ও মনে এত উন্নতি হইল যে, সে অনেক সময় তাহার দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত ফিরিয়া পাইবার আশা করিত। তাহার সুন্দর কান্ত রূপের ছটা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের দীপ্তি যেন দিন দিন ফাটিয়া পড়িতেছিল। লীলা তাহার এ পরিবর্ত্তনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেও মনে তাহার কোন শান্তি ছিল না। সমস্ত দিন সে সকলের সঙ্গে, নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া, তাহার অন্তরের জ্বালা ভুলিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু যখন দিনশেষে সব কর্ম্মের অবসান হইয়া যাইত, যখন রজনীর

নীরব অন্ধকারে বাড়ীতে সকলেই যে-যাহার ঘরে গভীর সুপ্তির মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িত, তখন নিজের ঘরে একা বসিয়া লীলার নয়নের অশ্রু আর বাধা মানিত না।

গভীর মনস্তাপে ও অভিমানে যে মানুষটি মর্ম্মাহত হৃদয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া এই বিপুলা ধরিত্রীর কোন্ নিভৃত কোণে নিজেকে লুকাইয়া রাখিল, আর কি কোনও দিন সে লীলার কাছে ফিরিয়া আসিবে? লীলার সমস্ত হৃদয়-মন যে তাহারই জন্য আকুল আগ্রহে সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে! কিরণের সেই প্রশান্ত দৃষ্টি—যে দৃষ্টি লীলার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইলেই তাহাকে বুঝাইয়া দিত, 'আমি তোমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি'—সেই নীরব দৃষ্টির মর্ম্ম রহিয়া রহিয়া লীলার অন্তরে স্বচ্ছ প্রতিকৃতির মত ফুটিয়া উঠিত। তাহার এক এক দিনের এক একটি কথা—'আমার বলবার কিছু নেই, লীলা! শুধু আমি জীবনে-মরণে তোমারই, সেই কথা তোমায় জানিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম, তোমায় পাই, না পাই, আমি তোমারই'—উল্টিয়া পাল্টিয়া লীলার মনে সেই সব কথাই শত শত বার নানারূপে উদিত হইয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত। হায়! এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় সে এ কি করিয়া বসিল? তাহার প্রিয়তমকে সে নিজের বুদ্ধির দোষে এমন বেদনা ও দুঃখ দিয়া কোন্ অকূলে বিসর্জ্জন দিল? কিরণের স্মৃতি যে তাহার অন্তর-বাহিরে সমস্তই জুড়িয়া রহিয়াছে, আজ সে কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে সেই স্মৃতির মূল উৎপাটন করিয়া তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিবে?……

* * * *

কুমার ভূপেন্দ্রভূষণ সেদিনের পর হইতে আর মিঃ রায়ের গৃহে বা ক্লাবে কোথাও আসেন নাই। বীণাও তাহার পর হইতে অধিকাংশ সময় বাড়ীতে নিজের ঘরের মধ্যেই কাটাইত। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সে লীলার সঙ্গে কথা বলিত না। অপরাহ্নে মায়ের সঙ্গে একবার ক্লাবে আসিত, তাও অত্যন্ত গম্ভীর নির্লিপ্তভাবে! লীলা তবু কিছুদিন তাহার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিল, যাহাতে সে কুমারের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিতে বা সাক্ষাৎ করিতে না পারে। ক্রমশঃ তাহারও বিশ্বাস হইল,—বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

এক সপ্তাহের পর এক দিন সন্ধ্যার সময় ক্লাবে মিসেস্ রায় লীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাড়ী যাবার সময় হয়েছে। বীণা কোন্ দিকে গেল দেখতে পাচ্ছি না, তাকে ডেকে নিয়ে এসো।"

কথাটা শুনিয়াই লীলার মনে সন্দেহ হইল, এই তো সে খানিক আগে বীণাকে হলের মধ্যে দেখিয়া গিয়াছে,—ইহার মধ্যে সে আবার কোন্‌খানে গেল?

সে মাকে কিছু না বলিয়া সমস্ত ঘরগুলি, বারাণ্ডার প্রত্যেক কোণ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল—সকলেই তখন প্রায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ কোথাও নাই। কেবল দুই একটি বয়ঃস্থা মহিলার সঙ্গে তাহার মা হলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার মনে হইল, বীণা বাগানের দিকে যায় নাই তো? তখনি সে বাগানের দিকে ছুটিল। প্রকাণ্ড বাগানের সকল দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একজন খানসামা তাহাকে ওরূপ ভাবে ঘুরিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বীণার কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

খানসামা বলিল, "তিনি তো বাগানের দিকে আসেন নি,—সন্ধ্যার আগে তাঁকে একবার ছাতের উপর দেখেছিলুম।"

লীলা তখন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত-চিত্তে ছাতের উপর উঠিল। প্রকাণ্ড ছাত—এক দিক হইতে অন্য দিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। লীলা কিছুক্ষণ ব্যর্থমনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে দেখিল, ছাতের শেষের দিকে এক কোণে কাহারা যেন বসিয়া আছে।

সে তখনি সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যাইতেই দেখিল—হাঁ! তাহার অনুমান সত্যই বটে! একখানা বেঞ্চের উপর কুমার গুণেন্দ্রভূষণ বসিয়া—তাহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বীণা কাঁদিতেছিল!

ভাঙ্গা ভাঙ্গা চাঁদের আলো তাহাদের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, লীলার ছায়া পড়িতেই তাহারা উভয়ে চমকিত ভাবে মুখ ফিরাইল! লীলাকে দেখিয়াই দুইজনে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল!

এই দৃশ্য দেখিয়া লীলা রাগে জ্ঞান হারাইল! কি ঘৃণা! কি লজ্জা! তাহার আপনার সহোদরা ভগিনী—তাহার এই কাজ! কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলিতে পারিল না,—কেবল রক্তিম নেত্রে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

লীলার সম্মুখে ওরূপ অবস্থায় পড়িয়া বীণা ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

কোন ছাত্র গুরুতর দোষ করিয়া শিক্ষকের নিকট ধরা পড়িয়া গেলে তাঁহার যেমন ভাব দাঁড়ায়, কুমারের প্রায় তদ্রূপ ভাব। অত্যন্ত বিব্রত ও অপ্রস্তুত হইয়া সে বুকে দুই হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে লীলা নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া বীণাকে বলিল, "তুমি নীচে যাও, মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন! আমি এই লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে একটু পরে যাচ্ছি!"

বীণা অত্যন্ত ভয় পাইয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমি মার কাছে এখনি যাচ্ছি, কিন্তু লিলি! সত্য বলছি, ওঁর কোন দোষ নেই এতে! ওঁকে তুমি কিছু বোল না—আমিই একটা কথা বলবার জন্য ওঁকে আজ ডেকে এনেছিলুম!"

লীলা সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"বলছি না তোমায় এখনি নীচে চলে যেতে! তোমার কাণ্ড দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি! আবার ওকালতি করতে লজ্জা হচ্ছে না? যাও—নীচে নেমে যাও! এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়—এখনি!"

লীলার চোখে আগুন জ্বলিতেছিল! বীণা আর কিছু বলিতে সাহস না করিয়া সজল করুণ দৃষ্টিতে একবার উভয়ের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার পর লীলা কুমারের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জ্বলন্ত দৃষ্টি কুমারের মুখে স্থির রাখিয়া অত্যন্ত উদ্ধত স্বরে বলিল, "বীণার সঙ্গে এমন নির্জ্জনে দেখা করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? সেদিন বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনি কোন্ সাহসে আমার কথা অমান্য কল্লেন?"

কুমার একবার লীলার মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার শঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। অত্যন্ত নম্রস্বরে বলিল, "এজন্য আমায় দোষী করবেন না, মিস রায়! আপনার ভগিনীর অসামান্য রূপ-লাবণ্যই এর জন্য দায়ী—আমিও ত সেদিন আপনাকে বলেছিলুম, এত সহজে আমি বীণার আশা ছাড়তে পারবো না—"

"—অভদ্র বেয়াদব! ভদ্রভাবে কথা বলবার সহবৎ পর্য্যন্ত যার নেই, তার আশা আর স্পর্দ্ধা একেবারে অমার্জ্জনীয়! এ-সব লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা আমারই অন্যায় হয়েছে! যাক্—আমি যে-কথা দিয়েছিলুম, আজকার ব্যবহারের পর আর সে-কথামত চলবার প্রয়োজনীয়তা থাকলো না! তোমার মত কুকুরকে সায়েস্তা করতে যে-রকম ব্যবহার করা উচিত, এবার সেই রকম ব্যবহারই করা যাবে!"

লীলা নামিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই কুমার বলিল,—"কিন্তু এটা বড় অন্যায় হচ্ছে আপনার! যদিও আপনার মত সুন্দরীর গালাগালি শোনা আমার সৌভাগ্যের বিষয় বলেই আমার মনে হয়, তবু কথাটা যে আপনার ক্রমশই অত্যন্ত রূঢ় হয়ে উঠছে, সে-কথা বাধ্য হয়ে বলতে হলো! আমার এতে দোষটা কি?"

লীলার মূর্ত্তি ক্রোধে ও উত্তেজনায় ক্রমশঃ ভীষণ হইয়া উঠিতেছিল। সে একবার অগ্নিময় দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। যদি সেখানে তখন হাতের কাছে কোন কিছু থাকিত, তাহা হইলে সে তখনি কুমারকে মারিয়া বসিত! কিছু দেখিতে না পাইয়া সে বলিল, "শুধু কথায় তোমার আর কি হবে? কি বোলবো—আজ আমার হাতে কিছু নেই। চাবুকটা হাতে থাকলে, দোষটা যে কি, ভাল করে একবার বুঝিয়ে দিতুম!"

কুমার কিছুক্ষণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে লীলার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাঃ! এ যে একেবারে আগুনে-ভরা! সত্য বলছি, মিস্ রায়! আমি আপনার একজন কত বড় মুগ্ধ ভক্ত, আপনি সেটা বোঝেন না! আমার তাতে এত দুঃখ হয়!"

লীলা আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি নামিতে

লাগিল। তাহার দেরি দেখিয়া মিসেস্ রায় হয় ত [illegible]স্ত হইয়া উঠিতেছেন!

কুমার সঙ্গে সঙ্গে নামিতে নামিতে বলিতে লাগিল—"অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একটু আস্তে আস্তে নামুন না! আমি কি এতই অভদ্র যে, আমার পাশে একটু দাঁড়ালেও আপনার ক্ষতি হবে? কেনই যে আমার উপর আপনার এত বিরাগ, তা' তো কিছু বুঝি না!

লীলা তাহার কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া নামিতেছিল। যখন তাহারা সিঁড়ির সর্ব্বশেষ চাতালে আসিল, তখন কুমার বলিল,—"মিস্ রায়! একটু দাঁড়ান্! অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি সত্যই বলছি—আমার আপনাকে কিছু বলবার আছে!"

লীলা বলিল,—"আমি এ-সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনতে চাই না, বলবারও আমার আর কিছু নেই! এবার যা কিছু করণীয় আছে—তারই ব্যবস্থা করা যাবে!"

কুমার বলিল—"আমি আবার বলছি—এক মুহূর্ত্ত স্থি[illegible] হয়ে আমার কথা শুনুন! আপনি হয়ত কাল সকলের সমক্ষে আমার যত-কিছু কলঙ্কের কথা প্রকাশ করে দিতে পারেন, মিঃ রায় হয় ত আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তাতে আপনার ভগিনীর সুনাম বজায় থাকবে কি? আমি অবশ্য তখন মূক হয়ে থাকবো না—এটা নিশ্চয়—বিশেষ আজকের ঘটনার পর! আপনি নিজেই দেখেছেন, সে আমার সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে! তা ছাড়া—আমি সব সময় আট-ঘাট বেঁধে কাজ করি—এটা আমার স্বভাব। আজ যখন বীণাকে নিয়ে ছাতে আসি, তখন দুজন খানসামাকে ডেকে লেমনেড ও বরফ খেয়েছি। তারা এই নির্জ্জন ছাতে আমাদের দুজনকে খাইয়ে গেছে—বকৃশীসও পেয়েছে প্রচুর! দরকার হলে তারা এ-কথা সকলের কাছেই

বলতে পারবে! এখন ভেবে দেখুন—আমার সঙ্গে ঝগড়াটাই বজায় রাখবেন, না—কোন সর্ত্তে একটা রফা কর্ব্বেন?” লীলা কথাটা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া নিস্ফল আক্রোশে অস্ফুটস্বরে বলিল, “কাপুরুষ শয়তান!” তাহার পর সেইখানে দাঁড়াইয়া কি করা উচিত—ভাবিতে লাগিল।

লীলাকে তদবস্থ দেখিয়া কুমার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, “এই যে! এতক্ষণে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে দেখছি! আমার বক্তব্যটা এই বেলা বলে নি, তা হলে! দেখুন—আপনি চেষ্টা করলে আমায় প্রকাশ্যে তাড়াতে পারেন, তা আমি স্বীকার করছি; কিন্তু তার শেষ ফল ভাল হবে না। যতক্ষণ আমি জানবো যে, বীণার আমার প্রতি অনুরাগ সমভাবে অব্যাহত রয়েছে, ততক্ষণ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি আমায় কোনরূপেই তফাৎ করতে পারবেন না। তার উপর আমার প্রভাব যে কতদূর, তা আপনি জানেন না,—আমি তাকে যেদিকে ফেরাবো, সে ঠিক সেই দিকে ফিরবে। তবে সে যদি নিজের মুখে আমায় বলে, যে, আর আমার প্রতি তার সে-ভাব নেই, কিম্বা যদি স্বইচ্ছায় পত্র লিখে আমায় জানায়, যে, আমাকে আর সে চায় না,—তা হলে আর কখনো আমি তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখব না। সে যেখানে থাকবে, আমি তার ত্রিসীমার মধ্যে পদার্পণ করবো না। কেবল এই একটিমাত্র সর্ত্তে আমি তার উপর সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি আছি। আর আমি—পথের কুকুর, কাপুরুষ, ইতর,—যাই হই, কথার ঠিক যে রাখি, আপনি সেটা বিশ্বাস করতে ও তার পরীক্ষা গ্রহণ করে দেখতে পারেন!” কথা শেষ করিয়া কুমার অত্যন্ত বিনম্রভাবে লীলাকে নমস্কার করিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

সে রাত্রে বাড়ী আসিয়া বীণা যে কি ভয়ানক দুষ্ট ও ধূর্ত্ত লোকের কবলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে সমর্পণ করিয়াছে,—লীলা তাহাই ভাবিতে লাগিল। কুমার যাহা বলিয়াছে, তাহার পক্ষে তাহা করা অসম্ভব নয়—দুর্ব্বলপ্রকৃতি বীণার উপর তাহার শক্তি যে অজেয়, তাহাও এখন লীলা বুঝিয়াছে। বীণাকে দিয়া এখন পত্র লেখান ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

কিন্তু এ ব্যাপারটি বিশেষ সহজসাধ্য হয় নাই। বীণা এ-সর্ত্তে কিছুতেই সম্মত হইতে চায় না। সে কেবল বলিতে লাগিল, "আমি তাঁকে সব কথা বলেছি, তিনিও সব অন্যায় স্বীকার করেছেন—তিনি সে মেয়েটির সম্বন্ধে খুব ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন—আর আমার জন্য এবার তিনি নিজের স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করবেন। যদি এখন আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়, তা হলে আর কখনো তিনি ভাল পথে ফিরতে পারবেন না। তাই আমি এ-রকম চিঠি কখনো লিখতে পারবো না। লিলি! তুমিও কথাটা ভেবে দেখ—একটা দোষ হয়েছে বলেই কি একেবারে এত কঠোর হওয়া উচিত? তার চেয়ে তাঁকে কিছুদিন সময় দেওয়া যাক্। দেখ—তিনি তাঁর কথা রাখতে পারেন কি না। যদি না হয়—তখন এ-রকম চিঠি লেখা যাবে।"

লীলা কিন্তু তাহার সমস্ত যুক্তি, মিনতি, অশ্রু—সব উপেক্ষা করিয়া অনেক শাসন ও ভয় প্রদর্শনের পর নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার মনের মত পত্র লিখাইয়া লইল ও তখনি নিজে গিয়া সেই পত্র পোষ্ট করিয়া আসিল।

এ-সব শেষ হইলে তাহার মনে হইল, বিপদ হয় ত কাটিয়া গেল, কিন্তু তবু তাহার মন স্থির হইল না—কারণ, বীণার উপর তাহার কোন আস্থা ছিল না। সে তাহার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিয়া চলিত।

৩৭

সেদিন প্রত্যূষে চোখ খুলিয়া অরুণ এতদিনের শূন্যতার পরিবর্ত্তে তাহার পূর্ব্বপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখিয়া বিস্মিত স্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে দেওয়ালের ছবিগুলি ঝুলিতেছে!

অরুণের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল! সে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? সে উভয় হস্তে চোখ মুছিয়া ভয়ে ভয়ে আবার চাহিল—ওই যে সত্যই দেওয়ালে ছবি! এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড!

বিষম উত্তেজনায় অরুণ অধীর হইয়া উঠিল! এ কি সত্য যে সে আবার দেখিতে পাইতেছে? আরও নিঃসন্দেহ হইবার জন্য সে তাহার হাত চোখের গোড়ায় ধরিল! ঐ তো! হাতের পাঁচটা আঙুল স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

অর্দ্ধ-সন্দেহ ও অর্দ্ধ-বিশ্বাসে সে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রত্যেক জিনিষটির সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। ঐ তো চেয়ার, তার পাশে আলনায় কাপড় সাজান রহিয়াছে—পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যা—সেখানে এখনো সে শুইয়া আছে! ঐ ড্রেসিং টেবিলযুক্ত বৃহৎ আয়না—টেবিলের উপর সাজ-সজ্জার উপকরণ সজ্জিত—সবই ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

বিষম আনন্দে ও বিস্ময়ে সে খড়খড়ির পাখীগুলি পর্য্যন্ত গণিতে আরম্ভ করিল! তাহার সে সময়কার হর্ষ ও উল্লাস বর্ণনাতীত।

অরুণ ভক্তি-নত হৃদয়ে ভগবানের উদ্দেশে বার-বার প্রণাম করিল। হে ভগবান্, তুমিই ধন্য! যেমন অতর্কিতে আমার দৃষ্টি হরণ করিয়াছিলে, আবার তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে তাহা ফিরাইয়া দিলে!

অত্যন্ত উত্তেজনায় তাহার মাথার শিরা দপ দপ করিতেছিল!

তবু সে বার বার তাহার নবলব্ধ দৃষ্টি ঘরের চারিদিকে ফিরাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

আজ সে কোন চাকরকে তাহার পোষাক পরিবার সময় সাহায্য করিতে ডাকিল না। নিজেই উঠিয়া পোষাক পরিল। যতক্ষণ লীলা না জানে, ততক্ষণ আর কাহাকেও এ-কথা জানাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

তাহার কালো চশমা চোখে দিয়া সে নিজেই বাগানে বেড়াইতে লাগিল। এতদিন সে যে-সব দৃশ্য কল্পনায় দেখিত, আজ সে-সবই পরিষ্কার! তাহার চশমার ভিতর হইতে সে মাঠের সমস্ত দৃশ্যই দেখিতেছিল!

মাঠের ধারে সেই সব শ্রেণীবদ্ধ ফুলের গাছ, লম্বা বড় বড় গাছের ঘন-সন্নিবিষ্ট পত্রশ্রেণী—গোলাপ গাছের সারে বড় বড় সুন্দর গোলাপ ফুটিয়া স্বর্গীয় সুষমায় বাগান আলো করিয়া আছে। এই সেই চাঁপাগাছতলার বেদী—লীলা ও বাড়ীর সকলে ক্লাবে গেলে, এই বেদীতে সে বৈকালে আসিয়া বসে!

বেড়ার ওধারে টেনিস কোর্ট দেখা যাইতেছে—যেখানে সে বহু—বহু দিন আগে সর্ব্বদা খেলিতে আসিত। যদিও গণনায় বেশি দিন নয়—তবু যেন মনে হয়, কত দিন কাটিয়া গিয়াছে!

অরুণ মনের আনন্দে একটা সিগারেট জ্বালাইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। আজ আর তাহাকে যষ্টির সাহায্যে পথ চিনিতে হইবে না। কখন্ তাহার পথে কি বাধা আসিয়া পড়িবে, সেই আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকিতে হইবে না! আজ মুক্তির এ কি বিপুল আনন্দ!

দূরে একজন মালী গোলাপ গাছের মাটি কাটিতেছিল। সে অরুণকে এত ভোরে বাগানে একা ঘুরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া

চাহিয়া রহিল! মিঃ রায়ের আরদালি তাহার পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে অন্ধ জানিয়া সেলাম না করিয়াই প্রতিদিনের মত চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অরুণ উঠিয়া লীলার ঘরের দিকে চলিল। লীলা টেবিলের উপর ফুল সাজাইতেছিল,—অরুণ চশমা খুলিয়া তাহাকে ডাকিল—"লীলা!"

লীলা তাহাকে প্রতিদিনের মত অন্ধ জানিয়া মুখ না তুলিয়াই সাদরে বসিতে বলিল—"বেশ ত! আজ যে খুব ভোরেই উঠেছ দেখছি! রোজ এমনি সকাল করে উঠলেই ত ভাল হয়!"

বীণার স্মৃতি অরুণের চিত্তে জাগিয়া উঠিল। সেই পুতুলের মত সুন্দর ভাবশূন্য মুখের পরিবর্ত্তে এ কি অপূর্ব্ব প্রাণবন্ত বুদ্ধি ও প্রতিভায় উজ্জ্বল সুশ্রী মুখ! অরুণ লীলার সুঠাম সরল একহারা আকৃতির দিকে চাহিল। তাহার তরুণ মুখে হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল দীপ্তিময় চক্ষু দুটির দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! হয় ত অনিন্দ্যসুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু ভালবাসিবার উপযুক্ত! আর অরুণের নিজের কাছে পৃথিবীতে একমাত্র কাম্য বস্তু!

অরুণের চিত্ত দুর্নিবার আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। লীলা—সংসারে রূপে-গুণে এমন দুর্ল্লভ রত্ন—সে একমাত্র তাহারই! অরুণ ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া আবার ডাকিল—"লীলা!"

লীলা এবার হাসিয়া মুখ তুলিল—"কেন অরুণ?"

অরুণের দিকে চাহিতে লীলা অবাক্ হইয়া গেল! অরুণের চোখে-মুখে এ কি দুরন্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস! সে আজ না হাতড়াইয়া সোজা লীলার কাছে গেল, তাহার হাত হইতে ফুলগুলি লইয়া হাতখানি নিজের গলায় জড়াইয়া ধরিল! আর কিছু বলিবার প্রয়োজনও ছিল না!

তাহার পরিষ্কার চক্ষুর দিকে চাহিয়া লীলা সবই বুঝিল! আজ এ কি বিভিন্ন মুখ সে দেখিতেছে! এ মুখ যে প্রাণে পূর্ণ, দৃষ্টিতে ভরা! যে-চোখ এতদিন লক্ষ্যশূন্য ও বিষাদ-তমসায় আচ্ছন্ন ছিল, আজ সেই চোখ ভাবে ও ভাষায় পূর্ণ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে!

"—তুমি তবে দেখতে পেয়েছ, অরুণ?" শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়াই লীলা অপ্রত্যাশিত আনন্দে ও সুখে কাঁদিয়া ফেলিল!

অরুণ তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিল! সে বলিল— "আজকার দিনে কাঁদো কেন, লীলা? আজ যে আমাদের শুভদৃষ্টি!"

অরুণের আরোগ্য-সংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইয়া পড়িতেই চারিদিকে একটা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল! লীলার আনন্দে সবাই আনন্দিত!

মিঃ রায় কথাটা শুনিয়াই চায়ের টেবিল হইতে উঠিয়া আসিয়া অরুণকে গভীর স্নেহে বক্ষের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার অন্তরের বিপুল আনন্দ সেই নীরব আলিঙ্গনের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইতেছিল।

মিসেস্ রায় আসিয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ মুগ্ধ নয়নে অরুণের দৃষ্টির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার প্রতি, তাঁহার নিজের ব্যবহার মনে হইয়া লজ্জা ও অনুতাপে তাঁহার হৃদয় মথিত হইতেছিল। অরুণ যখন তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তখন সেই বহুদিন পূর্ব্বের অরুণকে ঠিক আগের দিনের মত ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার চিত্তে সুখের ও তৃপ্তির আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল।

বাড়ীর চাকরেরা সকলে আসিয়া সহর্ষে তাহাকে অভিনন্দন

করিল! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্ হইল, বীণার! এক সময় যাহাকে ভালবাসিয়া সে তাহার সহিত বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিল, আজ এত কাণ্ডের পর আবার তাহার কাছে কিরূপে সহজভাবে গিয়া দাঁড়াইবে, এই সঙ্কোচ ও লজ্জা তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

অরুণ তাহার কুণ্ঠা বুঝিতে পারিয়া নিজেই তাহার কাছে গিয়া অত্যন্ত সহজভাবে আলাপ করিয়া তাহার প্রথম সঙ্কোচ কাটাইয়া দিল।

অপরাহ্ণে সে লীলার সঙ্গে ক্লাবে গেল। সেখানে পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের আনন্দ ও অভিনন্দন তাহার সে-দিনটাকে স্মরণীয় করিয়া তুলিল।

পরদিন অরুণ তাহার নবলব্ধ চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মত জানিতে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

৩৮

অরুণের ডায়েরী হইতে—

"অমাবস্যা রজনীর গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের পর শুক্লা তিথির শশধর যেমন জোছনার সুধাধারায় পৃথিবী প্লাবিত করে তোলে, আমার জীবনাকাশের অমানিশার ঘোর কৃষ্ণ স্তর ভেদ করে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত ফুটে উঠে লীলা তেমনি তার প্রেম ও হাসির কিরণে এ হতাশ মরুময় জীবন আবার বর্ণে গন্ধে গানে ভরে দিয়েছিল! অনাকাঙ্ক্ষিতকে পাওয়ার তীব্র সুখে অন্তর তখন পরিপূর্ণ— অন্ধের চিরদুঃখ সে-সুখের বন্যায় ভেসে গেছে! নিত্য নব নব উৎসবে নবীন জীবনকে বরণ করে নেবার আগ্রহে বাহ্যজগৎ যেন বিস্মৃতির অতল সাগরে ডুবে গিয়েছিল! হায়! তখন তো জানতুম না, সুখের অন্তরালে দুঃখ, হাসির ভিতর অশ্রু, নিয়ন্তার নিয়মে চিরন্তন কাল

থেকে চলে আসছে ! তাই কি আজ আমার সে জাগ্রত স্বপ্ন মায়ার খেলার মত এক মুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল ?

কলকাতায় এসে চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসকের মত জানলুম। তিনি বল্লেন, এ-রকম আরোগ্য হওয়ার দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত বিরল,—নেই বল্লেও চলে। যা হোক্, এই নূতন দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত সাবধানে রাখতে হবে। চোখের অতিরিক্ত পরিশ্রম, মনের কোন প্রকার উত্তেজনা বা দুঃখ,—এক কথায়, শারীরিক বা মানসিক যে-কোন প্রকার কষ্ট একে নষ্ট করে দিতে পারে। এ-সব জিনিষ যথাসাধ্য পরিহার করে চলবেন। সুস্থ শরীর, প্রফুল্ল মন, পুষ্টিকর খাদ্য—এই সব সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম মেনে চললে চশমা ব্যবহার করে চিরজীবন দেখতে পাবেন। চলে আসবার সময়ও তিনি আবার ডেকে বারবার সাবধান থাকৃতে বলে দিলেন। ভেবেছিলুম, আরো দু'-এক দিন থেকে বেড়িয়ে যাওয়া যাবে, কিন্তু আর ভাল লাগলো না। কি যে হয়েছে—লীলাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও একা থাকা যেন অসহ্য বলে মনে হয়। সে যেন দিন দিন আমার জীবনের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে যাচ্ছে !

কাজ শেষ হতেই পাটনায় ফিরবো বলে হাওড়া ষ্টেসনে চল্লুম। ট্রেন ছাড়তে দেরী ছিল। সামনের প্লাটফরমে একটু পায়চারি কচ্ছি,—হঠাৎ কিরণের সঙ্গে দেখা ! সে একটা ছোট সুট্‌কেস হাতে নিয়ে বেগে আস্‌ছিল—বোধ হয় ট্রেণ ধরতেই। আমার উপর দৃষ্টি পড়তেই, সে একেবারে অবাক্ হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে গেল ! হাওড়া ষ্টেসনের প্লাটফরমে আমি একা স্বাধীনভাবে বেড়াচ্ছি—সে বোধ হয় এ-ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গেলে, কিরণ আমার সামনে এসে

আমার হাত ধরলে! আমার সৌভাগ্যের কথা বলে তার মনের আনন্দ জানিয়ে সে আমায় অভিনন্দন করলে!

আমি কিন্তু তাকে দেখে সুখী হতে পারলুম না! তার ব্যবহারে পূর্ব্বের সে আন্তরিকতার লেশমাত্র ছিল না। তার মুখের সে সদা-প্রফুল্ল আনন্দময় ভাবের পরিবর্ত্তে যেন একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষম কঠোরতার ছায়া!

আমার অজ্ঞাতসারে বুকের ভিতর দিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ঠেলে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমরা দুজনে যে একটি মাত্র নারীকেই ভালবেসেছি! সেই ভালবাসা আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা প্রতিবন্ধকের মত ঠেলে উঠে আমাদের সমস্ত হৃদ্যতার অবসান করে দিয়েছে! সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমি বুঝলুম, অন্ধ হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের উভয়ের যে বন্ধুত্বের আমরা গর্ব্ব করতুম, অন্ধ হয়ে, ও সারা সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধহীন হয়েও, যে বন্ধুত্বের অগাধ স্নেহের শীতল ছায়ায় আমি আশ্রয় পেয়ে জুড়িয়েছিলুম,—সহোদর ভায়ের চেয়েও অধিক সেই স্নেহ, সেই বন্ধুত্ব, এ জীবনে আর কোন দিন ফিরে আস্‌বে না!

কিরণের কথা থেকে বুঝলুম, সে এতদিন ব্রহ্মদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশে শান্তিহীন, বিরামহীন প্রেতের মত তার অশান্ত চিত্তের বিক্ষোভ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সম্প্রতি তার জমিদারী-সংক্রান্ত কোন বিশেষ কাজে প্রয়োজন হওয়ায় সে বাড়ী ফিরছে!

আমার এতদিনের সব কথা সে নীরবে শুনলে, কিন্তু সে লীলার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনলে না। আমি দু'-একবার তার সম্বন্ধে কথা বলতে যাওয়ায়, অন্য কথা পেড়ে আমায় থামিয়ে দিলে। তার সেই অসম্ভব রকম কঠিন ও গম্ভীর মুখ দেখে, আমি তাকে তার নিজের বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না!

আমরা দুজনে একই গাড়ীতে উঠলুম। নিজেদের সম্বন্ধে সব কথা শেষ হলে, সাধারণ ভাবে সাময়িক প্রসঙ্গ ও যুদ্ধের কথার আলোচনা করতে করতে রাত্রি শেষ হয়ে এলো!

লীলা আমায় নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী নিয়ে ষ্টেসনে অপেক্ষা করছিল। আমায় গাড়ী থেকে নামতে দেখে সে হাসিমুখে চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটে আস্‌ছিল। সহসা আমার পিছনে কিরণকে নাম্‌তে দেখে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মধ্যপথে স্তব্ধ মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়ে গেল! তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে তাকে অসম্ভব রকম সাদা দেখাচ্ছিল। তার সমস্ত দেহের প্রবল কম্পন আমি দূরে দাঁড়িয়েও দেখতে পাচ্ছিলুম! সে-দৃশ্য দেখে আমার মনে হলো, চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে আমারও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে!

আমার এতদিনের সাজান তাসের প্রাসাদ একটি ফুৎকারে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল! আজ আমি সবই বুঝলুম! সবই নিজের চোখে দেখলুম! ভগবান্, এই দৃশ্য দেখাবার জন্যই কি আমার এতদিনের নষ্ট-দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দিয়েছিলে! ওঃ! কি প্রতারিত হয়েছি আমি! যে নারী নিশিদিন মনে মনে অন্য পুরুষের ধ্যান করছে, আমি কি না তারই জন্যে—হায়! এ-দৃশ্য দেখবার আগে আমি আবার অন্ধ হলুম না কেন?

বুকের ভিতর একটা প্রকাণ্ড আঘাত লেগেছিল! আমি নিজেও মূর্চ্ছাগ্রস্তের মত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম,—কিরণের কণ্ঠস্বরে আমার চৈতন্য ফিরে এলো! সে তখন লীলার কম্পিত হাতখানি ধরে গাড়ীতে তুলে দিতে যাচ্ছিল। আমায় ডাকতে, আমিও নীরবে তাদের সঙ্গে চল্লুম। লীলার সেই একই ভাব। তার মুখে

কথা ছিল না। কিন্তু কিরণ যেন অকস্মাৎ কথায় গল্পে মুখর হয়ে উঠলো!

তার এ চালাকি আজ আমি সবই বুঝতে পারলুম! তার উপস্থিতি লীলাকে যে কি-রকম বিচলিত করেছে, তা সে বুঝেছিল! যাতে লীলা সুস্থ হতে সময় পায়, আর তাদের এ ভাবান্তর আমি যাতে না বুঝতে পারি, সেই জন্যই তার এ প্রচেষ্টা!

তার মোটর বাহিরে তাকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের মোটরে আমাদের দুজনকে তুলে দিয়ে সে নিজের গাড়ীতে উঠে চলে গেল।

লীলা বোধ হয় আমার এ-ভাব লক্ষ্য করেছিল। সে একটু সুস্থ হয়েই তার হাতের উপর আমার হাতখানা টেনে নিয়ে সস্নেহে আমার চোখের কথা জিজ্ঞাসা করলে!

আর চোখ! চোখের কথা তখন আমার মনেও ছিল না। দারুণ অভিমানে আমার চোখ জলে ভরে এল! অনেক কষ্টে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আমি তার হাত দুটি ধরে জিজ্ঞাসা করলুম—"লীলা, সত্য করে বল—আমি তোমার হাত ধরবো, এ কি এখনো তোমার ইচ্ছা হয়?"

"—নিশ্চয়ই! কিন্তু এ-কথা কেন বললে অরুণ?" লীলা এত সহজ ও অকুণ্ঠিত ভাবে কথাটা বলে আমার মুখের দিকে চাইলে, যে, সে-সময় আমি আর কোন কথা বলতে পারলুম না।

শুধু প্রাণপণ আগ্রহে সজোরে তার হাত দুটি জড়িয়ে এমন চেপে ধরে রইলুম, যেন কে তাকে আমার কাছ থেকে জন্মের মত ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

সেই দিন থেকে আমার মনের সমস্ত সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে সর্ব্বদা যেন একটা বিষের দাহন আরম্ভ হল। যখন আমি জেনেছিলুম,

কিরণ লীলাকে ভালবাসে, তখন আমার তার উপর কোন রাগ বা ঈর্ষা ছিল না। কিন্তু ষ্টেসনে সেদিন লীলার অবস্থা দেখে পর্য্যন্ত আমার ধারণা হল, লীলাও কিরণকে ভালবাসে! না হবেই বা কেন—তারা দুজনে বহুদিন থেকে দুজনের বন্ধু,—সকল দিক থেকেই তারা দুজন পরস্পরের উপযুক্ত। কিন্তু কথাটা এই—কিরণ লীলার—লীলা কিরণের —এই যদি হয়, তবে এদের মাঝখানে আমি কে? আমি তবে কোথায় দাঁড়াই!

এক এক সময় আমার মনে হত, আমার জন্য তারা উভয়েই হয় ত কষ্ট পাচ্ছে, আমার উচিত এখন নিজে থেকে সরে দাঁড়িয়ে লীলাকে তার সর্ত্ত থেকে মুক্তি দেওয়া। যদি আমি এ সংকল্প-মত কাজ করতে পারতুম, তাহলে সেটা খুব ভালই হত। কিন্তু আমার প্রচণ্ড ঈর্ষার তাড়নায় অন্তরের এ উদারতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না। লীলাকে কিরণের হাতে তুলে দেবার কথা মনে হলেই আমার ভিতরকার সমস্ত পৌরুষ গর্জ্জন করে উঠতো! লীলা স্বেচ্ছায় এসে আমার কাছে ধরা দিয়েছে, সে আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী, তার উপর সব দিক থেকে আমার অধিকার পূর্ণতর, আমি তাকে কার খোস-খেয়ালের জন্য অপরের হাতে তুলে দিতে যাব?

বাড়ী এসে সেদিন তাকে সে-কথা বল্লুম,—"তোমার কিরণকে দেখে যে অবস্থা হলো, আমি যে সে-দৃশ্য দেখে কি আঘাত পেয়েছি, সে তোমায় না বলাই ভালো। এক জনের বাগ্‌দত্তা পত্নী যদি অন্যের সম্বন্ধে এ-ভাব পোষণ করে, তার ভাবী স্বামীর সেটা কি রকম লাগে —সে আমিই বুঝেছি; আমি তোমাকে কোন শক্ত কথা বলতে চাই না, লীলা! কিন্তু সেদিন আমার মনে হল, আমি যদি আবার অন্ধ হয়ে যেতুম, ত ভালই হত।"

তার মুখে তীব্র বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো! সে শিউরে উঠে বলে উঠলো—"ছি! অরুণ! অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না!" তার পর সে খুব সরল ভাবেই বল্লে—"বাস্তবিক সেদিন অতর্কিতভাবে তাকে দেখে কেন যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লুম, তা নিজেই বুঝতে পাচ্ছি না! কিন্তু অরুণ! আমার উপর কি তোমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই? এই সামান্য বিষয় নিয়ে তুমি কি করে এত অসম্ভব সব কথা ভাবলে?"

আশ্চর্য্য! সে যখন আমার কাছে থাকে, তখন তার মুখ দেখে, তার কথা শুনে আমার মন পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন আমার বিশ্বাস হয়—সে আমারই; আমি হিংসায় অধীর হয়ে তার সম্বন্ধে এই সব বিরুদ্ধ ভাব পোষণ কচ্ছি!

আমি সেই মুহূর্ত্তে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বল্লুম, "মাপ করো লীলা! আমি হয় ত বড় অকৃতজ্ঞ! হয় ত এ-সবই আমার কদর্য্য মনের প্রকাশ! আমি কিন্তু আগে এ-রকম ছিলুম না। এখন যে একটুতেই আমার আঘাত লাগে সে শুধু তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি বলে! আর কেউ তোমায় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে—এ-চিন্তাও যেন আমায় পাগল করে তোলে!"

লীলা বল্লে,—"কেউ আমায় তোমার কাছ থেকে নিতে পারবে না, অরুণ! তুমি সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক!"

লীলা মুখে যাই বলুক, আমি কিন্তু তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি—কিরণ আসবার পর থেকে সে যেন দিন দিন অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছিল। এতদিন সে প্রায় সর্ব্বক্ষণ আমারই কাছে কাছে থেকে, আমার বই পড়া শুনে, বেশ আনন্দে ও স্ফূর্ত্তিতেই কাটাতো। এখন আর তার সে প্রফুল্লতা দেখতে পাই না। সে যেন সব সময়ই কেমন উন্মনা—সর্ব্বদাই যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব!

আরো একটা বিষয় প্রায়ই আমার চোখে ধরা পড়তো,—লীলা কিছুতে কিরণের সঙ্গে মিশতে বা দেখা করতে চাইত না। পাছে তার সঙ্গে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায়, তার জন্য সে সর্ব্বদা বিশেষ চেষ্টা করে সতর্ক হয়ে চলে। হয় ত সে আমার জন্যই এত সাবধান হয়ে থাকে, হয় ত তাকে কিরণের সঙ্গে দেখলে আবার আমার মনে ঈর্ষা জেগে উঠবে, সেই আশঙ্কা তাকে প্রতিনিয়ত এ-ভাবে দূরে দূরে রাখতো। কিন্তু সে জানে না, যে, তার এই অতি-সতর্কতাই প্রতি দিনে প্রতি পলে আমার অন্তরে তুষানলের জ্বালা জাগিয়ে রেখেছে! নিশিদিন এই সংশয়—এই ঈর্ষা—আমায় যেন পাগল করে তুলছিল। আমার লেখাপড়া, আমার রচনা, আমার মনের শান্তি সবই এই সর্ব্বগ্রাসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, লীলা কিরণের সঙ্গে কোন্ ভাবে চল্‌লে আমি সুখী হই, তা আমি নিজেই জানি না। যখন সে তার সঙ্গ ছেড়ে তফাৎ হয়ে থাকতো, তখন দেখে দেখে আমার যেন গাত্রদাহ হত—কেন, সে তার আর-পাঁচটা পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে যেমন করে মেশে, গল্প করে, টেনিস খেলে, কিরণের সঙ্গে তেমনি সরল ভাবে মিশলেই ত হয়! আমি কি তাকে সে-ভাবে মিশতে বারণ করেছি যে, সে সর্ব্বক্ষণ তাকে পরিহার করে চলছে? সে যে তার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবহার করে, তা থেকেই ত মনে হয় যে, কিরণের সঙ্গে আর সবাইয়ের মত তার শুধু বন্ধুত্বের সম্বন্ধই নয়! সে নিশ্চয়ই কিরণকে অন্য সবার চেয়ে বিশেষভাবে দেখে—না হলে তার সঙ্গে সহজ ভাবে মেশে না কেন?

আবার যদি কখনো দৈবাৎ তাদের দুজনকে আমি কাছাকাছি দেখতে পেতুম, যদি তারা নিতান্ত সাধারণ ভাবে দু-একটা কথা বলছে

—বা কোন কথার ছলে হাসছে, এ দৃশ্য যদি আমার চোখে পড়তো, অমনি যেন আমার শরীরের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ফুটতে থাকতো, মাথার শিরা সব দপ্ দপ্ করে জ্বালা করতে থাকতো, একটা ভীষণ জিঘাংসায় ও প্রচণ্ড আক্রোশে কিরনকে ছিঁড়ে ফেলবার উদ্দাম বাসনা আমাকে তখন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পাগলের মত করে তুলতো। তার সঙ্গে আমার এতদিনের বন্ধুত্ব, তার আমার প্রতি এত স্নেহ-ভালবাসা—সে সবই তখন মন থেকে মুছে গিয়ে, কেবল ভীষণ প্রতিহিংসা ও রাগ যেন আমায় রক্তপিপাসু দানবের চেয়েও ভীষণ ও দুর্দ্দম করে তুলতো! এ কি হলো? আমার এ যে কি ভয়ানক অবস্থা হলো—আমি কিছু বুঝতে পারতুম না।

লীলার আদরে ও ভালবাসায় ভুলে গিয়ে আবার যখন আমি প্রকৃতিস্থ হতুম, তখন আমার নিজের অন্তরের পরিচয় পেয়ে ভয় ও ভাবনায় আমায় বিমর্ষ করে দিত। আমি কি অবশেষে এমন ভয়ানক স্বার্থপর—নরাকারে ঘোর হিংস্র রাক্ষসে পরিণত হলুম? আমার এতদিনের এত উচ্চ শিক্ষা, সাধনা, সংযম, ভদ্রতা—সে-সবের অবশেষে এই চরম ফল ফললো? আমার ভিতরে এমন দানবীয় প্রকৃতি, এত হিংসা—এত দিন কেমন করে সুপ্ত ছিল?

লীলার আমার কাছে যাওয়া-আসা, আমার কাছে থাকা—সবই দিন দিন সংক্ষেপ হয়ে আসছিল। আগে দিনের বেশির ভাগ সময় সে আমার কাছেই কাটাতো। এখন অনেক সময় দিনান্তে একটিবারও তার দেখা পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। যদি-বা কখনো আসে, খানিক বসেই ব্যস্ত হয়ে উঠে যায়!

আমার ভাগ্যে শান্তি-সুখ হবে না, এবার তা ভাল করেই বুঝতে পাচ্ছি! কিন্তু আমার অবস্থা এমনি হয়ে উঠেছে, যে, লীলার আশা

ছাড়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। কেবল আমার মনে হয়—কোন রকমে আমাদের বিবাহ চুকে গেলে, তাকে এই সব সংস্রব থেকে একবার দূরে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি! আমার খুব বিশ্বাস, সে কিছুদিন শুধু আমার কাছে থাকলেই, এ-সব ভুলে আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠবে!

সেদিন বিকেলে বসে বসে এই কথাটাই ভাবছিলুম। টেবিলের উপর আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে ছিল, তাতে আর মন লাগছিল না। লীলার সঙ্গে না হলে আজকাল আর আমার কোন কাজই হ'তে চায় না। সে আজকাল আর এ-সবে মন দিতে পারে না,—তাই আমারও সব উৎসাহ কমে গেছে!

লীলা এসে আমার কাছে বোস্‌ল! কয়দিন আমি তার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিনি। যদি আমার সঙ্গ তার ভাল না লাগে, তো মিছে জোর করে আর কি হবে?

কিন্তু আজ আমার মনে তার এ উপেক্ষা বড়ই বাজ্‌ছিল। তাই থাকতে না পেরে বল্লুম,—"আজকাল তুমি প্রায়ই আমার কাছ থেকে দূরে থাক! আমি অবশ্য সেজন্য তোমায় কিছু বলছি না,—তুমি সুখী আছ জানলেই আমি সন্তুষ্ট থাকি। তবে এক এক সময় মনে হয়, তোমার বুঝি আর আমায় ভাল লাগছে না!"

লীলার মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল—"তুমি এ-সব কথা কি করে ভাব, অরুণ? তোমার সঙ্গে আমার জীবন-মরণের সম্বন্ধ। এ কি ছেলেখেলা, যে, দু'দিন ভাল লাগলো—তিন দিনের দিন ভাল লাগলো না—তফাৎ হয়ে গেলুম? দেখ দেখি—যত সব বাজে কথা ভেবে ভেবে এই কদিনে কি রকম রোগা হয়ে গেছ?"

লীলা আমার মাথাটা তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তার স্পর্শের মধ্যে কি কিছু মায়ামন্ত্র আছে ? তার প্রতি আমার মর্ম্মান্তিক সন্দেহ, আমার নিজের মনের দুর্নিবার জ্বালা—সব যেন এই মধুর স্পর্শে ও আদরে জুড়িয়ে গেল !

সে যখন আমার কাছে থাকে, আমি যেন তখন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হয়ে যাই ! তার কাছ থেকে তফাৎ হলেই যত সব অসম্ভব কল্পনা ও অদ্ভুত চিন্তা আমার মাথার মধ্যে গজিয়ে ওঠে। আমার মনের এই সহজ ভাষাটা সে যদি এমনি করে বুঝতো !

খানিক চুপ করে থেকে লীলা বল্লে,—"আমার মনটাও কদিন থেকে ভাল নেই, অরুণ ! বীণা একটা অত্যন্ত মন্দ লোকের সঙ্গে মিশ্‌ছে ! তাকে সেই লোকটার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমি বড় ব্যস্ত আছি। সেই জন্য তোমার কাছে থাকতে সময় পাই না। মেয়েরা সে লোকটার কাছে শুধু খেলার জিনিষ। বীণা বড় দুর্ব্বল—তার জন্য আমার ভয় হয়।"

আমি বল্লুম,—"বীণা যে-প্রকৃতির মেয়ে, আর সে যে-ভাবে চলে, তাতে তার বিপদে পড়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আমি যে তোমা-ছাড়া থাকতে পারি না। তুমি এই সব কাজে চারিদিকে ব্যস্ত থাক, আর একলা থেকে থেকে আমার মন খারাপ হয়ে যায়,—কত সব অদ্ভুত অসম্ভব কথা মাথায় আসে। তুমি আর তোমার চিন্তা আমায় সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত স্বপ্নে ঘিরে আছে ! আমি শুধু একটি মাত্র আশা ও চিন্তায় বেঁচে আছি—কবে আমি তোমায় এখান থেকে ও এখানকার সকলের কাছ থেকে নিজের স্ত্রী বলে জোর করে বাড়ী নিয়ে যেতে পারবো !"

লীলা একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে,—"সেদিনটা এলে আমিও এ-সব ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচি ! আমার শরীর-মন ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

তবু আমার এমনি স্বভাব—কাজ হাতের কাছে থাকলে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। ভাল কথা—কাল সকালে আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব না, অরুণ! কাল আমাকে একবার এখানকার জেনানা-মিশনের কর্ত্রী মিস নেল্‌সনের কাছে যেতে হবে।"

কাল সকাল থেকেই লীলা আবার কোথায় যাবার বন্দোবস্ত করছে? কথাটা ভাল লাগল্লো না! বল্লুম—"কেন? সেখানে কি দরকার?"

লীলা তার উত্তরে এক অদ্ভুত গল্প আমায় শুনিয়ে শেষে বল্লে, —"জোছনার দুর্গতি আমায় বড় আকুল করে তুলেছে। তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে মিশনের আশ্রয়ে রেখে আসতে পারলে আমি এখন নিশ্চিন্ত হই। সেই বিষয়ে কথা স্থির করতে কাল আমি মিস্ নেল্‌সনের কাছে যাব।"

আমি আর কিছু না বলে চুপ করে রইলুম। বিশ্ব-সংসারের সকল ভার, সকল বোঝা সাম্‌লাবার কাজটা কি একা লীলার ঘাড়েই পড়েছে? আশ্চর্য্য মেয়ে যা হোক! যে দুনিয়াশুদ্ধ লোকের কথা নিয়ে অহরহ মাথা ঘামিয়ে বেড়াচ্ছে, তার মনে আমার জন্য স্থান কতটুকু? আমার কথা ভাববার তার অবসরই বা কোথায়?

আজ যেমন সে জোছনার কথা শুনে অযাচিত ভাবে তার মঙ্গলের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, প্রথম প্রথম আমার কথা শুনেও এমনি করে সে আমার কতটুকু ভাল করতে পারে, তাই দেখতে আমার কাছে গিয়েছিল! আমি আজ বেশ বুঝছি, এর মধ্যে হৃদয়ের সম্বন্ধ কোন দিনই ছিল না—থাকবেও না! আমার একান্ত আগ্রহে, আমায় নিতান্ত অসহায় দেখে, সে শুধু দয়া করে এ বিবাহে মত দিয়েছে। তার মনের আসল টান যে কোন্ দিকে—সে কি জানতে আমার আর বাকি আছে?

সমস্ত রাত ভাল করে ঘুম হলো না! শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবছিলুম,—খামকা একটা খেয়ালের মাথায় আমার সঙ্গে এ মিথ্যা অভিনয় করবার লীলার কিছু কি দরকার ছিল? আমি ত সংসারের সঙ্গে সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই বসেছিলুম! আমার সে-সময়কার আশাহত উদাস চিত্তে বাসনার কোন লক্ষণ, কোন আশা-আকাঙ্ক্ষাই ছিল না ত! নিয়তি আমার ভবিষ্যতের জন্ত যে জীবন নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিল, সেই জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেবার প্রাণপণ সাধনায় আমি যখন কৃতকার্য্য-প্রায় হয়েছি, তখন লীলা গিয়ে আবার আমার প্রাণে নতুন সুখ, নতুন আশা জাগিয়ে সংসারের পথে টেনে নিয়ে এলো! আমি ত তাকে জানতুম না, আমি ত তাকে কোন দিন চাইনি। আজ আমি যে মর্ম্মবেদনা ও হিংসার তাড়নায় অধীর হয়ে উঠেছি, এর মূল ত সে নিজেই! তখন নিজের একটা খেয়ালের বশে আমায় অত আশা দিয়ে ফিরিয়ে এনে আজ সে আমার সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে! তার কারণ এখন সে বেশ বুঝেছে—আমি এখন সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে! আমি যতই রাগ করি, যতই যা করি, তাকে ছেড়ে যাবার আমার সাধ্য নেই! ভগবন্! এই নারী জাতটাকে তুমি কি দিয়েই যে সৃষ্টি করেছিলে! এদের কি মায়া দয়া বলে, হৃদয় বলে কোন জিনিষ নেই? মানুষের জীবন, মানুষের সুখ-দুঃখ (এদের কাছে শুধু খেলা করবার জিনিষ?

ভেবে ভেবে ও রাতে ঘুম না হয়ে মাথার মধ্যে—চোখের ভিতর বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল! শিরগুলো সব টন্ টন্ করতে লাগ্‌লো! ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম!

মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বেড়াতে যাবার জন্ত বেরিয়ে পড়া

গেল। বাড়ী বসে বসে করবই বা কি? একলা বসে বসে অনর্থক কতকগুলো ভাবনা ছাড়া আর ত কোন কাজই নেই! কেনই যে বৃথা এখানে থেকে মিঃ রায়ের অন্ন ধ্বংস করছি, তাও জানি না।

অনেক দূর পর্য্যন্ত একলা হেঁটে হেঁটে চলে গেলুম। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়িয়ে শরীর ও মন যেন অনেক হাল্কা বোধ হলো! একটু রোদ চড়তেই বাড়ী ফেরবার জন্য মন ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো! লীলাও হয় ত এতক্ষণ বাড়ী ফিরেছে! এত যে দুর্গতি হচ্ছে, তবু রাতদিন মনে লীলার কথাই জাগতে থাকে!

বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালুম! রাস্তার ধারে মোড়ের মাথায় লীলা ও কিরণ পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে গল্প করতে করতে আসছে! তারা আমায় দেখতে পায়নি! মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো! তাল সামলাতে আমি পিছিয়ে এসে একটা গাছের উপর মাথাটা রাখলুম! তারা দূরে গাছের পাশ দিয়ে মৃদু ক... ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল!

আমি প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম! আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী—আমার এতদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু—তাদের এই কাজ! এইজন্য আমার ভুলিয়ে রেখে অন্য জায়গায় যাবার নাম করে তারা দুজনে পূর্ব্বের কথামত এখানে এসে মিলিত হয়েছে! লীলা—যাকে স্বর্গের দেবী বলে আমার এত দিন ধারণা ছিল,—সেও যদি নিতান্ত চপল-প্রকৃতি সাধারণ মেয়ের মত এই জঘন্য প্রতারণা আর ছলনার খেলা খেলতে পারে, তবে আর আমার জীবনে ফল কি? এমন পাপের সংসারে থেকে অহরহ চাতুরী ও মিথ্যার মুখোস পরে এ বীভৎস অভিনয় করবার জন্যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা শতগুণে ভালো! আমি সেই গাছতলায় সংজ্ঞাশূন্যের মত বসে পড়লুম! বাড়ী ফিরতে আর ইচ্ছা

ছিল না—ফিরেই বা হবে কি? তার সঙ্গে দেখা হলেই, আমি কোন কথার মধ্যে এ-কথা তাকে বলে ফেলবো, আর সে তখনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে, আদর করে, দু'কথায় আমায় ভুলিয়ে দেবে—এই ত? এ-সব ত এতদিন যথেষ্ট হলো—আর কেন?

ধীরে ধীরে আমার ক্লান্ত অবসন্ন অন্তরে আবার সেই আগের মত উদাস ভাবের ছায়া ঘনিয়ে আসছে! অনেক দিনের অনেক বোঝা, অনেক জঞ্জাল জীবনের সঙ্গে জট পাকিয়ে গিয়েছে। হৃদয় আমার তার ভারে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত। ভগবান্—এবার আমায় মুক্তি দাও! এ ব্যর্থ জীবনের বোঝা আর আমি বইতে পাচ্ছি না!

সংসারে এসে মানুষ সুখের আশায় কেবল তৃষিত অন্তরের বুকফাটা পিপাসায় মরীচিকার পিছনে উন্মাদপ্রায় হয়ে ছুটতে থাকে,—তৃষ্ণা কিন্তু তার কখনো মিটলো না! কি করেই বা মেটে? এখানে কিই-বা পাবার মত আছে—যা সে পেতে পারে? স্নেহ, দয়া, মায়া—ও-সব কথার কথা! জননীর স্নেহ, বন্ধুর বিশ্বস্ত ভালবাসা, স্ত্রীর নিঃস্বার্থ প্রেম—এসব বড় বড় কথা কাব্যে, সাহিত্যেই লাগে ভাল। এ-সবের উপর রং ফলিয়ে, অনেক কথার জাল বুনে বুনে, বেশ একটা চমৎকার উপভোগ্য বিষয় রচনা করা যেতে পারে,—কিন্তু বাস্তব জীবনে এ সবের মুল্য কতটুকু? প্রত্যেক মানুষই তার জীবন দিয়ে এ-কথার সত্যতা অল্প-বিস্তর বুঝেছেই; তবু তাদের কেমন যে স্বভাব—এই বড় কথাগুলো বলা চাই-ই। আমি কিন্তু এর আগাগোড়াই ভুয়োবাজি বলে বুঝেছি। জীবন-ভোর যে তৃষ্ণায় মন জ্বলতে লাগলো—কখনো সে জ্বালার শান্তি ত হলো না। কোন দিন কোন কিছুই ত পেলুম না।

কিন্তু কোন দিনই পাই নি কি? একবার হয় ত কিছু

পেয়েছিলুম—তবে তার মর্য্যাদা ত আমি রাখি নি। হয় ত বা তারি ফলে আমার আজ এই দশা! লিজির কথা মনে হলেই আমার মনে হয়—যেন সুদূর সমুদ্রপার থেকে সে সেই বিদায়-দিনের সন্ধ্যার শিশিরাপ্লুত শতদলের মত অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে! কিন্তু তার কথা আজ আর ভেবে কি হবে?

তারা এতক্ষণ হয় ত বাড়ী ফিরে গেছে! আমার এত দেরি দেখে লীলা কি ভাবছে, কে জানে? আমার প্রতি তার সত্য মনের ভাবটা কি, তা যদি একবার নিশ্চিত জানতে পারতুম! কত দিন কতবার এ-কথা তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, কোন দিনই স্পষ্ট উত্তর পাই নি! সে খালি আমায় ভালবাসি বলে ভুলিয়ে রাখতে চায়। অথচ এখনো সে যে কিরণকে ভুলতে পারে নি, মনে মনে যে সে এখনো তার প্রতিই অনুরাগিণী—তা ত প্রতিপদেই বোঝা যাচ্ছে!

মনের এই দ্বন্দ্ব নিয়ে, সর্ব্বক্ষণ সংশয়ের জ্বালায় সুখ-শান্তি স[illegible] বিসর্জ্জন দিয়ে সংসার আঁকড়ে পড়ে থাকা আর পোষায় না। [illegible]র ভাগ্যের ফল নিজেরই নীরবে সহ্য করা উচিত। আমি আর এই সব নিয়ে বোঝাপড়া করে অন্যের শুদ্ধ শান্তি নষ্ট করতে চাই না। * *

সেই নবীন প্রভাতে, হতাশ উদাস চিত্তে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমার অভিমান-ক্ষুব্ধ অন্তরে বার বার কেবল এক কথাই উদয় হতে লাগলো—আজকের এই মধুর প্রভাতে এমনি নির্জ্জনতার মধ্যে এখনি আমার এ ব্যর্থ জীবনের অবসান হোক্!

৩৭

কুমার গুপেন্দ্রভূষণকে সেই পত্র জোর করিয়া লিখাইয়া লইবার পর হইতে বীণা আর লীলার ধারে আসিত না। বৈকালে ক্লাবে যাওয়া

বা টেনিস্ খেলা সে প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে সর্ব্বদা নিজের ঘরে বসিয়া লেখাপড়া বা চিঠিপত্র লেখার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিত। লীলা কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিত না। তাহার সন্দেহ হইত, হয় ত বীণা প্রকাশ্যে কুমারের সঙ্গে আলাপ না রাখিয়া পত্র দ্বারা গোপনে সম্বন্ধ রাখিয়াছে। কিন্তু সে ত তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার চিঠিপত্র লইয়া দেখিতে পারে না, কাজেই, তাহাকে কেবল বীণার প্রতি কড়া নজর রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।

মিসেস্ রায় কুমারের এত দিনের অদর্শনে মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। লীলা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল, কুমার বিশেষ কাজের জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

লীলা নিজে সব চেয়ে বিপদে পড়িয়াছিল অরুণকে লইয়া। কিরণের পাটনায় আবার ফিরিয়া আসার পর হইতে অরুণ লীলার প্রতি বিষম সন্দেহ ও ঈর্ষার জ্বালায় উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। লীলা নিজে তাহার দুর্ব্বলতার বিষয় জানিত এবং অরুণের এ ঈর্ষা যে একেবারে অমূলক নয়, তাহা বুঝিয়া, সে সেই প্রথম দিনের পর হইতে সাধ্যমত কিরণকে পরিহার করিয়া চলিত। কিন্তু তাহার কোনও চেষ্টাই অরুণকে সুখী করিতে পারিত না। লীলার তাহার নিকট আসিতে একটু দেরি হইলেই সে রাগিয়া অভিমান করিয়া অনর্থ বাধাইয়া তুলিত। বীণার জন্য ভাবনা, তাহাকে সর্ব্বদা দৃষ্টির মধ্যে রাখা, এই সব কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, সে আজকাল পূর্ব্বের মত সর্ব্বক্ষণ অরুণের নিকটে থাকিতে পারিত না। অরুণ সেইজন্য দুর্জ্জয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া নিজে মনে মনে নানা অসম্ভব কল্পনা ও চিন্তায় নিরর্থক তাহাদের মধ্যে একটা বিষম অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিত।

এই মানসিক ব্যাধির জন্য এই কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছিল।

এই সব বিসদৃশ চিন্তার ফলে আবার হয় ত তাহার চক্ষুর ক্ষতি হইতে পারে, সেই ভয়ে লীলা প্রাণপণে অরুণকে আদর করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু সর্বক্ষণ অরুণের বিষম বিরক্তি ও ঈর্ষার ফলে তাহারও মন অবসন্ন হইয়া পড়িত ও এই স্বার্থপর প্রেমের তুলনায়, যাহাকে সে ভুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহার নিঃস্বার্থ মহৎ প্রেম ও তাহারই নাম অহরহ তাহার অন্তরে বাজিতে থাকিত।

সেদিন মিস্ নেল্‌সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জোছনার বিষয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লীলা যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, সেই সময় পথের মোড়ে কিরণের সহিত তাহার দেখা হইল। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া লীলা অন্য পথে পলাইতে যাইতেছিল; কিন্তু কিরণ সত্বর ঘোড়া ছুটাইয়া তাহার পাশে আসিয়া পড়ায়, অগত্যা লীলা হাসিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল।

কিরণ সহজভাবে তাহাকে বলিল যে, সে এই সপ্তাহে শিশুদের জন্য একটি উৎসবের আয়োজন করিতেছে। সেই উপলক্ষে ক্লাবঘর সাজান, আলোর বন্দোবস্ত এবং ভোজের আয়োজন ইত্যাদি কাজে লীলার সাহায্য তাহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথা বলিবার জন্য সে আজ দুই দিন হইতে লীলাকে খুঁজিতেছিল।

সহরের ছোট ছোট ছেলেরা ছিল কিরণের অত্যন্ত প্রিয়। সে প্রতি বৎসর দেওয়ালী পর্ব্বের সময় তাহাদের জন্য একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করিত। আলো, বাজি, নানা প্রকার খেলা, বাজনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার আমোদ-প্রমোদের

ব্যবস্থা থাকিত। এ বৎসর সে দেওয়ালীর সময় বাহিরে থাকায় সে উৎসব হয় নাই। কিন্তু এখন সে যখন ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন শিশুদের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে সে চায় না। দেওয়ালী হইয়া গেলেও তাহারা ক্লাবঘরে ঠিক সেই মত একটা আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছে।

কিরণ যখন কথা বলিতেছিল, লীলা সেই অবসরে তাহাকে দেখিয়া লইল। তাহার মুখে যে অন্তরের বেদনার ছায়া, তাহা আর আরোগ্য হইবার নয়! সে পূর্ব্বাপেক্ষা কি কৃশ হইয়া গিয়াছে! তাহার উন্নত প্রসন্ন ললাটে চিন্তা ও বিষাদের গভীর রেখা! শুষ্ক মুখ ও অধরোষ্ঠের দিকে চাহিলে মনে হয়, হাসি ও আনন্দ যেন ও-মুখ হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়াছে!

কিন্তু তবু এই মুখ লীলার কত প্রিয়! পৃথিবীতে সকলের চেয়ে এই মুখই সে একান্ত ভালবাসিয়াছে! কিন্তু আজ? আজ ভালবাসা দূরে থাক্, তাহার চিরদিনের বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে সে পূর্ব্বের মত স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করিতেও পারিবে না! আজ সে অন্যের বাগ্দত্তা। পরে যখন আবার তাহার সহিত দেখা হইবে, তখন হয় ত সে অপরের বিবাহিতা পত্নী!

লীলার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল। সে তাহার কম্পিত অধরোষ্ঠ দাঁতে চাপিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিতেছিল।

কিরণ তাহার সহিত সাধারণ বন্ধুর মতই কথা বলিতেছিল। যে-বাধা তাহাদের মধ্যে ব্যবধান তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে যাওয়া অসম্মানজনক। কিন্তু স্মৃতি তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বের কথা অনুক্ষণই জাগাইয়া রাখিয়াছে!

কিরণের কথা শেষ হইলে লীলা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া

বলিল,—"ভালই হল! একটা দিন সবাই মিলে রান্না-খাওয়া, ঘর-সাজানো—সব কাজ ভাগাভাগি করে বেশ আমোদে কাটান যাবে! তা হলে কখন্ যেতে হবে?"

কিরণ বলিল,—"একটু সকাল সকাল যাবার চেষ্টা করো! আমি ত সেদিন সকাল থেকেই সেখানে থাকবো।"

—"অরুণকেও নিয়ে যাব ত?"

লীলার এ-কথায় কিরণ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিল,—"হাঁ! তাকেও নিয়ে যেও!"

এ প্রসঙ্গ শেষ হইলে তাহারা দুইজনে বাড়ী ফিরিবার জন্য দুই বিভিন্ন পথে চলিয়া গেল। লীলার মনে হইতেছিল, একবার সে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আগের মত সহজ ভাবে 'কিরণ' বলিয়া ডাকে! আর সে তাহার সঙ্গে এত চাপিয়া চাপিয়া চলিতে পারে না। কিন্তু তবু সে মনের আবেগ মনেই চাপিয়া রাখিল, এটুকু ঘনিষ্ঠতা করিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না।

বাড়ী আসিয়া লীলা দেখিল, অরুণ তখনো বেড়াইয়া ফেরে নাই। ক্রমে বেলা বাড়িয়া রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল; অরুণ তখনো বাড়ী আসিল না। লীলা ক্রমে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল—আজ সে একলা কোথায় কোন্ দিকে গেল? এত দেরি ত সে কোন দিনই করে না? ক্ষান্ত আসিয়া বলিল, "বামা আজ সহরের দিকে এসেছিল। তা সে তোমাকে বলতে বলে গেছে, সে লোকটা বামার হাতে টাকা দিয়ে কেবলই রোজ বলছে, তুই জোছনাকে আমার বাড়ী থেকে সরিয়ে নিয়ে যা! তা হ্যাঁ গা দিদিমণি, হাজার হোক সে ভদ্দর লোকের মেয়ে, ভদ্দর লোকের বউ,—আমার বোন তাকে নিয়ে রাস্তায় কোথায় দাঁড়াবে, বল ত? সে মুখপোড়া তা বুঝবে না, খালি নিয়ে যা আর

নিয়ে যা, এই করছে! তা তুমি যে বলেছিলে সে ছুঁড়ির একটা ব্যবস্থা করবে? যদি কিছু করতে পার ত একবার চেষ্টা করে দেখ না। মেয়েটা ত কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে।”

লীলা সেইমাত্র জোছনার ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়াছে। সে ক্ষান্তকে বলিল,—“আমি সে সব ঠিক করেছি। আর দুচার দিনের মধ্যেই তার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তোর বোনকে বলিস্, তার জন্য আর ভাবতে হবে না।”

ক্ষান্ত হৃষ্ট চিত্তে চলিয়া গেল। লীলা কুমারের পৈশাচিক প্রকৃতি ও এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল! বীণাকে তাহার কবল হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে তাহারও এই দশা অনিবার্য্য!

অরুণ সেদিন অনেক বেলায় শ্রান্ত অবসন্ন দেহে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে শুইয়া পড়িল। লীলা অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়াও তাহাকে কিছুতেই প্রফুল্ল ও প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। সে তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য কিরণের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলিল,—তাহার উৎসবের কথা, ও কিরণ তাহাদের সে উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে সব বলিল।

অরুণ তাহার কোন কথাতেই যোগ দিল না, শুধু বলিল,—“আমি সবই জানি। যখন তোমরা আলাপ করছিলে, তখন আমি সবই দেখেছি। যাতে তোমরা সুখী হও, তাই করো, আমি কারো সুখের অন্তরায় হতে চাই না।”

তাহার মুখ দেখিয়াই লীলা তখনি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইল। সে মিশনে একা যাইবে বলিয়াছিল, কিন্তু অরুণ তাহাকে পথে কিরণের সঙ্গে দেখিয়া অন্যরূপ ভাবিয়া লইয়াছে!

বিষম বিরক্তি ও অপমানে লীলা নিস্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার প্রতি অরুণের যদি সামান্য বিশ্বাসও না থাকে, সে যদি তাহাকে নিতান্ত চপল স্ত্রীলোকের মত অসার বলিয়াই জানিয়া থাকে, তবে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়াই উচিত।

এবারে লীলা অন্যান্য বারের মত অরুণকে ভুলাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া নীরব হইয়া রহিল। তাহার এই ভাবান্তরে অরুণ আরও দমিয়া গেল। তিন চার মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে কাটাইয়া অবশেষে সে যখন লীলার সঙ্গে আবার কথা বলিতে গেল, তখন লীলা বলিল,—"অরুণ! তুমি মনে দুঃখ করো না, আমি বাধ্য হয়ে হয় ত দু একটা রূঢ় কথা বলে ফেলেছি! তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তাতে আমার উপর যদি তোমার সামান্য বিশ্বাসও না থাকে, তা হলে অনর্থক এ বন্ধনে বদ্ধ হবার সার্থকতা কি, আমি ত বুঝতে পারি না। যারা এত হিংসা করে, তারা এতে নিজেদের যে ক্ষতি করে, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি নষ্ট করে যে কি অভিশাপগ্রস্ত জীবন বহন করে, সেটা যদি তারা একবার বুঝতো, তা হলে হয় ত এ রকম পাগলামী কখন করতো না।"

অরুণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বলিল,—"হয় ত এটা এক রকম পাগলামী বা মানসিক ব্যাধিই হবে, লীলা! আমি কিছুতে এ সংশয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না। তুমি যখন আমার কাছে থাক, তখন এ-সব কিছু আমার মনে হয় না। কিন্তু তাঁর কাছে তোমায় দেখলেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়, আমার মনে তখন কোন সময় দুর্জ্জয় প্রতিহিংসার ভাব জেগে উঠে আমায় পাগল করে তোলে। আবার কখন-বা মন উদাস হয়ে গিয়ে আত্ম-হত্যা করে মরবার প্রবৃত্তি হয়। এ হয় ত আমারি মনের দোষ; কিন্তু এর মূলে কেবল তোমার

প্রতি আমার প্রবল আসক্তি ছাড়া আর কিছু নেই। আমার নিজের মনে হচ্ছে, আর কিছু দিন এ ভাবে থাক্‌লে হয় আমি পাগল হয়ে যাব, নয় ত আত্মহত্যা করে মর্‌বো।”

অরুণের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া ও ঈর্ষার এমন প্রচণ্ড পরিণাম ভাবিয়া লীলা মনে মনে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। অরুণের মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তার পক্ষে এরূপ কিছু করা অসম্ভব নয়।

তাহার করুণ স্নেহপ্রবণ হৃদয় অরুণের দুঃখে কাতর হইয়া উঠিল। তাহার উপর আর রাগ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। সে তখন আবার পূর্ব্বের মত আদরে ও যত্নে তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিন চারি দিন তাহার নিকটে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিয়া, বই পড়িয়া, অরুণের উপন্যাস সংশোধন করিয়া কাটাইল। অরুণ আবার সব ভুলিয়া গেল।

বড়দিনের ছুটিতে সকলে এক দিন শিকার করিতে যাইবে, কথা ছিল। লীলা এ দলের সহিত যোগ দিবে না, স্থির করিল। কিরণ এখানে যখন আছে, তখন সে নিশ্চয় ইহাদের সঙ্গে থাকিবে। তাহার সহিত কিরণের সাক্ষাৎ ঘটিলে অরুণ হয় ত আবার কি একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিবে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল।

কিন্তু বীণার কথা ভাবিয়া তাহার মন সুস্থ হইতেছিল না। কুমার সম্ভবতঃ এখানেই আছে। সে এ-দলে মিশিয়া শিকারে গেলে বীণার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে, তাহা সে জানে। সুতরাং মনে হয়, এ সুযোগ সে ছাড়িবে না। সম্পূর্ণ একটি দিন আবার তাহাদের নিভৃত আলাপের এমন অবসর দিতে লীলার মন চাহিতেছিল না।

অরুণ এই শিকারের আমোদে যাইবার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিল।

কিরণ তাহার আস্তাবল হইতে একটি ভাল ঘোড়া বাছিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়াছিল। সে জানিত, লীলাও তাহাদের সঙ্গে যাইবে।

কিন্তু যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে লীলা বলিল—"তুমি যাবার সময় বীণার কাছে কাছে থেকো—কুমার লোক ভাল নয়। তার সঙ্গে বীণা ঘনিষ্ঠতা করবে, সেটা আমি মোটে ভালবাসি না। আমি আজ বাড়ীতেই থাকবো, মনে করছি। শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।"

লীলা যাইবে না শুনিয়া অরুণের সব স্ফূর্ত্তি চলিয়া গেল। সে বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "তবে আমিও যাব না! তোমায় ছাড়া একলা কোথাও গিয়ে আমার কোন সুখ বা তৃপ্তি নেই।"

লীলা বলিল—"না! না। তুমি যাও! বেশ ত! একটু আমোদ পাবে! কত দিন এ-সব খেলা তোমার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল!"

অরুণ বলিল—"তুমি না গেলে আমি যাব না। তুমি এখন যদি না যাও, কিছু পরে গিয়েও তো আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পার। তাই যাবে?"

লীলা বলিল—"না—আমার শরীর ভাল নেই। আজ আর আমি কোথাও বেরোব না। তুমি কিন্তু যাও, সকলে যাচ্ছে, আর তুমি না গিয়ে বাড়ী বসে থেকে কি করবে? বীণার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আছ জানলে আমি বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবো।"

অরুণ বলিল—"বেশ! তুমি যা বোলছো তাই হবে। তবে আমি বলছিলুম কি—তোমার কি আমাকে একলা তার সঙ্গে ছেড়ে দিতে একটু ভয় করে না? সে যদি আমার উপর তার মোহিনী শক্তির প্রভাব বিস্তার করে?"

অরুণের ইচ্ছা হইত, বীণা ও তাহার পূর্ব্ব সম্বন্ধের কথায় লীলার মনে একটু সন্দেহের ছায়া আসে, কিন্তু লীলার মনে কোন দিন এ-সব কথা উঠিত না।

অরুণের পরিহাসে সে হাসিয়া উঠিয়া সকৌতুকে বলিল—"তা তুমি যদি তার বশে যেতে চাও, আমি তখনি তোমার উপর সব দাবী ছেড়ে দেব। ভাগাভাগিতে আমি নেই! তা ছাড়া, যে আমায় বিবাহ করবে, সে কোন দিন আমার ঈর্ষা উদ্রেক করতে পারে না, সে বিশ্বাস আমার যথেষ্ট আছে!"

"—তুমি বড় সাহসী! আর কেউ হলে এত সাহস করতো না!" বলিয়া অরুণ হাসিয়া বীণার সন্ধানে চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে লীলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। এই দিনটা চুকিয়া গেলে তাহার সহিত কিরণের সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পর হইতে সব উদ্বেগের অবসান! আর তাহাকে এমন ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া ফিরিতে হইবে না। এ জীবন যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

একলা ঘুরিতে ঘুরিতে লীলার জোছনার কথা মনে হইল। এই অবসরে তাহাকে একবার দেখিয়া আসিলে মন্দ হয় না। খুব জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া গেলে সে শিকারীদের অনেক আগেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবে।

লীলা তাহার ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল। বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কুমার আর তার দিকে মন দেয় না। লীলার পক্ষে তাহার দুঃখ ও নিরাশ্রয় অবস্থায় কথা শুনিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব।

লীলা একবার তাহার অসম সাহসের কথা ভাবিয়া দেখিল। তাহার মত কোন অবিবাহিতা মেয়ের একজন পুরুষের বাড়ীতে এরূপ ভাবে যাওয়া এবং সেই কুৎসিত ব্যাপার উপলক্ষ্যে সমাজে এ ব্যাপার সকলে কি চক্ষে দেখিবে? আর অরুণ? সেই-বা এ-কথা শুনিলে তাহাকে বলিবে কি?

কিন্তু এ-সব কথা লীলা এক পাশে সরাইয়া রাখিল। যখন তাহার উদ্দেশ্য ভাল, তখন জগৎ যাহা ইচ্ছা বলুক, সে সর্ব্ব বিষয়েই অগ্রসর হইবে!

লীলা ধানের ক্ষেত ও বাঁশবনের ভিতরের সরু পথ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল। মাঝে মাঝে বিস্তৃত আমবাগান। এই ছায়াশীতল পল্লীপথ তাহার অপরিচিত নয়। কতবার সে কিরণের সঙ্গে এ-পথে অশ্বারোহণে আসিয়াছে। কুমারের জমিদারীর ভিতর কতদিন তাহারা দুইজনে চড়ুইভাতি করিয়া গিয়াছে। তাহার প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কাজের মধ্যেই কেবল কিরণের কথাই বার বার মনে পড়িয়া যায়! উচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে কুমারের উন্নত গৃহচূড়া দেখা যাইতেছিল। লী... সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখিল—বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ী—যোড়া যোড়া থামের উপর প্রশস্ত বারাণ্ডা ও ছাত—কম্পাউণ্ডের এক ধারে চাকরদের থাকিবার ঘরের সারি ও আস্তাবল দেখা যাইতেছে।

ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া রাশ টানিতেই ভৃত্যেরা ছুটিয়া আসিল। লীলা তাহাদের বলিল,—এখানে যে একটি মেয়ে আছে, সে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া ভৃত্যের দল অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! সে ত এত দিন এই বাড়ীতে রহিয়াছে, কোন দিন ত কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে আসে না!

লীলা ব্যাপার দেখিয়া দমিল না, ঘোড়া হইতে নামিয়া একজনকে

ঘোড়াটা আস্তাবলে রাখিতে বলিয়া অপরকে বলিল—"সেই মেয়েটির কাছে আমাকে নিয়ে চল। তার সঙ্গে আমার দরকার আছে!"

বামা ঘর ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল; বিছানার উপর একটি সুন্দরী মেয়ে বসিয়াছিল। ক্ষান্তর বর্ণনামত তাহাকেই জোছনা বলিয়া চিনিয়া লইতে লীলার কষ্ট হইল না। তাহার গভীর কালো বড় বড় চোখ দুটি কোটরগত, কৃশ ও পাণ্ডুর মুখের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে! রুক্ষ কালো চুলের রাশি অযত্নবদ্ধ জটা-পাকান—ফুটন্ত গোলাপের মত সরস ও সুন্দর মুখ শুকাইয়া মলিন ও বিবর্ণ! এই বয়সেই সে যেন জীবনের সমস্ত আনন্দ, আশা, সুখ—সব হারাইয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে!

লীলা সোজা গিয়া তাহার পাশে বসিল। বলিল—"তোমার নাম জোছনা—নয়?"

জোছনা তাহাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। সে বলিল—"আমিই জোছনা—কিন্তু আপনাকে ত আমি চিনতে পারছি না!"

লীলা বলিল—"তুমি ছেলেমানুষ, কাকেই বা চেন? আমি এই কাছেই থাকি, শুনলুম—তুমি বড় কষ্টে আছ, তাই আমি এসেছি, যদি তোমার ভাল কিছু করতে পারি।"

"—আমার ভাল? আর কি আমার ভাল হবার কিছু আছে দিদি?" বলিয়া জোছনা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দাসী বলিল—"এই আবার আরম্ভ হল! খাওয়া দাওয়া বন্ধ—ঘুম নেই—কেবল চব্বিশ ঘণ্টা কান্না—আর কান্না? এমন করলে মানুষের প্রাণ বাঁচে কখনো?"

লীলা বলিল—"কেন এমন করছো জোছনা?"

জোছনার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথা ফুটিল না।

বামা নিজের কপালে দুটি আঙুল ঠেকাইয়া বলিল—"ললাটের লেকা ছিল— তাই—তা ছাড়া আর কি বোলবো গো মা? বাড়ীতে কি আদরে ছিল ও—শুধু খেয়ে আর খেলা করে হেসে হেসে বেড়িয়েছে! আর আজ ওর এই দশা? এই যে ওর সোয়ামি বিলেত থেকে এক মেম নিয়ে ফিরেছে—তাকে কি আর কেউ বলবে কিছু? আর এই একটা ছেলেমানুষ মেয়ে—জোর করে ঘর থেকে টেনে এক মুখপোড়া পথে বসাল—যত দোষ তারই! আত্মীয়-স্বজন সব হারিয়ে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে! কত বড় ঘরের মেয়ে—কত বড় ঘরের বৌ—আজ ওর এমন হাল, যে দাঁড়াবার জায়গা নেই! আর আমায় খালি সে হতভাগা বলে—ওকে নিয়ে যা! তুই যেখানে হোক ওকে নিয়ে যা! আমি ওকে কোথায় নিয়ে যাব—বল ত মা? নেহাত হাতে করে মানুষ করেছিলুম, ফেলতে পারি নি—তাই পড়ে আছি। তা বলে ওকে নিয়ে যাবার মত জায়গা কি আমার আছে?

লীলা বলিল—"জোছনা! যদি আমি তোমায় নিতে লোক পাঠাই, যাবে ত তা হলে?"

জোছনা বলিল—"কোথায় যাব?"

লীলা বলিল—"ভাল জায়গায়। সেখানে সকলেই তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।"

জোছনা বলিল—"আমার আত্মীয়-স্বজনরা আর আমাকে তাদের কাছে যেতে দেবে না। কিন্তু আমার শুধু নিজের বাড়ীতেই যেতে ইচ্ছে করে। আর কোথাও আমার সুখ নেই। দিদি! তুমি কি তাদের একবার আমার কথা বলে দেখবে? আমি ত ইচ্ছে করে এখানে আসি নি, আমায় কেন তারা দোষ দেয়? এ-বাড়ী, এ-সঙ্গ যেন বিষ বলে মনে হচ্ছে আমার। হয় আমায় মরবার ওষুধ দাও,

আর না হয় ত আমার আবার বাড়ী ফিরে যাবার উপায় করে দাও দিদি! আমি আর এমন করে থাকতে পাচ্ছি না।"

জোছনা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বলিল—"আমার একটা পাখী ছিল, সে আমায় কত চিনতো! উড়ে এসে আমার হাত থেকে খাবার খেত। আমার ছোট ভাইটি এখন অনেক বড় হয়েছে বোধ হয়—সে হয় ত এখন চলতে পারে। কথা বলতেও শিখেছে হয় ত। তাদের কথা মনে হলে আমি আর এক্ দণ্ড এখানে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—তুমি আবার আমার বাড়ী ফিরে যাবার উপায় করে দাও।"

তাহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে লীলা নিজেও কাঁদিয়া আকুল হইল। দাসী বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"মিছেই কেঁদে মরছো বাছা! যদি তুমি সত্যিই মাথা কুটে হত্যে হয়ে মরে যাও, তবু আর সেখানে ফিরে যেতে পারছো না! যতই কাঁদ! সবই মিথ্যে—"

লীলা চোখ মুছিয়া বলিল—"জোছনা! শোন। তোমার বাপের বাড়ী আর তুমি যেতে পার না। আমি বল্লেও তাঁরা সে-কথা শুনবেন না। তবে অন্য বাড়ীতে আমি তোমায় রাখতে পারি। সেখানে তুমি ভাল থাকবে, তোমার মত অনেক মেয়ের সঙ্গ পাবে, কোন কষ্ট হবে না তোমার।"

দাসী বলিল—"তাই কর বাছা! আমি ত বাঁচি তা হলে। ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে।"

লীলা বলিল—"কাল দুপুরে আমি পাল্কী পাঠাব। তুমি একে নিয়ে চলে যেও। যেখানে থাকতে হবে, যা করতে হবে, সে সব আমি ঠিক করে রাখবো। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। জোছনা, আজ তবে আমি আসি! তুমি কেঁদো না! মন স্থির করে

থাক! আর তোমায় এখানে থাকতে হবে না। যেখানে তোমা রাখবো—খুব ভাল থাকবে সেখানে! আমি মাঝে মাঝে গি তোমায় দেখে আসবো! কেমন?"

কথায় কথায় অনেক দেরি হইয়া গিয়াছিল, লীলা তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে বারাণ্ডায় আসিবমাত্র কুমার গুণেন্দ্রভূষণের সঙ্গে তাহার দেখা; সেই মাত্র কুমার বাড়ী ফিরিয়াছে!

লীলাকে দেখিয়া প্রথমে সে ঘোর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। পর মুহূর্ত্তেই সে ভাব সামলাইয়া লইয়া সে আগাইয়া আসিয়া অতি বিনীত ভাবে লীলাকে নমস্কার করিল। বলিল—"এ অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের গৌরবে আমি ধন্য। কিন্তু কেন এ সম্মান পেলুম, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

তাহার কালো চোখে ও ঠোঁটে বিদ্রূপের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল! লীলার মনে হইল—সে যেন কোন সুন্দর—নৃশংস জন্তু!

কুমার লীলার মুখের উপর তাহার উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল! বীণা যে দৃষ্টির সম্মুখে মোহাবিষ্ট হইয়া অভিভূত হইয়া পড়িত, লীলা সতেজে তাহার সেই মোহপূর্ণ চক্ষুর দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, কোন উত্তর দিল না।

তাহাদের চারিদিকে বাড়ীর লোকজনেরা জড় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া ছিল। এখনই যেন একটা কিছু প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে—এইরূপ সন্ত্রস্ত ভাব!

লীলা পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কুমার আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল! লীলার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত নির্ল্লজ্জভাবে হাসিয়া বলিল—"আমায় আজ্ঞা করুণ, মিস্ রায়! এখানে আপনার কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগ করে যাবার জন্য আয়োজন

করি! বহুদিন আমার বাড়ীতে এমন সম্মানিত অতিথির আগমন হয় নি। আজকার এই সাক্ষাতের ফলে হয় ত আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে যেতেও পারে!"

লীলা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলিল—"আপনি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান্! আমি এখনি যেতে চাই!"

—"ক্ষেপেছেন আপনি! জজ-সাহেবের মেয়ের উপযুক্ত ভাবে আদর অভ্যর্থনা না করে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে তিনিই বা কি মনে করবেন?"

লীলা বলিল—"আমি অভ্যর্থনা চাই না! আমায় পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ান আপনি!"

"—অসম্ভব, মিস্ রায়! সে হতেই পারে না! সেই সাত আট মাইল দূর—কোথা থেকে আসছেন—একটু জল না খাইয়ে কখনো ছেড়ে দিতে পারি? প্রাণটা ত আমার লোহা দিয়ে গড়া নয়? তার উপর আবার যে-সে অতিথি নয়—জজ-সাহেবের মেয়ে!"

লীলার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল! সে বলিল—"আমার ঘোড়াটা কারুকে আনতে বলবেন? না—আমি অমনি চলে যাব? আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে দাঁড়াব না।"

তাহার উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কুমার বলিল—"বাঃ! কি সুন্দর! রাগ হলে আপনাকে কি চমৎকার মানায়! আপনি আমায় বুঝলেন না, মিস্ রায়! এই বড় দুঃখ থেকে গেল!"

লীলা আর কিছু না বলিয়া অন্য দিক দিয়া বারাণ্ডা হইতে নীচে নামিয়া পড়িল। চকিতের মত কুমারও নামিয়া আসিয়া আবার তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল!

কুমার বলিল—"বৃথা চেষ্টা, মিস্ রায়! যতক্ষণ আপনি এখানে

আসবার কারণ না বলবেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে কিছুতে ছাড়বো না! আর এত তাড়াই বা কিসের? এখানে আসার গল্প এতক্ষণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! এখনই যান্ আর দুঘন্টা পরেই যান্—ফল সমানই। বলুন—কেন এখানে এসেছিলেন?"

লীলা তাহার ঘোড়ার চাবুক মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সজোরে ধরিল। বলিল—"তোমার সঙ্গে সে আলোচনা আমি করতে চাই না! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে আট্‌কে রাখবার সাহস কর?" রাগে তাহার কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল!

"—আমি অনেক দুঃসাহসিক বিষয়েও সাহস করি! যখনি আপনি এখানে পা দিয়েছেন, তখনই এর গুরুত্বের কথা আপনার ভাবা উচিত ছিল। বলুন—কি ভেবে এখানে এসেছেন?"

লীলা অগ্নিময় চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"কখনো বলবো না। কি করতে পারেন আপনি—দেখা যাক্!"

কুমার ধূর্ত্তামির হাসি হাসিয়া বলিল—"আহা! বলবেন বৈ কি! অত চটে যান কেন বলুন দেখি? আপনি না বলেন—আমি বলছি, আমার বাড়ীতে একটা গোয়েন্দাগিরি করবার উদ্দেশ্যই ছিল বোধ হয়? না হলে আমি এ ত আশা করতে পারি না যে, আপনি আমায় দেখবার জন্যই এখানে এসেছিলেন?"

লীলা কোন উত্তর না দেওয়ায় কুমার আবার বলিল—"আর একান্তই না বলেন যদি, তা হলেও কিছুক্ষণ থাকবেন বৈ কি! আমি ত আপনার পূর্ব্বের ব্যবহার ভুলেই গেছি—আসুন—সে সব ভুলে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাক্। তার পরেও যদি লেফটেনেণ্ট সাহেব রাজি হন, তখন না হয় আপনাকে তাঁর হাতে দিয়ে আসা যাবে!"

"—তাই না কি? তবে তার পুরস্কার কিছু আগে নাও!" বলিয়াই লীলা বিদ্যুৎবেগে তাহার ঘোড়ায় চাবুক কুমারের মুখের উপর সজোরে বসাইয়া দিল!"

চোখের উপর হইতে গাল পর্য্যন্ত চামড়া ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত ছুটিল!

যাতনায় অধীর হইয়া কুমার দুই হাত চোখে ঢাকা দিতেই লীলা এক ধাক্কায় তাহাকে সরাইয়া তাহার ঘোড়া খুলিয়া লইল ও এক লাফে তাহার পিঠে উঠিয়া কয়েক ঘা চাবুক বসাইয়া দিতেই সুশিক্ষিত অশ্ব বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতিতে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

কুমারের হাত বহিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। সে চোখে হাত দিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল—"ধর্! ধর শয়তানীকে! ব্যাটারা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? ছুটে যা! ধর্!"

ভৃত্যের দল কিন্তু এক চুল সরিল না! লীলাকে সবাই চিনিত। তাহাকে ধরিতে গিয়া কে জজ-সাহেবের বিষ-নেত্রে পড়িতে যাইবে?

৪০

মানুষ যেখানে অত্যন্ত বেশি আশা করে, সেখানে প্রায়ই তাহাকে নিরাশ হইতে হয়। লীলার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল! এ সপ্তাহের প্রতি দিনটি সে একান্ত আশা করিতেছিল যে, কিরণের উৎসবের দিনটা সে সমস্ত দিনটি সম্পূর্ণ উপভোগ করিবে। সেদিন সে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ কিরণের কাছে কাছে থাকিয়া তাহার সব কাজে সাহায্য করিবে,—সেই বহুদিন পূর্ব্বের অতীত কালের মত। যাহার সঙ্গে সে অল্প দিনের মধ্যেই চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইবে, বিদায়ের আগে একটি দিন ঠিক আগের মত তাহার

সঙ্গে বন্ধুভাবে কাটাইবার আশা ও আনন্দ তাহাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। অরুণও সেখানে উপস্থিত থাকিতে রাজি আছে। সকলে মিলিয়া রান্না খাওয়া, ক্লাবঘর সাজান ইত্যাদি আমোদে তাহাদের সে দিনটি অতি আনন্দে কাটিবে!

কিন্তু সেই বিশেষ দিনেই অরুণের ঠাণ্ডা লাগিয়া জর হইল— মাথায় প্রবল বেদনা। তবু সে লীলাকে যাইতে অনুরোধ করিল; তাহার আমোদ ও আনন্দ নষ্ট করিতে অরুণের ইচ্ছা হইল না। চাকররা তাহার আবশ্যক কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবে, আর মিসেস্ রায় একটু দেখিলেই চলিবে।

কিন্তু লীলা এ-সব কথায় কাণ দিল না। অরুণ তাহার একান্ত আপনার জন—সে অসুখের জন্য বিছানায় পড়িয়া থাকিবে, আর লীলা নিশ্চিন্ত মনে তাহাকে ফেলিয়া আমোদ করিতে যাইবে, সে কখনো হইতে পারে না। কাজেই, বীণা একলা গেল,—লীলা তাহার অনুপস্থিতির কারণ ভাল করিয়া কিরণকে বুঝাইয়া বলিতে বীণাকে অনুরোধ করিল।

অরুণ বলিল—"আমার জন্য তোমার আজকার আনন্দটা মাটি হয়ে গেল—আমার এমন দুঃখ হচ্ছে।"

"—আমোদটাই কি এত বড় জিনিষ অরুণ? তুমি রোগের যাতনায় বিছানায় পড়ে ছটফট করছো, তা জেনেও আমি সেখানে গিয়ে স্বস্থচিত্তে আমোদ করতে পারি?"

অরুণ বলিল—"সে কথা সত্য! তুমি চলে গেলে আমার অসুখ আরো দ্বিগুণ বলে মনে হত। তুমি যদি কাছে থাক, তাহলে বহুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হলেও আমি কাতর হই না।"

সেদিন সমস্ত দিন লীলা অরুণের ঘরেই কাটাইল। তাহার শীতল কোমল হস্তে অরুণের মাথা টিপিয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া, গল্প করিয়া বই পড়িয়া শুনাইয়া সমস্ত দিন কাটিয়া গেল।

বৈকালে অরুণের জ্বর ছাড়িয়া গেল ও সে একটু সুস্থ হইল। তখন সে আবার লীলাকে উৎসবে যাইতে অনুরোধ করিল। লীলা এবার আর কোন আপত্তি না করিয়া তাহার পিতামাতার সঙ্গে ক্লাবে গেল। বহুদিন পরে আবার এই উৎসব-গৃহের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আসিয়া লীলার এতদিনের জমানো বিষাদের ভার যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

ছোট ছোট শিশুগণে পূর্ণ একটি হলের মধ্যে দাঁড়াইয়া লীলা আবার নিজেকে তাহাদেরই মত একটি শিশু বলিয়া মনে করিল। তাহাদের আনন্দ-উৎসবে লীলা ঠিক তাহাদেরই মত লঘু প্রফুল্ল চিত্তে যোগ দিল।

হলের ভিতর দাঁড়াইতেই কিরণের সঙ্গে একবার তাহার দেখা হইল। তখন কিরণ বড় ব্যস্ত,—লীলার কাছে দাঁড়াইবার বা তাহার সঙ্গে কথা বলিবার তাহার সময় ছিল না। সে একবার সেই উচ্চ কোলাহল-মুখরিত গৃহে লীলার উৎফুল্ল মুখ ও হাসিভরা স্নিগ্ধ চোখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া তৃপ্ত ও প্রসন্ন চিত্তে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

উজ্জ্বল আলোকমালায় ভূষিত গৃহে গৃহে নানাবিধ শিশু-মনোমোহন খেলা ও আমোদের আয়োজন ছিল। ম্যাজিক, বায়োস্কোপ, ব্যাণ্ড, খেলা ইত্যাদি সব শেষ হইলে ভোজ আরম্ভ হইল।

সমস্ত শেষ হইলে বীণা, চৌধুরী ও তাহার অন্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল,—কুমার গুণেন্দ্রভূষণ সেই অবসরে গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে বীণার দিকে অগ্রসর হইল।

লীলা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল! তাহার নিজের হস্তের আঘাত কুমারের সুগৌর মুখের উপর চামড়া কাটিয়া একটি লম্বালম্বি গভীর কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে!

কুমার বীণার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কহিতেছিল, যেন তাহারা সবে মাত্র কিছুক্ষণ আগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। চৌধুরী তাহাদের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মুখ অন্ধকার ও গম্ভীর করিয়া দূরে সরিয়া গেল। বীণার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরাও একে একে অন্যদিকে চলিয়া যাইতে কুমার ও বীণা সেখানে একলা বসিয়া রহিল।

লীলার মনে হইল, কুমার কোন বিষয় বীণাকে দৃঢ় ভাবে বলিতেছে ও বীণা তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

লীলা তখনি উঠিয়া বীণাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় কিরণ একটু অবসর পাইয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল। বলিল—"একটু দাঁড়াও লীলা! সন্ধ্যা থেকে একবারও তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে সময় পাই নি! বোস এইখানে! দুটো কথা বলা যাক্! কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? দরকার আছে কিছু?"

লীলা বলিল—"কিরণ! বীণার সঙ্গে কুমারের এত মেশামেশি আমি মোটে সহ্য করতে পারি না। তুমি বোসো একটু। আমি বীণাকে ওর কাছ থেকে ডেকে আনি।"

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইল। বলিল—"থাকতে দাও না। এখানে ও বীণার কোন ক্ষতি করতে পারবে না! তুমি আবার অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে উঠেছ!"

লীলা তবুও বলিল—"আমি ও লোকটাকে একটুও বিশ্বাস করি না। যেমন ইতর তেমনি জঘন্য কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার!" কিরণের

এ-সম্বন্ধে কোন আগ্রহ ছিল না। বীণাকে সে মনে মনে ঘৃণা করে, আর কুমার ত কথা বলিবারও উপযুক্ত নয়! সে শুধু লীলাকে চায়, লীলার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই সে উৎসুক! এখন সকলেই নিজের কথায় ব্যস্ত…নিভৃতে কথা বলিবার সুযোগ এখনকার মত আর পাওয়া যাইবে না।

তাই কিরণ লীলাকে যাইতে না দিয়া বলিল—"এখান থেকে ওদের উপর নজর রাখ! তুমি আজ দিনভোর এলে না…সব আমোদটাই মাটী হয়ে গেল!"

"—কি করে আসি বল? অরুণের অত জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা,—তাকে একলা ফেলা কি আসা যায়? কিন্তু বীণা ত বলছিল আজকার দিনটা খুব আনন্দে কেটেছে। আমোদ মাটি হল, তবে কি করে?"

"—বীণার কথা ছেড়ে দাও! তাকে…কিম্বা তার কোন কথা আমি গ্রাহ্য করি না। আমার আমোদ কেন নষ্ট হল…তাও কি তোমায় বলে দিতে হবে?" কিরণ গভীর দৃষ্টিতে লীলার মুখের দিকে চাহিল।

তাহার সেই দৃষ্টিতে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া লীলা মুখ নীচু করিয়া বলিল…আজ "আজ দিনভোর তোমাকে একলা অনেক খাটতে হয়েছে…নয়? মেয়েরা এসে কি তোমায় কোন সাহায্য করে নি?"

কিরণ বলিল—"লীলা! বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কর না! আমার তোমাকে বলবার অনেক কথা আছে! আজ কয়েকদিন থেকে আমার মনে নূতন একটা কথা উঠেছে! তোমায় বলতে আমি সময় পাচ্ছি না। তুমি বড় অন্যায় পথে যাচ্ছ…লীলা!"

লীলা এবার বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল।

কিরণ বলিল—"আমি বুঝতে পারছি না লীলা! কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো! তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো না? আমি আবার বলছি···তুমি জীবনের পথে মস্ত বড় ভুল করছো···"

লীলা মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—"আমাদের এ-সব কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল, কিরণ!"

"—না তা নয়! এ বিষয় বেশ ভাল করে ভেবে ও বুঝে দেখে আলোচনা করা উচিত! এটা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয় লীলা!"

কিরণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল··তোমার খুব পরিষ্কার করে বোঝা উচিত···যে তুমি কি করতে যাচ্ছ! অন্য দিক দিয়ে এ ব্যাপারটা দেখ দেখি···তুমি অরুণকে এখনো ঠকিয়ে যাচ্ছ কি না?"

লীলা এবার অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহার দিকে চাহিল—"কিরণ!"

কিরণ বলিল—"তুমি না বল যে সর্ব্বদা ন্যায় ও সত্যের পথে চলো? আর এটা কি হচ্ছে? তুমি অরুণকে বলছো যে, তুমি তাকেই ভালবাস, সে তাই বিশ্বাস করে আনন্দে আছে! আর তোমার মনের সত্য কথাটা কি? যাকে তুমি ভালবাস··সে অরুণ নয়···সে···"

লীলার মাথা তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল! সে দুই হাতে কাণ ঢাকিয়া মৃতবৎ নিঃস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল! কিরণের মুখে সে অবশিষ্ট কথাটি শুনিবার মত তাহার সাহস বা ধৈর্য্য ছিল না। এ-কথা যে সবই সত্য—মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় তো তাহার নাই! কিন্তু সে কিই-বা করিতে পারে?

কিরণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, "কেন তুমি এমন করছো লীলা? কেন ভেবে দেখছো না? একজনের জন্য দু-দুটো জীবন নষ্ট করা কোন সৎগুণের পরিচায়ক নয়। অরুণ মানুষের মতই তার এ নিরাশা সহ্য করবে। সে তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। যখন সে অন্ধ ছিল, তখন তার যাতনা ও অভাব আমি ভাল করেই বুঝেছিলুম। তার যে তখন তোমাকে কত দরকার, সে-কথা ত আমি তোমার মতই বুঝেছিলুম…লীলা? সেদিন তাকে হিংসা করবার আগে আমি নিজেকে গুলি করতেও দ্বিধা করতুম না। কিন্তু আজ আর ত সে-দিন নেই? এখন কেন আমরা দুজনে তার জন্যে এত সহ্য করবো…বল?"

প্রবল ও দ্রুত হৃৎস্পন্দন যেন লীলার কণ্ঠরোধ করিতেছিল। সে যে এই সব অনুচিত কথা বন্ধ করিয়া দিবে, সে শক্তিও তাহার ছিল না। কিরণের প্রস্তাব ও সে নিরাশা যে অরুণ সহ্য করিতে পারিবে না, তাহা লীলা খুব জানে। সে সৈনিক, সে বীর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নারী অপেক্ষাও কোমল। এ আঘাত সহ্য করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বহুক্ষণ পরে সে একটু সংযত হইয়া মাথা তুলিল। বলিল, "কিরণ! তুমি কি চাও যে আমি আমার সম্মান নষ্ট করি?"

কিরণ বলিল, "না লীলা! আমি চাই—তুমি তোমার নারীত্বের সম্মান বজায় রেখে চলো! আমার কথাটা তুমি ঠিক বুঝছো না!"

লীলা দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি বুঝেছি! তুমিও আমার কথা বোঝ—কিরণ! আমি বিশ্বাস করি, মানুষ যখন একবার তার কথা দেয়—তখন সে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয়। সে তখন—ঘটনাচক্র যাই হোক—সেই কথা মত চলতে বাধ্য। আমি আমার কথা দিয়েছি—

যখন সে অন্ধ ছিল, তখন আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় অযাচিত ভাবে তাকে সুখী করতে গিয়েছিলুম। আমার সে কাজ সার্থক হচ্ছে—আমি যা আশা করেছিলুম, তার চেয়ে সে ঢের বেশী সুখী হয়েছে। তার দৃষ্টি সে যে আবার ফিরে পেয়েছে— সেও শুধু তার মন সুস্থ হয়েছে বলে। তা ছাড়া, আমি জানি, সে চোখে দেখতে পেলেও, আমায় কি রকম ভালবাসে—তার যে এ আঘাত কত লাগবে, ও তার কত ক্ষতি আবার হওয়া সম্ভব—এ জেনেও কি আমি তাকে ছেড়ে অন্য কোনও অবস্থায় কখনো সুখী হতে পারবো ? তুমিই বলো ?"

কিরণ বলিল, "লীলা ! আমি আবার বলি—আমার কথাটা তুমি ভাল করে বোঝ। তোমার উচিত—যাকে তুমি বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছ, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকেই ভালবেসে তাকে বিবাহ করা ;—তাকে বঞ্চনা করা তোমার উচিত নয়। আমি চাই, এ ক্ষেত্রে তুমি নিজের মনের বলের উপর নির্ভর করে চলো। তাকে সব কথা খুলে বলো ! সব কথা তার জানা উচিত নয় কি ? এমন লোক সংসারে কে আছে, যে,—যে মেয়ে অন্য লোককে ভালবাসে বলে নিজে স্বীকার করছে—যতই তাকে ভালবাসুক—তাকে বিবাহ করতে চায় ?"

লীলা আবার উভয় হস্তে মুখ ঢাকিল। তাহার মনের বল ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। কিরণের কাছে থাকিলে ও তাহার এই সব একান্ত অনুরাগের কথা শুনিলে লীলার পক্ষে মনের ধৈর্য্য রাখা দায় হইয়া ওঠে।

তাহাকে নীরব দেখিয়া কিরণ নিরাশার স্বরে বলিল,—"আমি দেখছি, তুমি ইচ্ছা করে দিন দিন আমায় ভুলে যাচ্ছ ! তোমার উপর অরুণের কোন অধিকার নাই—তোমার উপর সম্পূর্ণ অধিকার আমার !

ভালবাসাই কেবলমাত্র এ অধিকার দিতে পারে! লীলা! শুনছো কি? আমি তোমায় কিছুতেই তার হাতে ছেড়ে দিতে পারবো না! আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মন আমার নিয়ত এই সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে! আর আমি পারি না! কিন্তু তুমি কেন সর্বক্ষণ কেবল তার কথাটাই ভাবছো? আমার কথা—যাকে তুমি ভালবাস,—তার দিক একবারও দেখছো না কেন? এ-কথা কি তুমি অস্বীকার করতে পার? লীলা! মুখ তোল! আমার দিকে ফিরে চাও!"

লীলা মুখ তুলিতে সাহস করিল না! তেমনি হাতে মুখ ঢাকিয়া নিঃস্পন্দের মত পড়িয়া রহিল! পিছনের জানালা হইতে মৃদু বাতাস তাহার কুন্তলজাল উড়াইয়া বহিতেছিল। সে-মুহূর্তে তাহার দৃষ্টির উপর হইতে বীণা, কুমার, জনতা ও উৎসবের সমস্ত চিত্র মুছিয়া গেল! আর সমস্ত শব্দ ডুবাইয়া দিয়া কেবল কিরণের প্রেমপূর্ণ কণ্ঠস্বর তাহার কানে মধুর—মধুরতর স্বরে বাজিতে লাগিল! অরুণের তাহার প্রতি অন্ধ অনুরাগ, তাহার কোমল হৃদয়, তাহার আবার অন্ধত্ব পাইবার সম্ভাবনা —সবই ভুলিবার উপক্রম হইল। এই দুস্তর বিপদের মুখে পড়িয়া লীলা অত্যন্ত দীনভাবে তাহার সাহস ও শক্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। সে মুখ তুলিল না। কিরণের কথার কোন উত্তর দিল না।

কিরণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, "লীলা! মুখ তোল! আমার কথা শোন! যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, তার পর থেকে এক একটি দিনের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকটি কথা আমার মনের ভিতর দাগ দেওয়া রয়েছে! কোন দিন সে-সব কথা ভুলতে পারবো না! যেদিন তুমি রাজবাড়ীতে জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে, সে কথা? সেদিন আমি তোমাকে একান্তভাবে আমারই

বলে জেনেছিলুম,—আমি কখনো ভাবিনি, আর কেউ এসে সহসা তোমাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে! লীলা! সত্য করে বল, কেন তুমি আমি দুজনেই তার জন্য এত বড় জীবনব্যাপী ত্যাগ করতে যাব? আমি তোমায় ভালবাসি! সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে! বোঝ, ভুল করো না! চাও আমার দিকে!"

কিরণ লীলার চোখে তাহার মনের কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিছুক্ষণ জোর করিবার পর কিরণের প্রবল আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে লীলা অবশেষে মুখ তুলিতে বাধ্য হইল ও একান্ত অনুনয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতেছিল,—দিকে দিকে তাহাদের আনন্দপূর্ণ উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। হলের মধ্যে কে পিয়ানোর সহিত উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়াছে!

লীলা কথা বলিতে যাইবে, এমন সময়ে সঙ্গীত ও চীৎকার ছাপাইয়া সহসা রমণীকণ্ঠনিঃসৃত উচ্চ আর্ত্তনাদের শব্দ চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল।

লীলা ও কিরণ সেই মুহূর্ত্তে নিজেদের কথা ভুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল! আর সকলেও যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটিয়া আসিল! তাহারা সভয়ে দেখিল, চারিদিকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা তীব্র দীপ্তি বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার মধ্যে এক নারী উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিতেছিল! তাহার দেহের পরিচ্ছদের সর্ব্বত্র আগুন জ্বলিতেছে!

চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল! লোকেরা ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল! ছেলেদের টানিয়া আনিয়া নিরাপদ স্থানে ফেলা হইতেছিল, কারণ আগুন ক্রমশঃ দরজার দিকে পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিতেছিল!

অগ্নিদগ্ধা নারী আতঙ্কে বিমূঢ়া হইয়া পাগলের মত যত চারিদিকে ছুটিতেছিল, বাতাসে তাহার বস্ত্রের আগুন ততই প্রদীপ্ত হইয়া দ্বিগুণবেগে জলিয়া জলিয়া উঠিতেছিল! বাতির উজ্জ্বল আলো তাহার মুখে পড়িতে লীলা সভয়ে দেখিল—সে বীণা!

কিরণ দেখিয়াই তখনি সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল! দরজার পর্দ্দা ছিঁড়িয়া লইয়া সে বীণাকে চাপিয়া ধরিতেই অনেকে নিজের কোট ও জামা খুলিয়া ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল। কিরণ তাহাকে সেই সব কাপড় দিয়া ঢাকিয়া সজোরে মেঝের উপর শোয়াইয়া রাখিল। তাহার নিজের হাত আগুনের তাপে পুড়িয়া ঝলসাইয়া যাইতেছিল। বীণা কিন্তু তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য বিষম ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছিল। কিছুক্ষণ হুড়াহুড়ির পর সে হীনবল ও অচৈতন্য হইয়া মৃতবৎ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

তাহার পোষাক দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, মুখ এমন ভীষণভাবে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, চিনিবার কোন উপায় ছিল না। সে বীভৎস দৃশ্যের দিকে চাহিবার কাহারও শক্তি ছিল না।

লীলা উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে অন্ধপ্রায় হইয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল ও বার বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল।

মিসেস্ রায় গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার এই দশা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মিঃ রায় অন্য ঘরে ব্রীজ খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাপার শুনিয়া তিনি সদলে ছুটিয়া আসিলেন ও তাঁহার খেলার সঙ্গী জেলার সিভিল সার্জ্জন তখনি বীণার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। কিরণ লীলাকে টানিয়া বারাণ্ডায় লইয়া আসিতেছিল। লীলা অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতেছিল।

বীণার সমস্ত চাঞ্চল্য, সব দোষ সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল সে যে তাহাকে চিরদিন কত কঠোর কথা বলিয়াছে, কত অপ্রিয় ব্যবহার করিয়াছে, তাহাই তাহার মনে পড়িতেছিল। সে যে বীণার নির্ব্বুদ্ধিতা ও শত দোষ সত্ত্বেও তাহাকে বড় ভালবাসিত!

"—বীণা কি বাঁচবে না, কিরণ?" অশ্রুসজল নয়ন তুলিয়া লীলা বলিল—"এ রকম করে পুড়ে গেলে মানুষ কি বাঁচে?"

কিরণ গম্ভীরমুখে বলিল—"মন্দ কথাটাই আগে ভাবছো কেন লিলি? যতক্ষণ জীবনের কণামাত্র থাকে ততক্ষণ আশাও করা যায়।"

"—আমি কি রাগী ও অসহিষ্ণুস্বভাব কিরণ? কত যে তাকে বকেছি, কত অন্যায় করেছি, সে আর কি বল্‌বো? সে যদি না বাঁচে, আমি কোন দিন নিজেকে মাপ করতে পারবো না।"—তাহার চোখের জল আবার দ্বিগুণ বেগে বহিল।

"—কেন কাঁদছো লিলি? এতে ত তোমার দোষ কিছুই নেই। দোষ দেখলে সব আত্মীয়-স্বজনই বকে থাকে।" কিরণ শান্তভাবে কথাটা বলিল। তাহার পূর্ব্বের সে প্রেমিকের আচরণ ও কথাবার্ত্তা সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। বিপদের দিনে সে এই পরিবারের চিরদিনের বন্ধুভাবেই লীলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ডাক্তার বীণার পিতামাতা ছাড়া আর সকলকে সে গৃহ হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। আশে পাশে দাঁড়াইয়া সকলে চুপি চুপি কথা বলিতেছিল। মুখে মুখে গল্প বাড়িয়া চলিল—"কুমারের সঙ্গে একটা আলোর নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। হঠাৎ একটা জলন্ত মোমবাতি খসে তার কাপড়ে পড়ায় এই কাণ্ড ঘটলো।"

"না! না! তা নয়! সে অন্যমনে কথা বলতে বলতে একটা

জ্বলন্ত বাতির উপর এসে পড়েছিলো। কাপড় ধরে গেছে, তবু অন্য লোক না দেখা পর্য্যন্ত সে জানতেই পারে নি।"

"কাপড়ের কোণটা একটু ধরেছিল। প্রথমে কুমার স্বচ্ছন্দে সেটুকু নিবিয়ে দিতে পারতো। কেবল বীণা ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করতে গিয়েই বাতাসে বাতাসে আগুন জোরে ধরে উঠলো।"

"আরে রাখ তোমার কুমারের কথা! সে কি একটা কম কাপুরুষ! এমন একটা কাণ্ড ঘটলো,—তুই পুরুষ মানুষ সঙ্গে রইছিস্—কোথায় তৎপর হয়ে আগুনটা নিভানোর চেষ্টা করবি—না, ব্যাপার দেখে ভয়ে অস্থির! আমি আমার স্বামীর জন্য বিলিয়ার্ড রুমের দরজায় অপেক্ষা করছিলুম—সে দেখি তখন হল্ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে! কিরণ না এসে পড়লে আরো যে কি কাণ্ড হতো, তার ঠিক নেই!"

বীণার তৎকালীন চিকিৎসা ও ব্যাণ্ডেজ শেষ হইলে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ গাড়িতে তুলিয়া ধীর মৃদুগতিতে বাড়ীর দিকে লইয়া যাওয়া হইল। মিঃ রায়ের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

কুমার যে এই গোলমালে কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

৪১

ভোরের আলো জানালা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িতেই, মিঃ ঘোষ শ্রান্ত চক্ষু দু'টি খুলিয়া চাহিলেন। একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন—"নির্ম্মল!"

নির্ম্মলা কিছুদূরে টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া বেদানার রস তৈয়ার করিতেছিল,—ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিল,—"কেন বাবা? শরীরটা একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি? কেমন আছ এখন?"

মিঃ ঘোষ একটু বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "আমার কি হয়েছে, বল্ তো মা? আমার ত কিছু মনে পড়ছে না? কিছু অসুখ করেছে কি?"

নির্ম্মলা বিছানায় বসিয়া তাঁহার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইল। ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"তোমার যে আজ চার দিন ধরে বড্ড জ্বর হয়েছে বাবা! এক দিন একবারও তো তুমি চেয়ে দেখ নি,—একটি বারও তো আমায় ডাক নি বাবা! আজ এখন জ্বর কমে আসছে দেখছি; একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?"

মিঃ ঘোষ আবার চোখ বুজিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি জানি—কিছু বুঝতে পারছি না! জ্বর হয়েছে বুঝি? ও, তাই শরীরটা এত দুর্ব্বল মনে হচ্ছে! চোখ চাইতে পারছি না!"

নির্ম্মল আকুল হইয়া বলিল,—"তোমার যে অনেকক্ষণ কিছু খাওয়া হয় নি, বাবা! তুমি একটা কুলকুচো করে এই বেদানার রসটুকু খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়। বেলা ত এখনও বেশি হয় নি। এর পরে বেলায় উঠে মুখ-টুখ ধুলেই হবে এখন।"

মিঃ ঘোষ আর কিছু বলিলেন না। বলিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। গভীর শ্রান্তি ও অবসাদের ভারে তাঁহার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বেদানার রসটুকু খাওয়াইয়া দিলে তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নির্ম্মলা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার বিশুষ্ক পরিম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইহজগতে তাহার একমাত্র

যিনি আশ্রয়, আজ বুঝি তাঁহাকে সে জীবনের মত হারাইতে বসিয়াছে !

চারদিন আগে বৈকালের দিকে মিঃ ঘোষের প্রথমে অল্প জ্বর হয়। রাত্রে সেই জ্বর বাড়িতে বাড়িতে ক্রমশঃ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক অনিল বাবু সকালে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "তাঁহার অসুখ গুরুতর···জীবনের আশঙ্কা আছে। বিশেষ সাবধানে রাখিতে হইবে।"

নির্ম্মলার চোখের সামনে সব অন্ধকার হইয়া আসিল। সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইল। তাহার পরই তাহার চোখে অশ্রুর বন্যা নামিল।

নির্ম্মলার অসহায় কাতর মুখের দিকে চাহিয়া প্রবীণ চিকিৎসক ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন, "দেখুন···আপনাদের বাড়ীতে যখন আর দ্বিতীয় লোক কেউ নেই, তখন আপনাকেই সমস্ত দিক ভেবে বুঝে চলতে হবে। কাজেই সব কথাগুলো আপনার জানা দরকার। মিঃ ঘোষের হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ···শরীরে তাঁর আর শক্তি বিশেষ কিছু নেই। গত কয়েক মাসের অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনায় দুশ্চিন্তায় তাঁহার জীবনী-শক্তি একেবারে ক্ষয় করে ফেলেছে। এখন এই যে অবসাদ ও ক্লান্তিতে তাঁকে এমন অবসন্ন ও চৈতন্যহীন করে রেখেছে, এ অবস্থা থেকে সুস্থ করে তোলা খুব কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ। ওঁকে সর্ব্বক্ষণ খুব সাবধানে রাখবেন। ওঠা বসা একেবারেই বারণ,—বিছানার উপরেও এখন কিছু দিন উঠে বসতে দেবেন না। সর্ব্বদা শুয়ে থাকবেন। আর উনি যখন যা বলবেন, তার যেন কোন রকম অন্যথা না হয়। মন যেন সব সময় ভাল থাকে। এ সময়ে মনের কোন রকম সামান্য উত্তেজনাও ওঁর পক্ষে অনিষ্টকর। বিরক্তি রাগ

বা উৎকণ্ঠা···বা এ রকম কোন উত্তেজনার কারণ ঘটলে ···ং কোন ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাহার পর তিনি বলিলেন, "আপনি যেন এ সব কথা শুনে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়বেন না। শুধু ··· ভাবে রাখা দরকার বলেই আপনাকে এত কথা বলতে হলো। জ্বরটা দু-চার দিনেই কমে যেতে পারে। তার পরে এই রকম খুব সাবধানে কিছু দিন রেখে নিয়মিত চিকিৎসা ও সেবা হলেই আস্তে আস্তে সেরে উঠবেন এখন। কিছু ভয় পাবেন না আপনি! আমি দুবেলা এসে দেখে যাবো, তার মধ্যেও যদি দরকার হয়···তখনি ডেকে পাঠাবেন।”

ডাক্তারের এ আশ্বাস-বাণী নির্ম্মলার মুহ্যমান হৃদয়ে বিশেষ আশার সঞ্চার করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত দেহ-মন অনিশ্চিত আশঙ্কায় ও উদ্বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ও থাকিয়া থাকিয়া কে··· মনে হইতেছিল···তাহার পিতা এ রোগ-শয্যা ছাড়িয়া বুঝি আর উঠিবেন না।

চার পাঁচ দিন পরে মিঃ ঘোষের জ্বর ছাড়িয়া গেল। শরীর দুর্ব্বল থাকিলেও সেদিন যেন তিনি একটু সুস্থ বোধ করিলেন।

দুপুরে নির্ম্মলা আহারাদি করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলে, তিনি তাঁহার কম্পিত ক্ষীণ হাতখানি তুলিয়া নির্ম্মলার কোলের উপর রাখিলেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিলেন, “তুই যে দেখছি বড় রোগা হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিস···মিলু! এ ক'দিন বুঝি রাতদিন আমার কাছে বসে কাটিয়েছিস···নয়? খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি···অসুখটা দেখে···না মা?”

নির্ম্মলা মুখ ফিরাইয়া গাঢ়স্বরে বলিল, “ও কিছু নয় বাবা!

আমি ত ভালই আছি। তুমি নিজে কেমন আছ…বল দেখি? আজ একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?"

—"হ্যাঁ মা! আজ আমার শরীরটা যেন খুব হাল্‌কা বলে মনে হচ্ছে! জ্বরটা ছেড়ে গেছে কি না? দুর্ব্বলতা যেটুকু আছে…ওটা ক্রমশঃই কমে যাবে। কিন্তু মিলু! আজ শুধু শরীরটা নয়…মনটাও যদি ভিতর থেকে এমনি সুস্থ ও প্রফুল্ল হয়ে উঠতো! তুই ত জানিস্ নে মা! সে সব কথা! এত দিন ধরে মস্ত বড় একটা বোঝা বুকের উপর চেপে থেকে আমার দম বন্ধ করে মারছে। আজ আমার বুক থেকে সে বোঝা নেমে গেলে মন আমার হাল্‌কা ও প্রফুল্ল হয়ে উঠতো! মনে হচ্ছে…আমি যদি এত দিনেও ক্ষমা পেতুম মা! তা হলে কি যে একটা স্বস্তি ও শান্তিতে মন আমার ভরে উঠতো…সে আর তোকে কি বোলবো…মিলু! আমি যেন বেঁচে যেতুম আজ।"

মিঃ ঘোষ এত কথা এক সঙ্গে বলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলার একদিন এ সব কথা জানিবার জন্য আগ্রহ ও কৌতূহলের অন্ত ছিল না; কিন্তু আজ সে এ কথায় অত্যন্ত ভয় পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল…কোন্ কথায় কি আসিয়া পড়িয়া শেষে একটা কাণ্ড না ঘটে!

সে বলিল, "ও সব কথা যেতে দেও, বাবা! তোমার শরীর দুর্ব্বল, এর উপর বেশি কথা বললে অসুখ করবে। ডাক্তার বাবু বারণ করে গেছেন…কথা বলতে! তুমি চুপ করে ঘুমিয়ে পড়।"

মিঃ ঘোষ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার ত সবই জানে। গোটাকতক বাঁধা গৎ শিখে রেখেছে…তাই আউড়ে বেড়ায়। আমার মনের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা সে জানবে কোথা হতে!

আমায় সব বলতে দে মিলু! যা আমি বলতে চাই···সে সব কথা বলা হলে আমি আরো সুস্থ হতে পারবো।"

আর কিছু বলিলে তিনি হয় তো বিরক্ত হইবেন, সেই ভয়ে নির্ম্মলা আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মিঃ ঘোষ বলিলেন—"আচ্ছা নির্ম্মল তোর বাবার উপর তোর বড় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে···নয়? তুই ত জেনে রেখেছিস···আমি একটা মস্ত দেবতুল্য লোক!"

নির্ম্মলা নীচু হইয়া তাহার মুখখানি মিঃ ঘোষের বিশুষ্ক কপোলের উপর রাখিয়া আদরের সুরে বলিল, "সে কি মিছে কথা···বাবা? আমার বাবার মত মহৎ লোক এ সহরে ক'টা আছে···বল তো শুনি?"

মিঃ ঘোষ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঐ তো···ঐখানেই যে মস্ত ভুল থেকে গেছে···মা! শুধু তুই কেন···এ ভুল বিশ্বাস অনেকেরই মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে! কিন্তু আমি যে একদিন কত বড় ··· করেছিলুম, তা যদি তুই জানতিস···নির্ম্মল!"

মিঃ ঘোষ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা এ কথায় অত্যন্ত আহত হইয়া বলিল, "ও সব কথা কেন ভাবছো···বাবা? আমি নিজের চোখে দেখলেও কখনো বিশ্বাস করতে পারি না···যে তোমার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয়েছে!"

"—কিন্তু সত্যিই আমি বড় অনুচিত কাজ করেছি মা! জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করেও তার কোন প্রতিকার করতে পারলুম না। মানুষকে অত বেশী বিশ্বাস করিস নে মিলু! দোষ-গুণ মিলিয়ে মানুষ···মানুষই···সে দেবতা নয়···ভুল-ভ্রান্তি তার পদে পদে!"

তাহার পর আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মিঃ ঘোষ বলিতে লাগিলেন···"আমি নিজে কিন্তু কোন অন্যায় কাজ করি নি! আমার

নামে···আমার মতে অন্য লোক সে সব কাজ করেছিল। কাজেই, তার জন্য সকলের কাছে আমিই দায়ী! আমার বুদ্ধির দোষে একটা নির্দ্দোষ লোক গৃহহীন নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে বেড়িয়েছে! তার দুঃখ···তার মনের জ্বালা···কি এক দিনের জন্যও ভুলতে পেরেছি!"

মিঃ ঘোষ চোখ বুজিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "যতদিন বয়স অল্প ছিল, ততদিন তবু এমন তীব্র ভাবে এ সব কথা মনে জেগে বসতো না—কিন্তু যেদিন থেকে তোর মাকে ঘরে আনলুম, যেদিন তোকে কোলে পেলুম, সেই দিন থেকে বেশ বুঝলুম, কি আগুন বুকে নিয়ে রামগোবিন্দ দেশান্তরী হয়ে গিয়েছে! দুধের ছেলে অসিতকে নিয়ে—"

নির্ম্মলা এতক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, অসিতের নাম শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! এতদিন যে অস্পষ্ট সংশয়ের ছায়া কেবলই তাহার মনে অশান্তি জাগাইয়া তুলিত, আজ এক মুহূর্ত্তে সে সংশয় ঘুচিয়া সবই পরিষ্কার হইয়া গেল!

তাহার সেই প্রবল কম্পন অনুভব করিয়া মিঃ ঘোষ চোখ খুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, "তুই বুঝি অসিতের নাম শুনে চমকে উঠলি মিলু? সেই অসিত—সেই যে পাটনার জঙ্গলে—তোর হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছিল? আঃ! কি করেই যে সব কথাগুলো তোকে বলি?"

মিঃ ঘোষ আবার চক্ষু মুদিলেন, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নিজের মনে মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন—"না···বলা যায় না! সে সব কথা··· মুখে এমন করে বলা যায় না। তাই ত সব লিখে রেখেছি! আমার

টেবিলের বাঁ-দিকের ড্রয়ারে···বুঝেছিস্···মা? এক তাড়া কাগজ আছে···দেখলেই সব বুঝতে পারবি!"

তাঁহার মৃদু স্বর ক্রমে আরও মৃদুতর হইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বিজ বিজ করিয়া তিনি আরো কত কি বকিতেছিলেন। নির্ম্মলা ···রামগোবিন্দ ও অসিত এই দুটি নাম ছাড়া আর কিছু বুঝিতে পারিল না।

সে স্তম্ভিত হৃদয়ে রুদ্ধবাক্ হইয়া পিতার শিয়রে বসিয়া ছিল। মিঃ ঘোষের লিখিত কাগজে তাহার জন্য না জানি কি ভীষণ তথ্য অপেক্ষা করিতেছে! এ অনিশ্চিত উদ্বেগ দিনের পর দিন ধরিয়া আর তো এমন ভাবে সহ্য করা যায় না! এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে?

ধীরে ধীরে আবার তাহার মনে অসিতের চিন্তা জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার পিতা যে অসিতের কতখানি ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা সে কিছুই জানে না; কিন্তু তাহার জন্য এই যে তাঁহার জীবনব্যাপী তীব্র অনুতাপ···এই যে ঘোর মানসিক অশান্তি—ইহাতেও কি সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল না? অসিত ত তাঁহাকে তাহার পরম শত্রু বলিয়া জানিয়া, তাঁহার প্রতি তীব্র প্রতিহিংসা পোষণ করিতেছে। সে যদি একবার তাহার প্রতি তাহার মনের প্রকৃত ভাবটা জানিতে পারিত! আর একবার কি কোনরূপে তাহার দেখা পাওয়া যায় না?

পিসিমা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "দিনটা ভোর এমনি করে ঠায় বসে আছ? দাদা ত ভাল আছেন আজ? একটু শুলে হতো? আজ পাঁচ দিন পাঁচ রাত একাক্রমে বসে কাটছে, একটু জিরেন না হলে মানুষের শরীর থাকে? ওঠ দেখি···ও ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে ঘুমোও গে। আমি খানিক বসছি।"

নির্ম্মলা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, এখন আর শোব না… পিসিমা, তিনটে বেজে গেছে। শীতের দিনে অবেলায় ঘুমোলে শরীর অসুখ করবে! তুমি বরং শোও একটু। সকাল থেকে এত খাটুনি খেটে এলে!"

পিসিমা বলিলেন, "আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না বাছা! তুমি নিজের শরীরটার একটু যত্ন কর তো! না শোবে যদি, ত যাও… একটু বাগানের দিকে ফাঁকা হাওয়ায় বেড়িয়ে এসো। দিন রাত না ঘুমিয়ে…আর বন্ধ ঘরে বসে ভেবে ভেবে চোখ-মুখ শুকিয়ে বসে গেছে একেবারে! এর পরে তুমি পড়লে রুগী দেখবে কে এমন করে? ওঠো…আমি বসছি এখানে!"

নির্ম্মলা এবার আর আপত্তি করিল না, তাহার মনের তখন যে অবস্থা…তাহার কেবল মনে হইতেছিল, নির্জ্জনে গিয়া একবার খানিক ভাবিয়া ও কাঁদিয়া আসে!

নিদ্রিত পিতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল…"বাবার ঘুম ভাঙ্গলেই আমায় ডেকে দিও পিসিমা!"

—"সে আর তোমায় বলতে হবে না!" বলিয়া পিসিমা নির্ম্মলার পরিত্যক্ত বিছানার পাশে বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ ঘোষ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। পাশের জানালা দিয়া এক ঝলক রৌদ্র তাহার মুখে আসিয়া পড়ায় পিসিমা উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া আসিলেন। শালখানা টানিয়া মিঃ ঘোষের পায়ের উপর ভাল করিয়া চাপা দিতে দিতে বলিলেন, "এদের যে কি স্বভাব…বল্লে ত কথা শুনবে না…রোগা মানুষকে কি এমন উত্তর-শিয়রি করে শোয়ায় কখনো! যত সব অনাচার…আর খ্রীষ্টানী কাণ্ড! এ সব অলুক্ষুণে কাজ দেখলে আমাদের মন খুঁত খুঁত করে!"

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পিসিমার মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তখনি তিনি সজাগ হইয়া চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর মৃদু মৃদু বলিলেন, "পোড়া পেটে দু-মুটো ভাত পড়লেই যেন রাজ্যের আলিস্যি এসে জড়িয়ে ধরে!"

এবার তিনি বিশেষ সাবধান হইয়া দুই হাতে চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর তন্দ্রায় তাঁহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিল...

নির্ম্মলা মিঃ ঘোষের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাগানের ভিতর একখানা বেঞ্চের উপর বসিল। শূন্যমনে সে কিছুক্ষণ উদাস নেত্রে চাহিয়া ভাবিল...সে এখন কোথায় আছে... কে জানে? হয় ত তাহারই খুব নিকটে কোথাও অবস্থান করিতেছে...এই একই আকাশের তলে...হয় তো একই সহরে...পাশাপশি তাহারা দুজনে রহিয়াছে...কত নিকটে...তবু...কত দূরে! নিয়তি তাহাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছে...তাহা দূর করিয়া তাহারা কোন দিন জীবনে পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারিবে না...তাহা তো নিশ্চিত...তবু...একবার যদি সে আসে! এই একটিবার তাহার দেখা পাইবার আশা কিছুতে তাহার মন হইতে যায় না। সকল কাজ, সকল চিন্তার মধ্যে...প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে এই একটি আশা তাহার মনে জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তোলে! যাহা হইবার নয়... তাহার জন্য কেন আর এত ভাবিয়া মরা!

কিন্তু যদি সত্যই এমন হয়... যদি সত্যই কোন দিন সে আসে, সে তখন কি বলিবে? কি বলিবারই বা তাহার আছে? চোখ মুছিয়া নির্ম্মলা ভাবিল, এবার যদি কোন দিন সে তাহার দেখা পায়,

তবে তাহার পিতার কথা সমস্ত বলিয়া সে নিজে তাঁহার জন্য তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। দুর্ব্বহ অশান্তির জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া তাহার পিতা আজ মৃত্যুশয্যায় শয়ান,…এখনো সে চিন্তা, সে ব্যথা তাঁহার অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই। আজ এই শেষ মুহূর্ত্তে…যদি সত্যই তাঁহার জীবনের অবসান হইয়া আসিয়া থাকে, তবে আজো কি তিনি এই বেদনা…এই অনুতাপের জ্বালা বুকে লইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন? জীবনের শেষ দিনেও কি সে তাঁহার প্রাণে একটু স্বস্তি, একটু শান্তি দিতে পারিবে না? তাহার মান অপমান কিছু ভাবিবার সময় নাই, নিজের কোন কথা সে বলিতে চায় না, কোন দিন বলিবেও না। তাহার পিতার জন্য যেমন করিয়া হোক্ এ কাজ করিতেই হইবে! কিন্তু হায়! অসিত আজ কোথায়!

সন্ সন্ শব্দে গাছের পাতা কাঁপাইয়া একটা জোর বাতাস বহিয়া গেল! তাহার পরেই শুষ্ক পাতার উপর মর্ মর্ করিয়া শব্দ হইতেই নির্ম্মলা মুখ ফিরাইয়া দেখিল…তাহার সম্মুখে… অসিত!

অকস্মাৎ নির্ম্মলার বুকের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে…না তাহার একাগ্র চিন্তার বস্তু রূপ ধরিয়া তাহার চিন্তাশক্তির আকর্ষণে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? কি এ! সে কোন কথা বলিতে পারিল না! কেবল স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল!

অসিতও দু-এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর সে একটু হাসিয়া বলিল—"আমায় হঠাৎ একেবারে এখানে দেখে আপনি অবাক্ হয়ে গেছেন…দেখছি! আমার কিন্তু দোষ নেই কিছু! আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার চাকরটাকে খবর দিতে বলেছিলুম। সে আমায় ডেকে নিয়ে এসে এইখানে ছেড়ে দিয়ে গেল!"

নির্ম্মলা তবু কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার গলা বুক শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল !

অসিত একটু অপেক্ষা করিয়া আবার বলিল, "আজ একটা বিশেষ দরকারের জন্য আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু সে-কথা বলবার আগে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এর পূর্ব্ব দিন আপনার সঙ্গে যে অভদ্র ও পশুর মত ব্যবহার করে গেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। আপনি সে-জন্য আমায় মাপ না করলে আমি আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে পারবো না।" নির্ম্মলা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পলকহীন নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল, অসিতের মুখে এ-কথা শুনিয়া তাহার দৃষ্টি আপনাআপনি নত হইয়া আসিল। রুদ্ধ বেদনা ও অভিমানে তাহার চক্ষু জ্বালা করিয়া জল আসিতেছিল,—সে নিজেকে সংযত করিবার জন্য মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

অসিত কিন্তু তাহার এ-ভাব বুঝিল না, সে ভাবিল—সেদি[illegible] আচরণে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়াই সে নীরব হইয়া আ[illegible]

সে বলিল,—"সেদিন এখান হতে চলে যাবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত আমি একদিনও সুস্থির হতে পারিনি। কেন যে অমন বর্ব্বরতা করেছিলুম, সে-কথা আপনাকে না বলাই ভালো। আপনি যখন কিছুই জানেন না, তখন কতকগুলো অবান্তর কথা বলে মিছে আপনাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? কিন্তু যে কারণেই হোক্ আপনার সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার করা আমার বড় অন্যায় হয়েছে। তবে আপনাকে ব্যথা দিয়ে এ ক'দিন আমার যে কি করে কেটেছে, তা যদি আপনি জানতেন!"

অসিতের বিষাদপূর্ণ গভীর কণ্ঠস্বরে তাহার মনের দুর্নিবার বেদনা ফুটিয়া উঠিল। নির্ম্মলা অত্যন্ত আঘাত পাইয়া একবার অসিতের

বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের দিকে চাহিল। কি যে সে বলিবে, কিই-বা সে করিবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কেন যে অসিত সেদিন তাহাকে ওভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া রাগিয়া চলিয়া গেল, কেনই-বা আজ আবার নিজে আসিয়া এমন দীনভাবে ক্ষমা চাহিতেছে—সে ত কিছুই বোঝে না! সেদিন যে কারণ ছিল, আজও ত সে কারণ তেমনি অব্যাহত রহিয়াছে!

অসিত তখনো নির্ম্মলাকে নীরব দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আপনি এখনও সে ব্যাপারটা ভুলতে পাচ্ছেন না, দেখছি! কই, কিছু বলছেন না ত? আমি দোষ করেছিলুম, আবার ফিরে এসে সে অন্যায় স্বীকার করছি, তবু কি আমায় মাপ কর্ব্বেন না?"

এবার নির্ম্মলা আর থাকিতে পারিল না। মাথা তুলিয়া বলিল, "আপনাকে ক্ষমা করবার আমার কোন অধিকার নেই অসিতবাবু! বরং আমরাই আপনার কাছে দোষী—আমরাই আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কথাটা যে আপনার কাছে কি করে তুলবো, তাই আমি এতক্ষণ ধীরে ধীরে ভাবছিলুম!"

অসিত অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল।

নির্ম্মলা একবার এদিক ওদিক চাহিয়া, ঢোঁক গিলিয়া তাহার আঁচলটা টানিয়া সোজা করিতে করিতে নত মুখে বলিল, "কিছুদিন আগে আমি জানতে পেরেছি, যে বাবা কোনও সময় আপনাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন অন্যায় ব্যবহার করেছেন। তিনি যে আপনাদের কি পরিমাণ ক্ষতি করেছেন, আমি তার কিছুই জানি না, তাঁর হয়ে এ-ভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলবার আমার কোন অধিকার আছে কি না, তাও আমার জানা নেই,—শুধু আজ কয় মাস ধরে তিনি

যে অশান্তি ও যাতনা ভোগ করছেন, তাই দেখে দেখে আমার নিজের অসহ্য হয়ে উঠছে। যদি সত্যিই তিনি কোন দোষ করে থাকেন—তার ত যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে,—আপনি তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন না কি ?"

বলিতে বলিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে তাহার অশ্রুভরা চক্ষু দুটি অসিতের প্রতি স্থির রাখিয়া বলিল, "যেদিন পাটনার সেই জঙ্গলের মধ্যে আপনার সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হয়, আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি, তার পর থেকেই তাঁর মানসিক রোগের সূত্রপাত হয়। প্রথম প্রথম আমি এ-সব কিছুই বুঝতে পারতুম না। তাঁর সর্ব্বক্ষণ আশঙ্কা, মনের উদ্বেগ, চাঞ্চল্য দিন দিনই বাড়তে লাগলো। আজ তিনি সেই অশান্তির ফলে শয্যাগত হয়ে পড়েছেন, আর কখনো সুস্থ হতে পারবেন কি না, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তবু এই অসুখের মধ্যেও তাঁর মনে এখনো সেই সব কথাই জাগছে। কি করে যে আমি তাঁকে এ অবস্থায়ও একটু শান্তি দেব, কিছুতে তা ভেবে পাচ্ছিলুম না। হয় ত এমনি করেই কোন্ দিন অতর্কিতে তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে !"

ঝর ঝর করিয়া নির্ম্মলার নয়নের অশ্রু অবাধে ঝরিতে লাগিল। অসিত তাহার অশ্রুসিক্ত কাতর মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল !

কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া নির্ম্মলা আবার বলিল, "তাঁর কথা থেকে আমার মনে হয়, হয় ত এর মধ্যে কিছু গোল আছে, হয় ত আপনারা তাঁকে যতটা দোষী ভাবেন, তাঁর তত দোষ নেই। আর যদি সত্যই তিনি সে দোষ করে থাকেন, তার জন্যও তিনি অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। আজ তিনি অনুতপ্ত, বৃদ্ধ, অসহায়,

রোগশয্যাশায়ী, আজ তিনি আর আপনার প্রতিহিংসার পাত্র নন্, অসিত বাবু! আজ আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন! আপনার ক্ষমা পেয়েছেন জানলে তাঁর শেষ জীবন শান্তিময় হয়ে উঠবে!"

নির্ম্মলার কথা শেষ হইলে অসিত কিছুক্ষণ স্থির চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "ক্ষমা করবার কি কিছু বাকি আছে, নির্ম্মলা? তাঁকে যদি মন থেকে ক্ষমা করতে না পারতুম, তা হলে কি আজ এমন ক'রে তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারি?"

অসিতের মুখে তাহার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল। পরক্ষণেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া গভীর সুখে ও বেদনায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ যেন তাহার এতদিনের সকল সংশয়, সকল ব্যথা ও ভাবনার অবসান হইল। তাহার এতদিনের দগ্ধ ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে কে যেন অমৃতের প্রলেপ দিয়া তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিল। আজ সে অকূলে কূল পাইল!

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে নির্ম্মলার দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অসিত সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "মিঃ ঘোষের অন্যায় যে কত বড় গুরুতর, সে তুমি কিছুই জান না, নির্ম্মলা! জেনে দরকারও নেই—কারণ, আমি অনেক চেষ্টা করেও তাঁর প্রতি প্রতিহিংসার ভাব বজায় রাখতে পারি নি। তোমায় দেখবার পর থেকে আমার এতদিনের সব ধারণা, সব বিশ্বাস ওলোটপালোট হয়ে গেছে। তবু আমি কর্ত্তব্যবোধে চিরদিন তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবো বলেই মনস্থ করেছিলুম। তার জন্য নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি, অনেক চেষ্টা করেছি। এই কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত মন স্থির করতে পারি নি, সে ত তুমি জানই। তবে শেষ পর্য্যন্ত

আমারই পরাজয় হলো। উচিত বা অনুচিত যাই হোক্—আর আমি তোমাদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতে পারলুম না।"

নির্ম্মলা তখনো তেমনি নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। অসিতের ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটি সযত্নে মুছাইয়া দেয়; কিন্তু সে আগের মতই নীরবে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া মনের ভার লঘু হইলে নির্ম্মলা চক্ষু মুছিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। এই ঘটনার পর তাহাদের পরস্পরের মনের ভাব উভয়ের নিকট আর কিছু অগোচর রহিল না।

নির্ম্মলা বলিল, "তুমি একবার বাবার কাছে চল! তোমায় পেলে আর তোমার কথা শুনলে তিনি মন থেকে শান্তি পেয়ে শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠবেন।"

অসিত বলিল, "আজ আর সময় নেই। কথায় কথায় অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে। আমার হাতে এখন কত যে গুরুতর কাজের ভার রয়েছে—সে তুমি জান না। আমার নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই তোমার জানা নেই। যদি কোন দিন সময় পাই, তবে আর এক দিন এসে সব বলে যাব। এখন যে জন্য এসেছি সেই কথাটা বলি। আজ থেকে দুদিন পরে এখানে একটা বিদ্রোহ আরম্ভ হবে। হয় তো সেই কাণ্ডটা সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী হতেও পারে। এ ঘটনা যে কি রকম হয়ে দাঁড়াবে, কত দিন ধরে চলবে, সে এখনো আমরা কিছু ঠিক করতে পারছি না। তাই সহরের নির্ব্বিরোধ লোক ও শিশু, বৃদ্ধ ও মেয়েদের জন্য আমরা একটা নিরাপদ স্থানও ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাই তোমায় বলতে এসেছিলুম, যদি সে রকম গোল কিছু হয়, তা হলে যে লোক এসে তোমাকে ঠিক এই রকম আংটি দেখাবে, তাকে

বিশ্বাস করে তোমরা তার সঙ্গে চলে যেও। সে আমাদের দলেরই বিশ্বস্ত লোক—সে তোমাদের ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়ে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবে।"

অসিত তাহার হাত হইতে একটি আংটি খুলিয়া লইয়া নির্ম্মলার সামনে রাখিল।

নির্ম্মলা ক্ষণকাল সশঙ্কিত দৃষ্টিতে অঙ্গুরীর দিকে চাহিয়া রহিল। অসিতের এই সব কথা শুনিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। সে বলিল,—"এ সব কি কথা যে বল্লে, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। আবার কি মিউটিনি হবে? তুমি সে সময় কোথায় থাকবে তা হলে?"

অসিত একটু হাসিয়া বলিল, "সেটা এখন ঠিক বলতে পাচ্ছি না। কোথায় থাকবো, কি করবো, সবই এখন অনিশ্চিত। তবে এ ব্যাপারটা সব আমরাই গড়ে তুলেছি, আমাদেরই হাতে সমস্ত ভার—কাজেই আমাদেরই সব দিক দেখতে শুনতে হবে। আজ এখন আমি যাই—তা হলে। এ সব গোল মেটবার পরও যদি বেঁচে থাকি, তখন আবার দেখা হবে। এর মধ্যে তুমি মিঃ ঘোষকে আমার কথা বলে রেখো। আমার দ্বারা কোন দিন তাঁর কিছু ক্ষতি হবে না—এ বিশ্বাস তিনি রাখতে পারেন।"

নির্ম্মলা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। যদি-বা এতদিন পরে সব বৈরিতা ভুলিয়া অসিত তাহার কাছে আসিল, তবে আবার এ-সব কি হেঁয়ালি আরম্ভ হইতে চলিল? তাহার ভাগ্যে কি চিরদিনই এইরূপ একটা না একটা বিপর্য্যয় লাগিয়া থাকিবে?

অসিত আবার বলিল, "মিঃ ঘোষকে বলবার কথা আমারও অনেক আছে, নির্ম্মলা! তাঁর কাছে শোনবার কথাও আমার ঢের

বেশি ছিল; কিন্তু এখন আর সে সময় নেই। দেশব্যাপী এত বড় একটা ঘটনার সময় ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাটো কথা বা দাবী চলতে পারে না। সে সব ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক্! তোমার সঙ্গে সেদিন রূঢ় ব্যবহার করে গিয়ে অবধি মনে শান্তি ছিল না, সেই জন্য, আর এই কথাটা বলে যাব বলে—ছুটে আসতে হলো। আমি এখন উঠি—বড় দেরি হয়ে গেল।"

অসিত আর দাঁড়াইল না। নির্ম্মলাও তাহার সঙ্গে উঠিল। উভয়ে বাগান হইতে বাড়ী যাইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, মিঃ ঘোষ সামনের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন। প্রবল জ্বরে তাঁহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। জ্বরের ঘোরে কখন্ তিনি ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন।

অসিত ও নির্ম্মলা হঠাৎ তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি ব্যাপার!

অসিতের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সহসা মিঃ ঘোষের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আতঙ্কের রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভগ্নস্বরে বিকৃতকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ও কি? তুমি? তুমি এখানে?" তাঁহার সর্ব্বশরীর কিসের উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তিনি পড়িয়া যান দেখিয়া অসিত তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছিল।

মিঃ ঘোষ তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া ভয়-ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"নির্ম্মল! নির্ম্মল! ধর! আমায় ধর!" বলিতে বলিতে তিনি বিবর্ণ মুখে ছিন্নমূল তরুর মত অসিতের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

৪২

কয়েক দিন বীণা জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে অজ্ঞান অচৈতন্য ভাবে মৃতের ন্যায় নিঃস্পন্দ পড়িয়া রহিল। অসহ্য যাতনা হইতে মুক্তি দিবার জন্য ডাক্তার ঔষধের সাহায্যে কতকটা এই অবস্থায় রাখিয়াছিলেন।

মিসেস্ রায় এই আকস্মিক বিপদে শোকে দুঃখে বিভ্রান্ত ও উন্মাদপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। বীণার সেবা করা, বা তাহার অবস্থা বুঝিবার মত সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। মাঝে মাঝে কেবল তাহার ঘরে ছুটিয়া গিয়া গোলযোগ ও বিলাপ করা ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার দ্বারা হইত না। নার্শেরা সেই জন্য জোর করিয়া তাঁহাকে সে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিত।

তখন তিনি বাহিরে আসিয়া কেবল লীলাকে তিরস্কার করিতেন। তিনি নিজেও যে সে সময় ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন ও অন্য দিনের মত বাজে গল্প করিয়া কাটাইতেছিলেন, সে-কথা কখনো তাঁহার মনে পড়িত না। তিনি লীলাকে বলিতেন,—'তুমি যে তখন কোথায় ছিলে, আর কিই-বা কাজে ব্যস্ত ছিলে—যে এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটলো, তার কোন খোঁজ-খবর রাখলে না? জানিই ত, কি আত্ম-সুখী আর স্বার্থপর মেয়ে তুমি,—চব্বিশ ঘণ্টা কেবল নিজের আমোদ আর সুখ নিয়েই আছ। সেদিনও তেমনি নিজের আমোদে নিজেই মেতে ছিলে,—তাকে দেখবার তোমার অবসরই বা কোথায়? তার কাছে কাছে থাকলে কি এমন ধারা হতে পারতো?'

লীলা অবশ্য সেদিন নিজের বিষয়েই আত্মহারা হইয়া ছিল, স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য তাহার কিছুই বলিবার ছিল না। সে বেচারা রাত-দিন মিসেস্ রায়ের এই অন্যায় বকুনি নীরবে সহ্য করিত।

'হায়! আমার সোনার প্রতিমা! জীবন-ভোর তার এই কষ্ট,

বীণা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "আমার কাছে অত কিছু ঢাকাঢাকির দরকার নেই। সত্যি যা—আমি তাই জানতে চাই।"

নার্শ বলিল, "সত্যি কথাই বলছি—পোড়া ঘাগুলো খুব শীগগির সেরে এসেছে! এটা খুব ভাল লক্ষণ বল্‌তে হবে।"

বীণা অধৈর্য্য হইয়া বলিল,—"লীলাকে ডাক। আমার ঘায়ের লক্ষণ জানবার জন্য আমি তোমায় ডাকিনি। জ্বালাতনে পড়া গেছে!"

লীলা আসিয়া দাঁড়াইতেই বীণা বলিল,—"লীলা! ডাক্তাররা আমার সম্বন্ধে কি বলছেন? আমি সত্যি কথা জানতে চাই।"

লীলা বলিল, "ভালই। তুমি ত খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সেরেই উঠেছ!"

—"আঃ! তোমরা আমার কথাটা না বোঝবার ভাণ কচ্ছো কেন? আমি আমার গায়ের পোড়া দাগগুলোর কথা বলছি।"

লীলা শান্তভাবেই বলিল, "দাগগুলো অবশ্য একবারে যাবে না। কিন্তু ভেবে দেখ, আরও কত মন্দ ঘটনা ঘটতে পারতো! তোমার প্রাণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা হয় নি। তোমার চোখ যেতে পারতো, তা হলে তুমি যাবজ্জীবন অন্ধ হয়ে থাকতে! সে সব দুর্ঘটনা থেকে তুমি ত বেঁচে গেছ দিদি! যে ব্যাপার ঘটেছিল, তার কাছে দু-একটা দাগ থাকা কি বেশি কথা?"

বীণা বলিল, "ডাক্তাররা কি বলেছে—আমার চোখ যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল?"

—"কি করে—আর কত অল্প স্থানের জন্যে যে তোমার চোখ দুটো বেঁচে গেছে, তাই দেখে তাঁরা অবাক্ হয়ে গেছেন। তোমার দৃষ্টিহীন হওয়া বা বিকলাঙ্গ হয়ে থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি রকম ছিল।"

বীণা ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—"উঃ ! চোখ গিয়ে বেঁচে থাকা যে কি ভয়ানক—আমি ত এ-কথা ভাবতেই পারি না। আমি তা হলে ঠিক অরুণের মত অসহায় হয়ে থাকতুম! যখন আমি তাকে ছেড়ে দিই, সেই সময়ের মত ! আমি তা হলে খুব বেঁচে গেছি !"

শান্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে বীণা লীলার হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল। তাহার চক্ষু হইতে অজস্র ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

লীলা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কাঁদো কেন ভাই ? বিপদ ত কেটে গেছে—আর কান্না কেন ?"

বীণা বলিল, "ওঃ! আমি কি জানোয়ারের মত ব্যবহার করেছিলুম লিলি ? আমার এ শাস্তি ঠিক উপযুক্তই হয়েছে !"

লীলা সজলনেত্রে তাহার ললাটের উপর নত হইয়া চুম্বন করিল; বলিল, "ও-সব ভেবে আর কষ্ট পেয়ো না। বুদ্ধি ত সকলের সমান হয় না। তুমি হয় ত চিন্তাশীল না হতে পার, তবে তোমার স্বভাব দুষ্ট নয়! আমি আর সে-সব কথা ভাবি না। সেই বিপদের মুখ থেকে তোমায় যে ফিরে পেয়েছি, এই যথেষ্ট।"

বীণা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "তুমি ত জান না লীলা! আমি কত বড় অন্যায় করেছি! তুমি আমায় কত যত্ন করেছ, আমি কিন্তু তোমার এত ভালবাসা ও যত্ন পাবার উপযুক্ত নই! তুমি বিবাহিত হয়ে চলে যাবে, আমি তাতে খুব খুসী হব! এখানকার সব ঝঞ্চাট থেকে মুক্তি হবে তোমার! বল! আমায় মাপ করেছ—তা হলে ?"

লীলা বলিল, "নিশ্চয়ই। এ-কথা আবার জিজ্ঞাসা করছো ? আমিও তো যে-কোনও সময় হয় ত এমন একটা প্রলোভনে পড়তে পারি! তার আর আশ্চর্য্য কি ? এ-কথা ভেবে কেন কষ্ট পাচ্ছ, ভাই ?"

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া কতক্ষণ মনের আবেগে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বীণা যখন আবার কথা কহিতে সমর্থ হইল, তখন সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি সব কথা একবার খুলে তোমার কাছে বলতে চাই লিলি! না হলে আমি মনে শান্তি পাব না। তোমায় বলা হলে পর আর যত দিন বাঁচবো, কোন দিন এ-কথা মনে আনবো না। তাহার পর সে খানিক নীরব থাকিয়া বলিল, "যে রাত্রে আমি পুড়ে যাই, তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন,—কার কথা বলছি—বুঝছো ত?"

লীলা বলিল, "হ্যাঁ! কুমার তোমার কাছে ছিল, আমি জানি!"

—"সে রাত্রে তিনি আমায় বলছিলেন, সব ঠিক হয়ে গেছে! আমি যেন কাল রাত বারোটার সময় দরজার বাইরে অপেক্ষা করি—তিনি এসে আমায় নিয়ে যাবেন। সেই দিন শেষ রাত্রের ট্রেণ ধরে আমরা আগে কলকাতায় আসবো—তার পর একেবারে ভারতবর্ষের সীমা ছেড়ে চলে যাব। সেখানে আমাদের বিবাহ হবে।"

"ওঃ! বীণা!" বিস্ময়ে ও আতঙ্কে লীলার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল! ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইয়াছে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই!

বীণা বলিল, "আমি এত বড় সাহস ও প্রতারণার কাজ করতে কিছুতে রাজি হই নি। তিনি কেবল জোর করে আমায় সম্মত করাবার চেষ্টা করছিলেন। অন্যমনে কখন যে জ্বলন্ত বাতির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তা খেয়ালই ছিল না।"

লীলা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তোমার এ বিপদ যে তোমায় এর চেয়েও গুরুতর আর একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, তা আমি জানতুম না। যদি তুমি তার সঙ্গে যেতে, তা হলে তোমার দুর্দ্দশার সীমা থাকতো না! তার মত বদ্‌মাইস কি কখনো কোন মেয়েকে

ভালবাসতে পারে ? সে শুধু তোমায় জনমের মত নষ্ট করতে চেয়েছিল !"

বীণা সজলনেত্রে বলিল, "আমি কিন্তু তাকে সত্যি ভালবেসেছিলুম ভাই ! তুমি তার স্বভাব জেনে আমায় কত সাবধান করেছ, কত বুঝিয়েছ ; কিন্তু কেমন যে সে সময় তার উপর একটা মোহ এসেছিল, কিছুতে তাকে ছাড়তে পারতুম না। তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের দাসীকে টাকা দিয়ে তার দ্বারায় আমি তাকে চিঠিপত্র লিখতুম। কতদিন গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে বাগানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতো !"

লীলা বীণার চাতুরী ও সাহসের কথা শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল ! বীণার সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে গালাগালি করা মিসেস্ রায়ের একটা নিত্যকর্ম্ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, আজ যদি তিনি একবার বীণার নিজের মুখের স্বীকারোক্তিগুলি শুনিতেন !

বীণা যখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া নিজের অঙ্গের অবস্থা দেখিতে পাইল, সেদিন সে শোকে ও নিরাশায় মৃতপ্রায় হইয়া গেল !

ডাক্তাররা তাহার ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিলে মিসেস্ রায় তাহাকে দেখিয়া সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেদিন সর্ব্বক্ষণ তাঁহার বিলাপ ও রোদনে সকলে অস্থির হইয়া উঠিল !

"সকলে যখন আমার দিকে চেয়ে থাকবে, আমি সে দৃষ্টি কেমন করে সহ্য করবো ?" কান্নায় ফাটিয়া পড়িয়া বীণা লীলাকে বলিল, "আমি কারু সামনে বেরুব না, কারুকে মুখ দেখাব না !"

লীলা বলিল, "তোমার আবার সব তাতে বাড়াবাড়ি ! সুস্থ হও ! মন প্রফুল্ল কর ! সত্যিকার ভালবাসা এত তুচ্ছ নয় যে দুটো দাগ দেখলেই সরে যাবে !"

—"এখন আর আর আমায় কেউ ভালবাসবে না! যথার্থ ভালবাসা আমি মোহে পড়ে নষ্ট করেছি!" চৌধুরীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও নিজের ব্যবহার মনে করিয়া বীণা অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিল। সে কাঁদিয়া বলিল, "আমি যথার্থ ভালবাসাকে শ্রদ্ধা করতে শিখিনি, রূপের গর্ব্বে ও অভিমানে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছিল। যা সহজেই আমার হতে পারতো, সে সবই গেছে! এখন সারা জীবনের মত এই চোখের জল আর অনুতাপই আমার সঙ্গী হয়ে রইল!"

লীলা তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "অত নিরাশ হয়ো না ভাই! এই ত আমি তোমায় আগের চেয়ে আরও কত বেশি ভালবাসি। মায়ের, বাবার ভালবাসাও আগের চেয়ে এখন ঢের বেড়েছে! কেন মিছে দুঃখ করছো? সবাই তোমায় ভালবাসবে!"

বীণা অবশ্য সে সময় অন্য ভালবাসার কথা ভাবিতেছিল। তবু লীলার এই উচ্ছ্বাস তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল। সে বলিল, "এখন থেকে, আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসবো, পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করবো। আগে যদি সেটা হতো, তাহলে হয় তো আমি বিভিন্ন রকমের হয়ে উঠতুম। এ দুর্গতি হতো না তাহলে।"

বীণা দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার লুপ্ত সৌন্দর্য্যের শোকও ক্রমশঃ তাহার অভ্যস্ত হইয়া আসিল। তাহার সুগৌর উজ্জ্বল ত্বকের বর্ণলালিত্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অনিন্দ্যসুন্দর বাহু দুটিও পুড়িয়া একবারে কালো হইয়া গিয়াছিল!

কৌতুহলী হইয়া অনেক লোক তাহাকে দেখিতে আসিত। বীণা প্রায়ই কাহারও সহিত দেখা করিত না। তাহারা জজ সাহেবের সুন্দরী কন্যার ঈদৃশ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা চারিদিকে গল্প করিয়া

বেড়াইত। দুঃখে পড়িয়া বীণা বুঝিল—অনেক জনে বেষ্টিত থাকিলেও যথার্থ বন্ধুর সংখ্যা তাহার নিতান্ত অল্প।

অপরাহ্নে লীলা অরুণের সঙ্গে তাহাদের বাগানে বেড়াইতেছিল। বহুদিন পরে সেই সময় চৌধুরী আসিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইল।

লীলা দেখিল, চৌধুরী অত্যন্ত কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বহুদিন চৌধুরীকে না দেখিয়া লীলা অনেক সময় তাহার জন্য ভাবিত ও দুঃখিত হইত,—সে ত কই একবারও বীণার খবর লইতে আসিল না।

উৎসবের দিন কুমার বীণার নিকটে আসার পর সে রাগে ও হিংসায় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে এ অগ্নিকাণ্ড দেখে নাই, তাহার পর হইতে আর সে এদিকে আসে নাই। অনেক ভাবিয়া লীলা সিদ্ধান্ত করিল, এতদিনে হয় ত সে বীণাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই আর আসে না।

চৌধুরী লীলা ও অরুণের সঙ্গে দুই একটি কথা বলার পর লীলাকে বলিল,—তাহার কিছু বলিবার আছে, সে নির্জ্জনে কিছুক্ষণ তাহার সঙ্গে কথা বলিতে চায়।

লীলা তখন অরুণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চৌধুরীর সহিত ড্রইংরুমে আসিয়া বসিল।

তাহারা দুইজনে একা হইতেই চৌধুরী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল—"সে—বীণা কেমন আছে?"

লীলা তাহার এত দিনের উদাসীনতার শাস্তি দিবার জন্য তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—"ও রকম ঘটনার পর যেমন থাকা সম্ভব—তেমনি আছে। তোমার বুঝি এত দিন পরে তার খোঁজ নেবার সময় হলো?"

"—আমি যে বড় অসুখে পড়েছিলুম লীলা! তোমরা কি শোন নি—ডবল নিউমোনিয়ায় এতদিন ভুগছিলুম! সবাই জানে ত? উৎসবের দিন আমার মনটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় আমি মাঠের ধারে একটা গাছতলায় বসেছিলুম। তার পরে কখন যে বসে থাকতে থাকতে সেইখানে ঘুমিয়ে পড়েছি, সে আর কিছু বুঝতে পারি নি। সেই ঠাণ্ডা লেগে বাড়ী যেতে না যেতেই জ্বর—কাসি—এত দিন শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম, সবে আজ প্রথম বাইরে বেরোতে পেরেছি।"

লীলার বিরক্তি দূর হইয়া গেল। সে অনুতপ্ত চিত্তে চৌধুরীর রুগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তাই তোমার এমন চেহারা হয়ে গেছে! আমরা ত কিছুই শুনি নি সে-কথা! আর কি করেই বা শুনবো বলো? আজ দুমাস ধরে বীণাকে নিয়ে যে করে আমাদের দিন কাটছে! এবার তা হলে বড় শক্ত অসুখে পড়েছিলে?"

চৌধুরী বলিল—"এত দুর্ব্বল আমায় করে ফেলেছে [illegible]লা! কিছুতে সামলাতে পারছি না। ভেবেছি, কিছুদিন পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে থাকবো। সবই এখন বীণার উপর নির্ভর করছে! তাই ত উঠতে পেরেই আগে এখানে ছুটে এলুম!"

লীলা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিয়া বলিল—"কেন, বীণার উপর নির্ভর করছে কেন?"

"—আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না! আজ যা হয়, একটা স্থির কিছু জানতে চাই যে, সে আমার সম্বন্ধে কি ভাবে—আমার হতে সে চায় কি না। যদি সে অসম্মত হয়, আমি স্থির করেছি যে, বিলাতে চলে যাব। দেখি—তাতেও আমার মনের পরিবর্ত্তন হয় কি না? এমন করে আর কতদিন চলবে—তুমিই বল?"

লীলা বলিল—"কিন্তু চৌধুরী! তোমায় বলতে আমার ভয় হচ্ছে—তুমি কিছুই জান না! সে ভয়ানক পুড়ে গেছে!"

"—আমি সব জানি!" চৌধুরী সরলভাবেই বলিল—"আমি তার কথা সব শুনেছি! শুনে পর্য্যন্ত আমার মনেও যে তার জন্য কি ব্যথা লাগছে, সে তুমি বুঝতে পারবে না। আহা! বেচারা কি কষ্টই সহ্য করেছে! এখন আমি কি তাকে একবার দেখতে পাব, লীলা?"

লীলা ভাবিল, বীণার মুখ যে কি কুৎসিত হইয়া গিয়াছে, চৌধুরী তাহা জানে না। জানিলে হয় ত দেখা করিতে চাহিত না। তাই সে বলিল—"সে আজকাল প্রায়ই কারুর সঙ্গে দেখা করে না! তার রূপ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে! আর কেউ তাকে কোন দিন সুন্দরী বলবে না!"

চৌধুরী বিচলিত না হইয়া খুব সহজ ভাবে বলিল—"সেটা হয় ত তার পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে। অসার রূপের গর্ব্বে তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল।"

লীলা বলিল—"চৌধুরী! যখন বীণা অত্যন্ত রূপগর্ব্বিতা লঘু-প্রকৃতি ছিল, তখন তাকে তুমি অসার জেনেও ভালবেসেছ, আর আজ? আজ সে কুৎসিতা—করুণার পাত্রী—আজ সব জেনেও তোমার ভালবাসা এখনো তেমনি অটুট আছে?"

চৌধুরী লজ্জিতভাবে বলিল—"আমি তাকে এক দিন তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের জন্য—তার আত্মম্ভরিতা জেনেও তাকে ভালবাসতুম। আর এখন তাকে কুৎসিত জেনেও তার চেয়ে আরও বেশি ভালবাসি। এখন তাকে দেখার যে কত প্রয়োজন—তা খুব কম লোকেই বুঝবে! আমি তাকে আজ একবার দেখতে যেতে পারি কি?"

লীলা প্রসন্নমুখে বলিল, "নিশ্চয়ই পার! এস, আমার সঙ্গে।"

সে চৌধুরীকে লইয়া বীণার দরজার কাছে গিয়া ডাকিল—"বীণা! একজন বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন!"

বীণা জানালার কাছে একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া উদাসনেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। বিগত দিনের প্রেম ও স্মৃতির মাধুর্যে তাহার অন্তর তখন পূর্ণ—সেই সঙ্গে ইহাও মনে উদিত হইতেছিল, এবারের মত সে সব দিনই গত হইয়াছে।

লীলার কথা শুনিয়া সে বলিল—"আমি যে এখনো কাপড় ছাড়তে যাই নি লিলি! এখন কি করে কারুর সঙ্গে দেখা করবো? কে এসেছেন?"

লীলা ভিতরে আসিয়া বলিল—"চৌধুরী!"

"—চৌধুরী!" বীণার স্বর কাঁপিয়া গেল! "চৌধুরী! এত দিন পরে! কেন লিলি?"

"—তোমায় দেখতে এসেছেন!'

"—ওঃ! না! লিলি! আমি সহ্য করতে পারবো না! ফিরিয়ে দাও তাকে!"

"—কেন? ফিরিয়ে দিতে যাব কেন? আমি ডাকছি তাকে!"

বীণা ব্যাকুল হইয়া বলিল—"না লিলি! লক্ষীটি ভাই! ডেকো না তাকে! ভেবে দেখ—শেষবারে সে আমায় কি রকম দেখে গেছে! এখন এ মুখ আমি কি করে তাকে দেখাব? তা ছাড়া—সে এত দিন এলো না কেন?"

"—সে অসুখে পড়েছিল!" লীলা তাহার উৎসবের দিন মাঠে গাছতলায় পড়িয়া থাকা, ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হওয়ার কথা সব বলিল।

"—সবই আমার দোষ!" বীণা শুনিতে শুনিতে অশ্রুজলে ভাসিয়া

বলিল—"আমি তার সঙ্গে কি অন্যায় ব্যবহার করেছিলুম! সে রাত্রে আমার জন্য সে কি কষ্টই পেয়েছে!"

লীলা বলিল—"এখন সে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে! ডাকি তাকে?"

"—লিলি! লিলি! আমি এ পোড়া-মুখ কি করে তাকে দেখাব?"

লীলা বাহিরে আসিয়া চৌধুরীকে পাঠাইয়া দিল।

"—মানুষ ভালবাসে কি শুধু রূপের জন্য—বীণা? চৌধুরী বীণার একখানি হাত ধরিয়া ধীরে বলিল—তার অন্তরটা কি কিছুই নয়?"

চৌধুরীর গভীর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ লুকাইয়া বীণা কাঁদিয়া বলিল—"কিন্তু তুমি আমায় আর কখনও ভালবাসতে পারবে না—নির্ম্মল!"

"—পারবো না? শুধু তোমার একটু অনুমতি পেলে আমি দেখাব সারাজীবন ধরে—আমি শুধু তোমায় পূজা করতে চাই!"

৪৩

সে-রাত্রে শোবার ঘরে পদার্পণ করিতেই ক্ষান্ত অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলিল—বলি—"হ্যাগা দিদিমণি! পোড়া কোম্পানীর লোক কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে? না চোকের মাথা খেয়েছে? কালে কালে এ-সব কি হতে চল্লো বল দেখি? এর কি কোন দাব নেই? শাসন নেই?"

লীলা সহসা এরূপে আক্রান্ত হওয়ায় ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিল না। বলিল—"আবার কি হলো তোর? চেঁচিয়ে মরছিস কেন?"

"—চেঁচিয়ে মরছি সাধে! শোন তবে বলি—আজ অনেক দিনের পর বাজারে গিয়েছিলুম—কাপড় কিনতে—বামাও আমার সঙ্গে ছিল—সে এখন মিশনে জোছনার থাকে কি-না? ঐ নীলমণি কাপড়ওয়ালা—ও লোকটা ভাল—দোকানদার হলে কি হয়—বয়েসও হয়েছে—ধর্ম্মজ্ঞানও আছে—কখনো ঠকামি করে না—তা আমিও দরকার পড়লে ওর কাছ ছাড়া আর কারু কাছে যাই না। হলো কি আজ—কাপড় কিনে চলে আসছি—বুড়োর ছেলে বেরিয়ে এসে বল্লে—'এই যে ক্ষান্ত মাসি! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। একটা কথা বলবার আছে। তুমি সেটা তোমার মনিবদের কাণে তুলে দিতে পার?' বুড়ো বল্লে—'হ্যাঁ! হ্যাঁ! খুব পারবে! ওকে সব বুঝিয়ে বলে দে তুই! জজসাহেব যেন মনে জানেন যে নীলমণি দাস আর তার ছেলে এসব বেইমানদের দলে নয়; কিন্তু খুব সাবধান! বাইরে যেন কথাটি না যায়—তা হলে এই অন্ধকার রাতে তোমার গলা থেকে মাথাটি বেশ বেমালুম ভাবে খসে পড়বে বাবা! কেউ টেরও পাবে না! আর না হয় ত রাতে আমার ঘরে-দুয়ারে আগুন লাগিবে। আমাদের মত ভালমানুষদের উপরে এ-সব দলের লোকেরা বড় চটা'।"

আমি দেখলুম, তারা বাপ-বেটায় বড় ভয় পেয়েছে—দুজনেই তারা কাঁপছিল। বল্লুম—"ব্যাপার কি? তোমরা এত ঘাবড়ে গেছ কেন?"

তারা বল্লে—"কোম্পানী যদি আর কিছুদিন এমনি চোখ বুজে থাকে, তা হলে তার সর্ব্বনাশ হবার আর দেরি নেই। এই যুদ্ধের সময় চারদিকে নানা গোলমাল—এই সময় কতকগুলো বদ লোকে মিলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা না কি সব গোরাব্যারাকে গিয়ে দেশি ফৌজদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে—তাদের

যে দিন ঠিক হবে—সেদিন তারা সব দল বেঁধে বেরিয়ে পড়বে, আর তাদের বেরিয়ে পড়ার খবর পেলেই দেশি ফৌজরা সব হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে—ব্যস্! কাটাকাটি মারামারি—যত সাহেব মেম—আর কোম্পানীর নুন খায় যে-সব লোক—সব কচুকাটা করবে একেবারে। দেশের লোকও বাদ যাবে না দিদিমণি! এ কি সব্বনেশে কথা গো দিদিমণি! শুনে পয্যন্ত গা হাত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে! সাহেব ত বাড়ী নেই—কি হবে?"

লীলা কথাটা বিশ্বাস করিল না। তবু বলিল—"পুলিশ কি করছে? তারা কি এ-সব খবর রাখে না কিছু?"

ক্ষান্ত হাত-মুখ নাড়িয়া বলিল—"আহা! পুলিশের কথা আর বলো না কিছু! তারা দিব্বি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তারা গরিব লোকের যম—বড়লোকের কাছে পয়সা খায়—আর চোখ বুজে থাকে খামকাই মুখপোড়ারা পাগড়ী বেঁধে বেঁধে রাস্তায় ঘুরে মরছে! ওদের দিয়ে কখনো কোন কাজ হয়? এই যে সব তলে তলে সলা-পরামর্শ চলছে—ওরা কি জানে না কিছু? সব জানে! মুখবন্ধ করে থাকবার ওষুধ দেওয়া হয়েছে—কথা কয় কি করে?"

মিঃ রায় তখন পাটনায় ছিলেন না। লীলা ভাবিল—হয় ত মন্দ লোকের উত্তেজনায় এখানে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে পারে—এখন কি করা যায়!

অরুণকে কথাটা বলিতে সে ইতস্ততঃ করিল না। বলিল—"দেশে যখন একদল লোকের মনে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, আর নানা স্থানে অনেক রকম গোলমাল চলছে, তখন কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়, আমি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডুরাণ্টকে এ-বিষয় জিজ্ঞাসা করে দেখবো।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে লীলা সন্ধ্যার সময় তাহার ঘরে একখানা উপন্যাস পড়িতেছে—সেই সময় কে আসিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল। লীলা চাহিয়া দেখিল—সে জোছনার দাসী বামা। তাহার মুখ ভয় ও উদ্বেগে বিবর্ণ—ছুটিয়া আসার উত্তেজনায় সে তখন হাঁফাইতেছিল।

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া লীলা বিস্মিতভাবে বলিল—"এ কি? তুমি যে এমন সময়ে? খবর কি?"

বামা সরিয়া আসিয়া বলিল—"খবর বড় ভয়ানক গো দিদিমণি! মেমসাহেব তো এখানে নেই—এলাহাবাদে গেছেন কি কাজে—ফিরতে দু'দিন দেরী হবে, তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম—যে কথা শুনেছি—গা আমার কাঁপছে! জিব যেন টানছে! কাল স্থয্যি ওঠবার আগে কি কাণ্ডই হবে—না জানি। একেবারে সব্বনেশে—।"

লীলা চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি হয়েছে, আগে সেইটেই বল্ না—অন্য কথা পরে হবে।"

—"হলো কি! এই সন্ধ্যেবেলা কাজকম্ম সেরে পানের দোক্তা কিনতে বেরিয়েছিলুম—দোকাটা হলো গিয়ে—নীলমণি কাপড়ওয়ালার দোকানের কাছে—দোক্তা নিয়ে ফিরছি, মনে করলুম কাছেই সইয়ের ঘর—একবার তার খবরটা অমনি নিয়ে যাই—দোকানের পাশের সরু গলি দিয়ে তাই যাচ্ছি—চুনী আহিরের গোয়াল-ঘরগুলোর কাছাকাছি একটা পোড়ো বাড়ীর ভিতর থেকে লোকের গলার আওয়াজ পেলুম—কারা যেন চুপি চুপি কি সব বলাবলি করছে—সন্ধ্যেবেলা এমন তো কতলোক এক সঙ্গে জুটে জটল্লা করে—কিন্তু তারা তো এমন ফিস্‌ফাস্ করে না—তাই মনটা একটু সেদিকে গেল—দু'একটা কথা যা শুনলুম তাতে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল—ফৌজ—পল্টন—গোরাবারিক—

কাটাকাটি—লুট—এই সব কথা। মুখে মুখে পাঁচ কথা আগে শুনেছিলুম—তাই তাদের ছাড়া ছাড়া কথা থেকে বুঝলুম আজ রাতে এখানে একটা খুনোখুনি কাণ্ড হবে—একজন বলছিল, পল্টন যদি সময়ে যোগ দেয় তা হলে একেবারে রক্তে রক্তগঙ্গা!"

লীলা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—"তুমি এ-সব কি বোলছো বামা? আজ রাত্রে এই সব কাণ্ড হবে? এ কি কখনো সম্ভব হতে পারে?"

বামা বলিল—"কাল যদি কথা বলবার জন্য বেঁচে থাক দিদিমণি তা হলে এ-সব কথা সত্যি কি না, তখন জিজ্ঞাসা করো! আজ আর ভাববার সময় নেই! পার তো কোন উপায় কর!"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল—"আর কি শুনলে?"

বামা বলিল—"তাদের সব কথা তো শুনতে পাইনি—সব ছাড়া-ছাড়া কথা। একজন বলছিল—আজ রাতে নাকি বোমা ফাটিয়ে একটা আওয়াজ করা হবে। সেই শব্দ শুনলেই এদের দল বেরিয়ে পড়বে—দিশি ফৌজরা পর্য্যন্ত! তারপর যেখানে যত সাহেব-মেম আছে, আর সব যত সরকারী লোকজন—সব একধার থেকে কচুকাটা করে ফেলবে! আমি ত সেই কথা শুনেই ছুটে ছুটে তোমার কাছে আসছি। পড়ি কি মরি—জ্ঞান নেই। পা টন্ টন্ করছে—দম বন্ধ হয়ে আসছে—তবু থামিনি! কি হবে দিদিমণি?"

লীলা উদ্বেগ ও আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া স্তব্ধনেত্রে চাহিয়া ছিল! বামার ভীত শঙ্কিত মুখ ও সর্ব্বাঙ্গের কম্পন তাহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছিল।

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া লীলা বামাকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করিল। সন্ধ্যা কখন্ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কখন্ যে হত্যাকাণ্ড ঘটিবে—তাহার সময় অজ্ঞাত! বামা সেই সাঙ্কেতিক শব্দ কখন হইবে, তাহা কিছুই শোনে নাই! কিন্তু আর ত বিলম্ব করা চলে না! লীলা ভাবিতে ভাবিতে অরুণের সন্ধানে গেল।

অরুণ নিজের ঘরে বসিয়া একমনে লিখিতেছিল। লীলা ডাকিতে বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছিল! চোখের দৃষ্টিও যেন নিস্তেজ ও পরিশ্রান্ত!

লীলা বলিল—"তুমি বড় বেশি পরিশ্রম করছো অরুণ! কিছু অসুখ বোধ করছো না ত?"

"—মাথাটা একটু ধরেছে! তা হলেও আমি এখনো এক ঘণ্টা খাটতে পারি!"

"—তা হোক! তোমার চোখের চেয়ে কিছু আর বই বেশি দামি নয়। এখন ও-সব-রেখে দাও! আমি তোমার কাছে একটা কাজের জন্য এসেছি! বাবা বাড়ী নেই—আমি যে-সব কথা শুনলুম, তাতে তোমাকে আর একবার মিঃ ডুরাণ্টের কাছে যেতে হবে!"

অরুণ সব কথা স্থিরভাবে শুনিয়া তাহার ঘোড়া সাজাইয়া আনিতে আদেশ দিল। তাহার চোখের তারায় যন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু এ অনিশ্চিত উদ্বেগ ও আশঙ্কা হইতে মুক্তি চাই—লীলাকে আশ্বাস দিয়া সে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

লীলা বলিল—"তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে—না হয় তুমি বাড়ীতেই থাক—আমিই গিয়ে দেখি—কি করতে পারি?"

অরুণ বলিল—"পাগল! তুমি এই গোলমালের মধ্যে কোথায়

যাবে? আমি সর্ব্বপ্রথমে ক্যান্টনমেণ্টে যেতে চাই! সেদিন মেজর স্মিথ্ বলছিলেন—এক দল সিপাহী অবাধ্যতা আরম্ভ করেছে! এ-সব বাজে কথা নয় লীলা! ভাগ্যে সময়ে খবর পাওয়া গেল! হয় ত সত্যিই কিছু ঘটা অসম্ভব না হতে পারে।"

অরুণের ঘোড়া সাজাইয়া আনিলে লীলা বলিল—"তুমি কিন্তু বেশি দেরি করো না! আমার একলা থাকতে বড় ভয় হচ্ছে!"

অরুণ বলিল—"ভয় কি? আমি ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে ফিরে আসছি, তুমি মাকে বা বীণাকে যেন এ-সব কথা কিছু বলো না! কথা পাঁচ কাণ হলেই ছড়িয়ে পড়ে! সাবধানে থেকো, যতক্ষণ না ফিরি!"

অরুণ চলিয়া গেলে লীলা তাহার কুকুরকে লইয়া বারাণ্ডায় খেলা করিতে লাগিল—যেন কিছু হয় নাই এই ভাবে!

কিন্তু মনশ্চক্ষে সে দেখিতে লাগিল—যেন দলের পর দল লোক ভীষণ ভাবে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। চারিদিকে লুট—হত্যা—আর্ত্তনাদ—চীৎকার!

ভয়ে তাহার কণ্ঠ-তালু শুকাইয়া গেল! অরুণ যদি অকৃতকার্য্য হয়? যদি সে খবর দিবার আগেই বিদ্রোহীরা বাহির হইয়া পড়ে? কুকুরটা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখে একটা টেনিস বল। সে সেই বল লইয়া লীলার সঙ্গে খেলিতেছিল!

কিন্তু লীলার হৃদয় ক্রমে অবসন্ন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছিল। সে বলিল—"আজ আর খেলা হবে না জিমি! ভাল লাগচে না কিছু! বল্‌টা তুলে রেখে এসো!"

রাত বাড়িতে লাগিল, অরুণ ফিরিল না—রাত্রের আহারের সময়

হইয়া গেল, তবু সে আসিল না, বা কোন খবর পাঠাইল না। লীলা বুঝিল—ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইয়াছে!

মিসেস্ রায় ভাবিলেন, অরুণ তাহার কোন বন্ধুগৃহে গিয়াছে। বীণা সমস্ত দিন চৌধুরীর সঙ্গে কাটাইয়া বড় সুখে ছিল,—সেও অরুণের কোন খবর করিল না। চৌধুরীর ভালবাসায় তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহার নষ্ট সৌন্দর্য্যের জন্যও আর তাহার বিশেষ দুঃখ ছিল না। এত দিন পরে সে নিজেও ভালবাসিতে শিখিতেছিল, সেই প্রেমের আভাষে তাহার অন্তর সর্ব্বদা আনন্দে পূর্ণ হইয়া থাকিত।

রাত্রের আহার শেষ হইল। লীলা বীণার সঙ্গে গল্প করিয়া অন্যমনা হইবার অনেক চেষ্টা করিল,—কিন্তু কিছুতেই মনের উদ্বেগ গেল না—এখনও পর্য্যন্ত অরুণের দেখা নাই—লীলা নিজের ঘরে যাইতেছে এমন সময় তাহার সহিস আসিয়া তাহাকে ডাকিল।

লীলা বারাণ্ডায় আসিয়া দেখিল, সহিস ভয়ে ও উদ্বেগে মৃতপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

সে অবাক্ হইয়া বলিল—„কি হয়েছে বংশীরাম ?„

—"মিস্ বাবা! আমার ভাই বসন্তপুর থেকে একটা ভয়ানক খবর নিয়ে এসেছে!

লীলা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—"কি হয়েছে শীঘ্র বল!"

—"কি বোলবো হুজুর! আজ রাতে সেখানে একটা খুনোখুনী কাণ্ড হবে! সাহেব কিছুই জানেন না, জানবারও উপায় নেই। তিনি এখনো বাড়ী ফেরেন নি। কি হবে এখন ?"

তখন রাত্রি দশটা। মিসেস্ রায় তাঁহার শোবার ঘরে গিয়াছেন। লীলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! আজ এ-সব কি কাণ্ড ঘটিতে

চলিয়াছে ? সে জানিত, কিরণ সহর হইতে তিন মাইল দূরে নিরাপদে আছে। সে নিশ্চয় সময় মত খবর পাইয়া নিজেকে বাঁচাইবার উপায় করিতে পারিবে। কিন্তু এখন বিপদ তাহারই সম্মুখে !

সে কিরণের সহিসকে বলিল—"কি হয়েছে সব বুঝিয়ে বল !" বাড়ীর যত আরদালী চাপরাশী ভৃত্যবর্গ যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিয়া সেইখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

সহিস রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল—"সাহেবের জমিদারীর ভিতর একটা গ্রাম যত সব বদমাইস প্রজায় ভরা। প্রায়ই গোলমাল বাধাত। তাদের গ্রামে একটা পচা পুকুর ছিল। তার জল খেয়ে সবাই অসুখ হয়ে মরে যেত, সাহেব তাই পুকুরটা বুজিয়ে দিয়ে দুটো ইঁদারা কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই তাদের রাগ। তা ছাড়া তাঁর বাগানের মধ্য দিয়ে একটা সরু রাস্তা ছিল, গ্রামের দিকে বর্ষায় বড় কষ্ট হত যাওয়া-আসার পক্ষে। সাহেব সে রাস্তা বন্ধ করে একটা পাকা বড় রাস্তা করে দিয়েছেন। সে রাস্তা তৈরি করতে যাদের জায়গা নেওয়া হয়েছিল, সবাই সাহেবের কাছে উচিত মত দাম পেয়েছে। তবু তারা সাহেবের উপর চটে আছে। তাদের না কি সাতপুরুষের ভিটে ও জমির উপর দিয়ে সাহেব রাস্তা তৈরি করেছেন। জনকতক বদমাস লোক এই স্থযোগে লুটপাট করবে বলে কেবলি তাদের সাহেবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিল। আজ তারা খবর পেয়েছে বসন্তপুর আর চারপাশের সব গ্রামে যত পুলিশ ছিল, সব সহরে চলে এসেছে। এখানে না কি আজ রাত্রে একটা দাঙ্গা হবে! সেই জন্য সব পুলিশ এসে সহরে জড় হয়েছে। তারা তাই আজকার স্থযোগে সাহেবকে খুন করে বাংলা লুট করবে, স্থির করেছে। এ হপ্তায় অনেক খাজনার টাকা আদায় হয়েছে। সে সব এখনো বাংলাতেই আছে, তাও তারা খবর রেখেছে !"

লীলা বলিল—"তুমি এত কথা কি করে জানলে? আর এসব যে বাজার-গুজব, বাজে কথা নয়, তাই বা বুঝবো কি করে?"

সহিস বলিল—"এ-সব সত্যি, মিস বাবা! আমি নিজের কাণে শুনেছি। আমি গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম। তারা এক জায়গায় জটলা করে এই সব বলাবলি করছিল! সাহেব যদি এখানে থাকেন—তাই আমি ছুটে এখানেই চলে এসেছি! তিনি ত এখানে নেই—আর কোথায় তবে খুঁজবো?"

গোলমাল শুনিয়া মিসেস্ রায় বাহিরে আসিলেন। বারাণ্ডায় এত লোকজনের ভিড় দেখিয়া বলিলেন—"কি হচ্ছে এখানে? ব্যাপার কি?"

একজন চাপরাসী তাঁহাকে ঘটনাটা বুঝাইতে লাগিল। লীলা ততক্ষণ চাকরদের মধ্যে সবাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেহ ঘোড়ায় চড়িতে জানে কি না?" কিন্তু কেহই জানিত না।

লীলা আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিল। এখন সাড়ে দশটা বাজিয়াছে। এতক্ষণে কিরণ নিশ্চয় বাড়ী ফিরিয়া আহারাদি সারিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে। এখন যদি কেহ তাহাকে গিয়া খবরটা দিয়া সাবধান করিয়া দেয়, তবেই রক্ষা! নয় ত সে বিঘোরে বিদ্রোহীদের হাতে মারা যাইবে! কিন্তু এক অশ্বারোহী ছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে কে তাহাকে খবরই বা দিতে পারে?

মিসেস্ রায় বলিলেন—"এ লোকটা বলে কি লীলা? মিউটিনি হবে এখানে?"

লীলা বলিল—"ভয় পেয়ো না। এই রকম একটা খবর পেয়ে অরুণ সন্ধ্যা থেকে ক্যাণ্টনমেণ্টে আর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে গিয়েছে! এখানে যা হত, তা বোধ হয় বন্ধ করা যাবে, কারণ,

পুলিশ হয়ত আগেই খবর পেয়েছে! আমাদের বিপদ বোধ হয় কেটে গেল, কিন্তু কিরণের কি হবে? সে ত কিছুই জানে না, হয় ত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবে—আর এই সব বদমাইসের হাতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার আগেই খুন হবে! তার কাছে একজনের এখনি খবর দিতে যাওয়া দরকার!"

"—গোপাল সিংকে একখানা চিঠি লিখে দিয়ে এখনি তার কাছে পাঠিয়ে দাও! কি ভয়ানক কাণ্ড! তোমার বাবা এ সময় বাড়ী নেই,—এই সময়ে চারিদিকে এত গোলমাল! আমায় আগে বল নি কেন?"

লীলা এ প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া বলিল—"গোপাল সিং হেঁটে যেতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে! এখনি ত রাত এগারোটা বাজে!"

"—তা কি করা যাবে! আমি ত এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পাই না! তুমি ভেবেই বা আর করছো কি?"

লীলা অধীর হইয়া বারাণ্ডায় ঘুরিতে লাগিল! কি করা যায়—কিরূপে তাহাকে একটু খবর দিতে পারা যায়! অরুণ যদি বাড়ী থাকিত, সে ঘোড়া ছুটাইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে বলিয়া আসিতে পারিত। কিন্তু অরুণ যদি পারে, ত সেই-বা পারিবে না কেন? তাহার যাওয়া এতই কি অসম্ভব?

মিসেস্ রায় বলিলেন—"তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে কি করবে? এটা অবশ্য বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা—তবে সে নিশ্চয়ই বুঝবে, আমাদের এক্ষেত্রে কিছু করবার উপায় ছিল না!"

"—সে বুঝবে কি? এতক্ষণ সে হয় ত খুন হয়ে গেল! হয় ত তার বিছানার ধারে ডাকাতরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে! সে হয় ত প্রাণের দায়ে ঝটাপটি করছে!" লীলা শিহরিয়া উঠিল!

"—তা তুমিই বা কি করতে পার—এক গোপাল সিংকে পাঠান ছাড়া ?"

"—ওঃ! অসহ্য! কিরণ সেখানে খুন হবে, আর আমি এখানে বসে বসে তাই শুনবো! সহিস! আমার ঘোড়া আন! আমি তার কাছে যাব!"

মিসেস্ রায় অবাক্ হইয়া বলিলেন—"তুই কি সত্যি পাগল হলি লীলা!"

"—না! মা! এখনো হই নি! তবে আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে হয় ত পাগল হয়ে যাব! আমার প্রাণ কি করছে, সে তুমি বুঝবে না! সহিস! জল্‌দি! আমার ঘোড়া এখনই নিয়ে এসো!"

মিসেস্ রায় প্রভুত্বসূচক স্বরে বলিলেন—"সহিস! মিস্ বাবার এ হুকুম তুমি কখনো শুনবে না! সাহেব ফিরলে এ জন্য তোমায় জবাবদিহী করতে হবে—মনে থাকে যেন!"

গোলমাল শুনিয়া বীণা বাহিরে আসিয়াছিল, সব কথা শুনিয়া সেও লীলার যাইবার পক্ষে বাধা দিতে লাগিল।

লীলা কোন দিকে না চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমি যাবই! বংশীরাম, তুমি যদি আমার ঘোড়া না নিয়ে এস, আমি নিজেই গিয়ে আনবো! আমার বাবার কাছে আমার কাজের জবাবদিহী করবার ভার আমারই! তোমাদের কারো নয়!"

বীণা কাঁদিয়া বলিল—"লিলি! লিলি! তুই এ কি করতে যাচ্ছিস ভাই?" লীলা শুনিল না। সে ঘরে গিয়া ক্লোক গায়ে দিল ও আস্তাবলের দিকে চলিয়া গেল।

মিসেস রায় তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভৃত্যদের আদেশ দিতেছিলেন, কিন্তু কেহ নড়িতে সাহস করিল না। লীলা যাহা

ধরিবে, তাহা করিবেই, কেহ বাধা দিলে তাহাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়া শাসন করিতেও ইতস্ততঃ করিবে না—তাহারা সে-কথা বিশেষ রূপেই জানিত।

অগত্যা মিসেস্ রায়, লীলা ফিরিয়া আসিলে তাহার কি কি শাস্তির ব্যবস্থা হইবে, তাহাই বলিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শেষে সে সত্যই চলিয়া যায় দেখিয়া আসন্ন মূর্চ্ছাকে স্থগিত রাখিতে স্মেলিংসল্টের শিশি নাকে দিলেন। বীণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"অরুণ গেল কোথা ? সে থাকলে ত এমন কাণ্ড হতে পারতো না। সত্যিই যদি তারা কিরণকে আক্রমণ করে থাকে, ও সেখানে কি করতে যাচ্ছে বল দেখি ? লোকে বলবে কি ওকে ?"

লোকে কি বলিবে সে-দিকে মন না দিয়া বীণা কাঁদিতে কাঁদিতে লীলার পিছনে পিছনে চলিল।

লীলা ঘোড়ায় উঠিবার আগে তাহার কাছে আসিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"কেঁদো না! আমি খুব সাবধানে থাকবো! হয় ত কিরণকে নিয়ে ফিরে আসতেও পারি! অরুণ এলে তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলো—আমি যেতুম না—কিন্তু কিরণ এমন বিপদের মুখে—এ জেনেও বাড়ী বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব! তাই যাচ্ছি! মাকে দেখো! সাবধানে থেকো! আসি তবে ?" পর মুহূর্ত্তেই সে লাফাইয়া ঘোড়ায় উঠিল ও গেটের বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৪৪

সেই গভীর নিশীথের ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া লীলা উল্কার মত তীব্র গতিতে ছুটিতেছিল। যাহাকে সে ভালবাসে, তাহার

জীবন আজ প্রচ্ছন্ন বিপদের করাল ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। আজ আর তাহার অন্য কিছু ভাবিবার বা নিজের বিষয় চিন্তা করিবার সময় নাই। যেমন করিয়াই হোক্—এখনি তাহার সেখানে গিয়া পৌছিতেই হইবে! জোরে! আরও জোরে! লীলা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে! থাকিয়া থাকিয়া ঘোড়ার খুরে আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে; নির্জ্জন প্রান্তরের বুকের মধ্য দিয়া কেবল শব্দ উঠিতেছে—খটাখট্! খটাখট্!

তাহার গমন-পথ ষ্টেশনের সম্মুখের রাস্তার মধ্য দিয়া প্রসারিত। বড় রাস্তার আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল। গ্রাম্য পথের গলি ও সরু রাস্তাগুলি আঁধারে ভরা,—বেড়া বা ঝোপঝাড়ের মধ্য পুঞ্জীকৃত অন্ধকার জমাট বাঁধা। চারিদিক গভীর অমঙ্গলসূচক নীরবতায় পূর্ণ; মাথার উপর আকাশে তারাগুলি কুয়াসার আবরণের মধ্যে দিয়া নিষ্প্রভ ভাবে পথের উপর ম্লান আলো ছড়াইতেছিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে বড় বড় বৃক্ষগুলি যেন নিশ্চল প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া মানুষের সমস্ত সুখ দুঃখ—সব ঘটনা অত্যন্ত উদাসীন ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছিল। কখনও কোন পরিচিত শব্দে সে-স্থানের গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, স্থানে স্থানে গ্রামবাসীদের ঢোলের শব্দ ও তার সঙ্গে গান বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। কখনও বা একটা শৃগাল রব তুলিবার পর দলবদ্ধ শৃগালের একটা সম্মিলিত ডাক শোনা যাইতেছিল। অসংখ্য কীট-পতঙ্গের দল, পাখীদের নিশ্চিন্ত আরামে বাধা দিয়া গাছের শাখায় শাখায় সশব্দে উড়িতেছিল।

লীলা মাঠের ঠিক মধ্য দিয়া তাহার গতি স্থির রাখিয়া ছুটিতেছিল, ও মাঝে মাঝে পশ্চাতে বাজারের দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিয়া দেখিতেছিল। আজকার রাত্রের প্রত্যেক শব্দটিই আশঙ্কাজনক। তাহার ভয় হইতেছিল কখন্ হয় ত বা সে সেই বিদ্রোহীদের সম্মুখীন

হইয়া পড়ে! তাহারা ত প্রস্তুত হইয়া শুধু সাঙ্কেতিক শব্দটির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কখন্ সে শব্দ হইবে কে জানে!

শুষ্ক পাতার মর্মর্ শব্দে, হাওয়ার সন্ সন্ শব্দেও সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তবু নিজের এই বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিরণের চিন্তা সর্ব্বক্ষণ তাহার মনে জাগিতেছিল। হয় ত সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া আছে! হয় ত সে তাহার চারিদিকে কাপুরুষ হত্যাকারীদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া জাগিয়া উঠিবে! উঃ! অসহ্য! চিন্তার অতীত! কিরণ! কিরণ! লীলা আরও বেগে ছুটিল!

অবশেষে কিরণের অট্টালিকা তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। লীলা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! এখনো চারিদিক শান্ত ও নীরব —হয় ত এখনো তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের দেরি আছে।

অন্ধকারের ভিতর দিয়া বাগানের উচ্চ বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন বাংলার শুভ্র ছাত আকাশের দিকে উঠিয়াছে। ফটক ভেজান ছিল। হয় ত কিরণের লোকজনেরা এখন সকলেই নিদ্রামগ্ন—বাড়ীখানি একেবারে নিস্তব্ধ—কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছিল না। শুধু ফটকের আলো ছাড়া আর সব আলো নিবিয়া গিয়াছে। এখনও চতুর্দ্দিক শান্ত দেখিয়া লীলা বুঝিল—এখানকার বিদ্রোহীরা সহরের লোকদের সঙ্গে সময়ের স্থিরতা রাখিয়া কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছে।

লীলা ঘোড়া হইতে নামিয়া দেখিল, গভীর উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে! সে ঘোড়ার রাশ ধরিয়া অগ্রসর হইতেই যেন দূর হইতে বহুলোকের মিলিত উচ্চ চীৎকার-শব্দ তাহার কাণে আসিল। কিন্তু সে একটু স্থির থাকিতেই তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল। কল্পনায় অনেক সময় মিথ্যা বস্তুও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়।

*　　*　　*　　*　　*

ড্রয়িংরুমে তখনো আলো জ্বলিতেছিল। কিরণ তখনো শুইতে যায় নাই। কিছুক্ষণ আগে সে বাড়ী ফিরিয়াছে।

লীলা কম্পিতবক্ষে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই উৎসবের দিনের পর হইতে আর সে সাহস করিয়া কিরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। কিন্তু সে-দিন কিরণ তাহার মনে যে সংশয় জন্মাইয়া দিয়াছিল, সে-কথা একবারও সে ভুলিতে পারে নাই। তাহার ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত সময়ে সময়ে অত্যন্ত ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিত —সত্যই সে নির্দ্দোষ নিরীহ অরুণকে এতদিন ধরিয়া কি প্রবঞ্চনা করিয়া আসিতেছে!

কিরণের ঘরে প্রবেশ করিয়া সহজভাবে সব কথা বলিবার সাহস তাহার ছিল না। সঙ্কোচ ও কুণ্ঠায় সে মরিয়া যাইতেছিল। যখন সে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছিল, তখন এ-সব চিন্তা তাহার মনে ও[illegible] নাই; কিন্তু কিরণকে সুস্থ ও নিরাপদ দেখিয়া তাহার পা কাঁ[illegible]তে লাগিল। তাহার সমস্ত সংযম শিথিল হইয়া আসিল।

একটা চাকর চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিয়া তাহার ঘোড়া ধরিল। জজ সাহেবের কন্যাকে এত রাত্রে একা দেখিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

লীলা অত্যন্ত লজ্জিত মুখে বলিল,—"সাহেব বাড়ীতে আছেন?" তাহার আর উত্তর দিতে হইল না। লীলার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া কিরণ নিজেই, কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য বাহিরে আসিল।

"কিরণ!" লীলার সুমিষ্ট স্বর বাতাসে বাজিয়া উঠিল!

পর মুহূর্ত্তেই কিরণ তাহার পাশে!—ঘোর বিস্ময়ে স্তব্ধ ও মূক হইয়া সে দেখিল—অতিথি আর কেহ নয়—সেই লীলা—যে এক

মুহূর্ত্তও তাহার চিন্তা হইতে অপসৃত হয় না! সে শুধু বলিল—"তুমি!"

লীলা তাহাকে তাহার এত রাত্রে আসিবার কারণ বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিরণ সে সময় বুঝি আর কিছু বুঝিতে পারিল না। সে শুধু বুঝিল—লীলা তাহার কাছে আসিয়াছে! কিন্তু কেন? এই গভীর নিদ্রাভরা রজনী! যখন সমস্ত লোক যে-যাহার ঘরে সুপ্তিমগ্ন—সেই নির্জ্জন নিশীথে ঘোড়া ছুটাইয়া লীলা তাহার কাছে কিসের জন্য আসিয়াছে? অকস্মাৎ এমন কি অঘটন কাণ্ড ঘটিয়া গেল?

"—ব্যাপার কি লিলি?"

লীলা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল,—"কিরণ! শোন! আমি বিশেষ দরকারে পড়ে তোমার কাছে এসেছি!"

"—তোমার দরকার এখন থাক্! ঘরে চল আগে ঠাণ্ডা থেকে?" কিরণ তাহার হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া জোর করিয়া চেয়ারে বসাইল!

লীলা বলিল—"কিরণ! তুমি কি কিছুই শোন নি? তোমার প্রজারা দল বেঁধে আজ এখানে এসে তোমার বাংলা লুঠ করবে! চুপ করে শোন! একটা গোলমাল শুনছো না কি?"

কিরণ উদাসীনভাবে এ-সব কথা শুনিল। তখনো তাহার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি লীলার মুখেই নিবদ্ধ! বলিল—"কে বলেছে তোমায় এ-সব কথা?"

লীলা আবার সব কথা গুছাইয়া বলিল। কিন্তু কিরণের কোন আগ্রহ দেখা গেল না। তাহার মনে তখন অন্য চিন্তা জাগিতেছিল। শুধু এইটুকু? এই সংবাদটুকু দিবার জন্যই সে এত রাত্রে এমন ভাবে ছুটিয়া আসিয়াছে?

লীলা তাহাকে ঠেলা দিয়া সচেতন করিয়া আবার সব বলিয়া বলিল—"তুমি কিছু শুনছো না কিরণ! এখনকার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত মূল্যবান! এমন করে সময় নষ্ট করো না! একটা কিছু উপায় কর!"

কিরণ তখন বলিল—"আমি এ-কথা বিশ্বাস করতে পারি না! এমন কি করেছি আমি—যে তারা আমায় খুন করবে? আর তুমি—এই রাত্রে একা এই কথা বলতে এত দূরে এসেছ? বাড়ীতে আর কেউ ছিল না? অরুণ কোথায়?"

লীলা তখন সেখানকার অবস্থা একে একে সব বর্ণনা করিল।

কিরণ সব শুনিয়া বলিল—"তুমি এত পথ এই বিপদের মুখে আমায় সাবধান করে দিতে ছুটে এসেছ? তোমার ভয় হয়নি? যদি তাদের সামনে পড়ে যেতে?"

লীলা দারুণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল! কিরণের চোখে তখন যে আগুন জলিতেছিল, লীলা আর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না!

বিপদ সম্মুখে আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিরণ সেদিকে মনোযোগ দিল না। লীলা যে অরুণের বাগ্‌দত্তা—তাহা সে ভুলিয়া গেল। ভালবাসার অধিকারে লীলা তাহারই নয় কি? আজিকার রাত্রি এ-ভাবে তাহার কাছে আসার পর আর এ-সম্বন্ধে কি কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে? অরুণের এখন নিশ্চয়ই লীলাকে তাহার হাতে ফিরাইয়া দিতে হইবে। সে জানুক—লীলার প্রেম তাহার জন্য নয়। আজিকার রাত্রের পরে লীলা আর সে পুরানো জীবনে ফিরিয়া যাইতে পারে না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া লীলা অধীর হইয়া উঠিল! সে মিনতি করিয়া বলিল—"একটা কিছু উপায় কর কিরণ! এখন কি অন্য

দিকে মন দেবার সময় ? তারা হঠাৎ এসে পড়লে তখন তুমি কি করবে ?”

কিরণ বলিল—“কিন্তু লীলা ! আজকার এ ঘটনার পরও কি তুমি বলতে চাও যে, তুমি আমার নও—তুমি অরুণের ? তুমি কি শুধু আমায় ভালবাস বলেই এটা কর নি ? আমার সেদিনকার যুক্তি ভেবে দেখো ! তাকে এমন করে প্রতারণা করা ও তোমার-আমার এবং তার জীবন একটুখানি ভুলের জন্য নষ্ট করা উচিত নয় ! আজ রাত্রে আমি একটু পরে মোটরে তোমায় নিয়ে তার কাছে যাব। সব কথা তাকে খুলে বোল্‌বো—কেমন ?”

লীলা অবশ শরীরে চৌকির উপর লুটাইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল ! কিরণের প্রতি দুর্নিবার ভালবাসা আর ত সে মনে মনে চাপিয়া রাখিতে পারে না ! যা হবার হোক্ ! একজনের উপর এমন হৃদয়-ভরা প্রেম বুকে লইয়া কেমন করিয়াই বা সে অন্যের পত্নী হইবে ? এ দ্বন্দ্বে তাহারই পরাজয় ! আর সে যুঝিতে পারে না !

কিরণ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল ! বহুক্ষণ লীলাকে নির্ব্বাক্ অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে বসিল, ও তাহার হাত ধরিয়া চুপি-চুপি বলিল—“তা হলে আমারই কথা ঠিক ত লিলি ?”

সহসা দূরে বহুলোকের সম্মিলিত কণ্ঠের ভীষণ চীৎকার শোনা গেল ! লীলা সেই শব্দে ক্ষিপ্তের মত লাফাইয়া উঠিল ! ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল ! সে বলিল—“ঐ ! ঐ তারা আসছে ! তারা এখনি তোমাকে খুন করে ফেলবে ! কি হবে—কি হবে এখন ?”

কিরণের কুকুর উচ্চরবে ডাকিয়া উঠিল ! কিরণ উঠিয়া চৌকিদারকে ডাকিল ; কিন্তু তখন সে ফটকের দিকে দৌড়াইতেছে !

গেটের কাছে চাকরেরা সব জড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোলমালে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহারা বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছে।

ক্ষণেক পরেই তাহারা বিষম আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিল; বলিল—অনেক লোক মশাল ও লাঠি সড়কী লইয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে এদিকে আসিতেছে!

কুকুরটা বিকট চীৎকার করিতে করিতে ফটকের দিকে ছুটিয়া গেল! চৌকিদার বলিল—"এ-সব ভাল লক্ষণ নয়! লুট আর দাঙ্গা ছাড়া এদের আর কি মতলব হতে পারে?"

একজন সহিস উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"সাহেব! সাহেব! আমরা সকলেই মারা যাবো! অনেক লোক—সে গোণা যায় না—অসংখ্য লোক লাঠি নিয়ে আমাদের বাংলার দিকে আসছে! এ গাঁয়ের পুলিশ সব আজ সহরে চলে গেছে! কি হবে?"

কিরণ সর্ব্বপ্রথম ঘোড়াদের আস্তাবল হইতে সরাইয়া দূরে বাঁধন খুলিয়া রাখিতে বলিল—"যদি দরকার হয়, তবে যেন তাহারা পলাইতে পারে।"

তাহার পর সে লীলাকে বলিল—"তুমি এখনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাও! বাগানের পিছন দিয়ে একটা গুপ্ত পথ আছে, আমি সেই পথ দিয়ে তোমায় কতকটা এগিয়ে দিয়ে আসি! সে-দিক দিয়ে গেলে খুব শীঘ্র বাড়ী পৌছতে পারবে! ওঠো! দেরি করো না!"

লীলা দৃঢ়ভাবে বলিল—"না! তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও, তবে আমি কখনো যাব না! তোমার এখানে থাকা মানে ত খুন হওয়া!"

"—আমি কি করে যাব লীলা? আমার বাড়ী-ঘর সম্পত্তি এদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে ত! তা ছাড়া আমার আশ্রিত এতগুলো লোক—এদের বাঁচাবার ও নিরাপদে রাখবার ভারও ত আমারই।

এদের মৃত্যুমুখে ফেলে আমি কি নিজের প্রাণ নিয়ে পালাতে পারি? তুমি চলো, আমি তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে, তার পর ফিরে এসে এই বদ্‌মাইস্‌দের সঙ্গে যুদ্ধ করবো!”

লীলা চাহিয়া দেখিল, কিরণের সেই পূর্ব্বের সাহস, শক্তি ও সেই অবিচলিত দৃঢ়তা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে! এ সেই—তাহার চিরদিনের বন্ধু, সখা, প্রিয়—সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার—ধৈর্য্যে শক্তিতে বীরত্বে অতুলনীয়—একমাত্র তাহার—তাহারই কিরণ! এর সঙ্গে মরিতেও কি সুখ, কি তৃপ্তি, কি আনন্দ! লীলা সেই মুহূর্ত্তে আর সব ভুলিয়া গেল! অরুণের কথা—তাহার দুর্ব্বলতা—সে যে লীলা ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না—সে সব আর তাহার মনে রহিল না; বর্ত্তমান অতীতকে ডুবাইয়া দিল। সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সব বিপদের অংশ গ্রহণ করিবে—যদি প্রয়োজন হয় তবে দুজনে এক সঙ্গেই মরিবে।

কিরণ তাহাকে আর একবার বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তখন আর বাদানুবাদের সময় ছিল না। লোকেরা লাফাইয়া বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া মহা উৎসাহে বেড়ার তার কাটিতেছিল।

কিরণ মনে মনে এই চিন্তায় সুখী হইল যে, আজ সে ও লীলা এক সঙ্গে একই নিয়তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! যদি অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতরই দাঁড়ায়, তবে তাহারা দুজনেই একত্র তাহা বরণ করিয়া লইবে।

বাহিরে চীৎকার ক্রমেই বাড়িতেছিল। কিরণের কুকুরের ভীষণ গর্জ্জন এতক্ষণ শোনা যাইতেছিল,—এক সঙ্গে কতকগুলি লাঠির আঘাতে সে চিরদিনের মত নীরব হইয়া গেল!

কিছুদিন হইতে কিরণের বিরুদ্ধে তাহার কতকগুলি প্রজা ষড়যন্ত্র

করিতেছিল। কিরণের অপরাধ—সে তাহাদের ভাঙ্গা অপরিষ্কার কুঁড়ে ভাঙ্গিয়া ব্যারাকের সৃষ্টি করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া, পানা-পড়া পচা পুকুর বুজাইয়া ভাল ভাল কূপের বন্দোবস্ত করিয়া প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের পৈতৃক ভিটায় হাত পড়ায় তাহাদের অসন্তোষ বাড়িতেছিল। কতকগুলি বদমাস্ গুণ্ডা তাহাদের বিরক্তি বুঝিতে পারিয়া লুটের লোভে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া এই ব্যাপার বাধাইয়া তুলিয়াছে!

কিরণ তাহার রিভলভার ও কার্ট্রিজ সাজাইয়া লইল। তাহার পশ্চিমদেশীয় ভৃত্যেরা লাঠি লইয়া প্রত্যেক ঘরের দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইল। আজিকার রাত্রে বাড়ীর এই কয়েক জন ছাড়া সাহায্য করিবার মত আর কেহই ছিল না।

নিজে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভিতরে লীলাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিয়া কিরণ চুপি চুপি বলিল—"তুমি আমার জন্য এ কি ঘোর বিপদে ঝাঁপ দিলে লিলি?"

লীলা শান্তভাবে বলিল—"আমার একলা নিরাপদে থাকার চেয়ে তোমার সঙ্গে বিপদের মুখে থাকা ঢের ভালো!"

কিরণ দরজার বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"শোন সকলে! যে কেউ আমার বারাণ্ডায় পা দেবে, আমি তখনি তাকে গুলি করবো! ভাল চাও, ত—যে-যার ঘরে ফিরে চলে যাও!"

"—ওরে! সাহেব জেগে আছে, জেগে আছে রে! সে কথা বলছে!" ভিড়ের মধ্য হইতে একজন চেঁচাইয়া উঠিল!

অন্য-জন বলিল—"বেরিয়ে এস না! ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কেন? আমরা যে কত কষ্ট করে তোমায় দেখতে এলুম!"

একটা ভীষণ অট্টহাসির রোল উঠিল !

কিরণ লীলাকে আড়াল করিয়া রিভলভার-হাতে বারাণ্ডায় আসিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—"কেন তোমরা এত রাত্রে আমার এখানে গোলমাল করতে এসেছ ! কি চাও তোমরা !"

বহুকণ্ঠ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মাথাটা চাই ! তোমার মাথাটা ! তোমার মাথাটা পেলেই খুসি হয়ে যে-যার ঘরে চলে যেতে পারি !"

কয়েক জন বেগে বারাণ্ডায় উঠিতেছিল, তাহাদের অগ্রবর্ত্তী একটা লোক কিরণের গুলি খাইয়া লুটাইয়া পড়িল !"

একটা ভীষণ স্বর চীৎকার করিয়া উঠিল—"খুন হয়েছে ! খুন ! দাঁড়াও তোমরা ! বাড়ীটা সব ঘিরে ফেল ! মস্ত বড় মন্দ ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে গুলি চালাচ্ছে। ঘের সব। ঘিরে ফেল। দেখি—ফাঁদে পড়ে কি না।"

একটা ভয়ানক কোলাহল ও চীৎকার বাতাসে মিশিয়া গেল।

কিরণ আবার চেঁচাইয়া বলিল—"তোমরা যদি আমায় খুন করতে চাও, তার আগে ঐ লোকটার মত অন্ততঃ পঞ্চাশ জন লোকের আমি প্রাণ নেব। যদি বেশী বাড়াবাড়ি করতে ও মরতে ইচ্ছে না হয়ে থাকে, তা হলে যে-যার ঘরে ফিরে যাও !"

কিরণের কথার শেষাংশ গভীর কোলাহলে ডুবিয়া গেল ! দাঙ্গাকারীরা সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে লাগিল—"এই ! ভগবান দীনু শিকারি কোথায় ? ডাক তাকে ! এই শিকারি ! এদিকে ! তোমার বন্দুক আছে ! গুলি কর সাহেবকে ! শীঘ্র গুলি কর !"

কিরণ দেখিল সত্যই একটা লোক বারাণ্ডার নীচে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিতেছে !

কিরণের অব্যর্থ সন্ধানে তখনি ভগবান্ দীনু চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল ! তাহার পরিত্যক্ত বন্দুক আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিল না।

দলের মধ্য হইতে আবার একজন চেঁচাইয়া উঠিল—"সকলে মিলে ঠেলে উঠে পড় ! যদি দু-একজন জখমও হয়, তবু কেউ গিয়ে ওকে ধরতে পারবে ! টাকা অনেক আছে ! যেমন করে হোক্—ঘরে ঢুকতেই হবে !"

কিন্তু এ-কথায় কেহ রাজি হইল না। কিরণের হাতের লক্ষ্য দেখিয়া আক্রমণকারীরা দমিয়া গিয়াছিল। প্রত্যেকেই ভাবিল, তাহারা গুলি খাইয়া প্রাণ দিবে, আর খাজনার টাকার ভাগ লইবে অন্যে !

বাংলার পিছন মড় মড় করিয়া একটা শব্দ হইল, কিরণ বুঝিল, কাপুরুষের দল সম্মুখ হইতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া পিছন দিক দিয়া আক্রমণ করিয়াছে !

লাঠির ঠকাঠক্ শব্দ ও মাঝে মাঝে চীৎকার এবং আর্ত্তনাদে তাহারা বুঝিল, সেদিকে কিরণের লোকদের সঙ্গে তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে !

লাঠির আঘাতে একটা জানলা ভাঙ্গিয়া পড়িল ! একজন পিয়নের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—"আমি এই হাতে দুজনকে ঘায়েল করেছি ! কে আসতে চায় আর ? আসুক ! গোটাকতক মাথা এখনো বেশ ফাটাতে পারবো !"

গ্রামবাসীরা অনেকে জাগিয়া উঠিয়া এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছিল। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপারের সমালোচনা করিতেছিল। কিরণ যে গোঁয়ারতুমি করিয়াই এই কাণ্ডটি বাধাইয়া তুলিয়াছে, এই তাহাদের চর্চ্চার বিষয় !

বারাণ্ডার নিকট হইতে একটা লোক পিশাচের মত অট্টহাসি

হাসিয়া উঠিল !—"খানিক চুপ করে থাক বাবা ! ঘরের ভেতর থেকে বাছাধনকে বেরোতে হয় কি না দেখাচ্ছি আমি ! মজাটা দেখ সব !" বলিতে বলিতে সে একটা লোকের হাত হইতে জলন্ত মশাল কাড়িয়া লইয়া খোলার চালে আগুন ধরাইয়া দিল !

লোকেরা সহর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল ! আগুনের শিখা জলিতে জলিতে বাংলার ছাত শুদ্ধ ধরিয়া উঠিল দেখিয়া তাহাদের আনন্দ ও উত্তেজনা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল !

কিরণ প্রথমে তাহাদের এই অতিমাত্র উৎসাহ ও হর্ষের কারণ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সম্মুখে ও পশ্চাতে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সে আর কোন দিকে মন দিতে পারে নাই।

কিন্তু যখন চারিদিক মশালের আলোর অপেক্ষাও উজ্জল আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিল, যখন চারিদিক হইতে দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দ হইতে লাগিল, তখন সে বুঝিল এইবার সব শেষ !

সে তখন হতাশ হইয়া বলিল—"লিলি ! আর আমাদের কোনও আশা নেই ! আর তোমায় বাঁচাতে পারলুম না !"

অগ্নিরাশি-বেষ্টিত হইয়া লীলা তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। সে কোন কথা না বলিয়া ধীরে কিরণের হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিল।

কিরণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"শেষ পর্য্যন্ত ওদের আমি তোমার গায়ে হাত দিতে দেবো না—কিন্তু তুমি আমায় মাপ করো—লীলা !"

"—মাপ করবো ? কিসের জন্য কিরণ ?"

কিরণ লীলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে চাহিল,—"ক্ষমা—তোমার জীবন এমন ভাবে নষ্ট করলুম বলে—তোমার এই তরুণ জীবন—শোভা ও মাধুর্য্যে ভরা সুন্দর জীবন—আমারি জন্যে অসময়ে

নষ্ট হলো—লীলা—সেই জন্যে ক্ষমা চাইছি! তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তোমার জন্য কিছু করতে পারলুম না—ক্ষমা চাই!"

কিন্তু মুখে সে কোন কথা বলিতে পারিল না! কেবল সজলনেত্রে লীলার অগাধ প্রেম ও বিশ্বাসে পূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! তাহার সে সময়ের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না!

লীলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে বলিল—"কেন ভাবছো এত? আমার জন্যে? আমি ত তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারিনি বলে নিজেই ছুটে এই নিয়তির মুখে এসে পড়েছি! বেশ ত! দুজনে একসঙ্গে যাব!"

আগুনের উত্তাপ ক্রমেই বাড়িতেছিল। বহুদূর পর্য্যন্ত ভীষণ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সরিয়া আসিয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইল! আগুনের শিখা লাফাইতে লাফাইতে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল!

চারিদিক হইতে ফটাফট্ শব্দে ছাত, কার্ণিস, দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল! প্রবল বাতাসে দীর্ঘ জলন্ত অগ্নিশিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘর জ্বালাইয়া যেন মৃত্যুর প্রলয়কালীন নৃত্য করিতেছিল! ও সেই দৃশ্য দেখিয়া বিদ্রোহীদের সহর্ষ উচ্চ চীৎকার যেন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল!

দহ্যমান বাংলার আগুনের ভিতর হইতে এই দুইটি প্রাণীকে অনিবার্য্য ভীষণ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই রহিল না।

বারাণ্ডা হইতে ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা কেহ করিল না—কিরণ তখনো রিভলভার হাতে সেখানে দাঁড়াইয়া! পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিতে তখন কেহ ছিল না, অসহ্য উত্তাপ ও ধূমে নিশ্বাস রোধ হইয়া আসায়

পিয়নেরা নিরাপদ স্থানে সরিয়া গিয়াছিল! বহুলোকের সহিত যুদ্ধে রত তাহাদের লাঠির শব্দ তখনো লীলা ও কিরণের কাণে আসিতে-ছিল।

ক্রমে বিদ্রোহীদের অনেকেই বাংলার পিছন দিকে কোন প্রহরা নাই দেখিয়া সরিয়া সরিয়া সেইদিকে জড় হইতেছিল, আগুনে ঘর ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে যদি কিছু লুটপাট করিবার সুবিধা হয় সেই চেষ্টায়—

অল্প সময়ের মধ্যেই সে-ঘরের কড়ি বরগা সব ধরিয়া উঠিল! ধূম ও উত্তাপ অসহ্য হইয়া তাহাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল!

কিরণ পরিষ্কার বাতাসের জন্য লীলাকে বারাণ্ডায় টানিয়া আনিল! আসন্ন বিপদের প্রতীক্ষায় তাহার মুখ তখন কঠোর ও অবিচলিত স্থির! লীলার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। চারিদিকে সেই জ্বলন্ত আগুন, অসহ্য উত্তাপ ও ধোঁয়া, মৃত্যুর সেই ভীষণ তাণ্ডবলীলা—তাহার সমস্ত সাহস নষ্ট করিয়া দিয়াছিল! আসন্ন মৃত্যুর এই উদ্বেগের অপেক্ষা মৃত্যু যে অনেক ভাল!

আগুনের একটা শিখা লাফাইয়া আসিয়া বারাণ্ডায় লাগিল। রেলিং ধরিয়া উঠিল, মড় মড় শব্দে ছাতের একাংশ ভাঙ্গিয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া পড়িল!

কিরণ দেখিল আর আশা বৃথা। কোন দিক দিয়া রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় নাই! বৃথা আর লীলাকে কষ্ট দিয়া লাভ কি? এখন শেষ উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

লীলা আতপ-তাপ-তাপিতা লতার মত অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় চোখ বুজিয়া কাঁপিতেছিল! তাহার মুখ বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে!

কিরণ তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া ডাকিল—"লিলি! সোজা হয়ে দাঁড়াও! এবার আমাদের সব শেষ!"

লীলা চাহিয়া দেখিল অন্তিম মুহূর্ত্ত নিকট। মৃত্যুর মধ্যেও একটা শান্তিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল—সে যাহাকে ভালবাসে—তাহারই সঙ্গে আজ সে সহমরণে যাইতেছে। তাহার এই মৃত্যু অরুণকেও তাহার জীবনব্যাপী গুপ্ত আঘাত হইতে রক্ষা করিল! ভালই হইল!

কিরণের হাত কাঁপিয়া গেল! সে আরও কঠোর ভাবে নিজেকে এই বিয়োগান্ত ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া আবার হাত উঠাইয়াছে, সেই সময় বাহিরে একটা ভীষণ গোলযোগের রোল উঠিল।

জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। প্রহার ও ধাক্কাধাক্কির বিষম গণ্ডগোল শুনিয়া উভয়ে চাহিয়া দেখিল—বেড়ার ওপারে মোটর হইতে খাকি পোষাক-পরা লোকেরা লাফাইয়া পড়িতেছে ও বিদ্রোহীদের অসম্বদ্ধ ভাবে প্রহার করিতেছে।

প্রতিরোধ করার উপায় ছিল না, কারণ পুলিশের লোকের প্রাচুর্য্য দেখিয়া দাঙ্গাকারীরা অকস্মাৎ বিষম ভয় পাইয়া পলাইতেছিল, ও চীৎকার ও গোলমালের মধ্যে মিলিটারী তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল।

কিরণ বিপন্মুক্ত হইয়া লীলাকে লইয়া বাগানে পরিষ্কার বাতাসে বসাইল। সেই বিশাল অগ্নিকাণ্ডের রক্তশিখা তখনো সে-স্থানের চতুঃপার্শ্ব আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল—আকাশে স্থানে স্থানে কাল ধোঁয়া তখনো জমিয়া রহিয়াছে। পুলিশের লোকের সঙ্গে অনেক মিলিটারী আসিয়াছিল—তাহাদের সমবেত চেষ্টায় আগুন ক্রমশঃ নিবিয়া আসিতে লাগিল।

একজন পুলিস অফিসার তাহাদের বলিল—"লেফ্‌টেনেণ্ট ঘোষাল গিয়া তাহাদের সংবাদ দেওয়ায় তাহারা এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে!"

সে আরও বলিল—"সহরের হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে বন্ধ করা হইয়াছে। সময়ে খবর পাইয়া মধ্যরাত্রের পূর্ব্বেই সহসা বিদ্রোহী সৈন্যদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদের বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। পুলিশ সহরের নানা স্থান হইতে সমস্ত বিদ্রোহিদলকেও ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে লিখিত প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে যে, রাত্রি বারোটার সময় একটি বোমার সঙ্কেত-শব্দ হইলেই সহরে হত্যা-মহোৎসব পড়িয়া যাইত।"

তাহার কথা শেষ করিয়া সে কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার কিছু ক্ষতি হইয়াছে কি না?"

কিরণ বলিল—"ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে—বাড়ীটা একেবারেই গেছে! তা যাক! প্রাণের কোন হানি হয় নি যে সেই ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে! আমার লোকজনেরা ও আমরা তুজনে সকলেই প্রাণে বেঁচে গেছি! আপনারা খুব সময়েই এসে পড়েছিলেন!" বলিতে বলিতে সে শিহরিয়া উঠিল! তাহার মনে পড়িল—সে কিরূপ ভাবে তাহার বন্দুক লীলার দিকে লক্ষ্য করিয়াছিল! এক একটি গুলিতে তাহারা তুই জনে মুহূর্ত্তের মধ্যে নীরব হইয়া যাইত!

৪৫

সেই রাত্রে যখন তাহারা তুইজনে মোটরে বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিরণ তাহার দগ্ধ গৃহ রক্ষার ভার চাকরদের উপর ফেলিয়া লীলার সঙ্গে যাত্রা করিল। তাহারা দহ্যমান অগ্নিকুণ্ড হইতে কিছু রক্ষা করিতে পারুক আর নাই পারুক,

তাহাতে তাহার কোন আগ্রহ ছিল না—লীলা যে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, সে তাহাই তাহার চরম পুরস্কার বলিয়া জানিয়াছে।

আজ সে অনেক সহ্য করিয়াছে, এবং এখনও অপর দিকে তাহার জন্ম যাহা অপেক্ষা করিতেছে—তাহাতে তাহার উপস্থিতি ও বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রধান কাজ। শীঘ্রই সে অরুণের সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইবে ও শেষ একটা বোঝাপড়া হইবে। তাহার এক সময়ের পুরাতন বন্ধু যে আজ তাহার সহিত মনুষ্যোচিত বিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার করিবে, তাহাতে কিরণের কোন সন্দেহ ছিল না।

অরুণ এখন দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছে, এখন লীলার স্বীকার-উক্তি সে সদাশয়ের মত গ্রহণ করিয়া লীলাকে তাহার সর্ত্ত হইতে মুক্তি দিবে —ইহা কিরণ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে; অবশ্য ইহার নৈরাশ্যও যে কত গভীর—তাহা কিরণ ভালই জানে; কিন্তু মানুষের জীবন ত অধিকাংশই নৈরাশ্যে পূর্ণ!

লীলা যে আজ সম্পূর্ণরূপে তাহার, এ চিন্তায় কিরণ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। তাহার কাছে আজ এই গভীর নিশীথে লীলার নিজে আসিয়া এই আত্মসমর্পণ—যেন তাহার জীবনে একটি স্মরণীয় ও পরম শ্রদ্ধার বিষয় বলিয়া মনে হইতেছিল। লীলার প্রকৃতির কোমল দিকটা—তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া তাহার মুগ্ধচিত্তে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটি মোহময় চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছিল। সেই চিন্তায় সে তন্ময়, বিভোর!

"কিরণ! যাকে ভালবাসা যায়, তাকে একবারে পাওয়া বড় সুন্দর জিনিস—না?" লীলা চুপি চুপি বলিল।

তাহার মনে যে উচ্ছ্বাস উঠিতেছিল, তাহা বুঝিয়া কিরণ বলিল—"এই আমি যেমন তোমাকে একেবারেই পেয়েছি!"

লীলা বলিল—"আমি তাই ভাবছি !"

"—লীলা ! আমায় তোমার চেয়ে অনেক বড় বলে তোমার মনে হয় না ? সত্যি আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় !"

"—তুমি যদি আরও বড় হতে, আমার তাতে কিছুই যায়-আসে না ! তোমার চেয়ে প্রিয় জগতে আমার আর কিছু নেই !"

লীলার এই সহজ সরল কথাগুলি সঙ্গীতের মত মধুময় স্বরে কিরণের কাণে বাজিতেছিল। সে আপনাকে ধিক্কার দিল—কেন সে এতদিন লীলাকে তাহার নিজের করিয়া লয় নাই ? অরুণ অন্ধ হইয়া তাহার কাছে আসিবার অনেক আগেই ত তাহারা স্বামী-স্ত্রী হইতে পারিত !

বাড়ী আসিয়া পড়িতে তাহাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল ! সিঁড়ির উপর পা দিতেই তাহারা বুঝিল—এবার তাহাদের কঠোর সত্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে !

দুজনেই ভাবিয়াছিল, অরুণ তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিবে ; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কেবল একটি ভৃত্য আগাইয়া আসিল। কেবল অরুণের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আর সব বাড়ী অন্ধকার ! অরুণ তবে জাগিয়া আছে ! কিন্তু তবু সে লীলার কোন খবর লইতে আসিল না !

ভৃত্য বলিল—"মিসেস্ রায় বলিয়া রাখিয়াছেন—লীলা বাড়ী ফিরিলে তখনি যেন তাহাকে তাঁহার ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"

লীলা ভাবিল—আর একটু হলে আমি আর বাড়ী ফিরতুমই না। প্রকাশ্যে বলিল—"মা কি এখনো জেগে আছেন ?"

"—আজ রাত্রে কেউ ঘুমোয় নি হুজুর ! যে ভয়ে ভয়ে আজকার রাত সবাইকার কেটেছে !"

কিরণ আর বিলম্ব সহিতে পারিতেছিল না। অরুণ যখন জাগিয়া আছে—তখন তাহাকে এখনি সব কথা বলা ভাল।

লীলা ব্যথিত চিত্তে বলিল—"খুব নরম হয়ে তাকে বুঝিয়ে বোলো! সে এত কোমল—এত অল্পে ব্যথা পায়—কি কষ্টই তাকে দিচ্ছি আমি! একে আজ বেচারা অনেক সয়েছে!"

কিরণ বলিল—"আমি খুব বুঝে কথা বলবো—লীলা! তবে সত্য কথাটা তার জানা উচিত। তুমি কিছু ভেবো না! এ ভারটা সম্পূর্ণ আমারই উপর ছেড়ে দাও।"

"—কি পশুর মত ব্যবহারই করছি আমি! তার যে আমায় ছাড়তে হলে কি দশাটাই হবে, আমি তাই ভাবছি!"

কিরণ তাহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়া অরুণের ঘরের দিকে চলিয়া গেল!

লীলা একটা অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহার মাতার ঘরের দিকে চলিল। বসন্তপুরে কি ঘটিয়াছে, তাহা মিসেস্ রায় কিছুই জানেন না; সুতরাং তাঁহার কাছে ভাল ব্যবহার পাইবার আশা বৃথা। যাহা হইবার, তাহা শীঘ্র শীঘ্র হইয়া গেলেই ভাল।

মিসেস্ রায় বিছানায় শুইয়াছিলেন—লীলা ঘরে ঢুকিতে তিনি সস্নেহে তাহাকে তাঁহার বিছানায় আসিয়া বসিতে বলিলেন।

লীলা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল। তিনি ত কই অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন না? আজ তাঁহার এ কি ভাব? তবে কি তাঁহার তাহাকে কোন অন্য সংবাদ দিবার আছে?

মিসেস্ রায় ধীরভাবে বলিলেন—"তুমি আজ সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ; কিন্তু আমি সেজন্য তোমায় কিছু বলতে চাই না—বিশেষ এখন তুমি বড় ক্লান্ত। যাক্, বসন্তপুরে কি হলো?"

লীলা সেখানকার সমস্ত ঘটনা ও তাহাদের আসন্ন মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার পাওয়া—সব বর্ণনা করিল। শেষে সে বলিল,—"কিন্তু এখানে কি হয়েছে মা? অরুণ কি ভাল নেই?"

মিসেস্ রায় বলিলেন —"না। আমি এই রাত্রে—এত গোলমালেও তার জন্য ডাক্তার আনিয়েছিলুম! আহা! বাছা আমার কি কষ্টের কপাল নিয়েই এসেছে!"

লীলা উদ্বেগ ও ভয়ে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। আবার বুঝি এখনি কি শুনিতে হইবে!

মিসেস্ রায় অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন—"তুমি যাবার ঘণ্টা দেড়েক পরে সে ফিরে এলো! তখনো তার খাওয়া হয়নি। অত্যন্ত ক্লান্ত—মাথার ও চোখের যাতনায় সে তখন কাতর হয়ে পড়েছে! এসেই তোমাদের কথা শুনলে। তখনি সেই মুখে, না খেয়ে, না দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। যাতে যত শীঘ্র তোমাদের সাহায্য করতে লোক পাঠাতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে! বল্লে, একটু দেরি হলে আর তারা প্রাণে বাঁচবে না! সেখানে তাদের সাহায্য করবার কেউ নেই!"

লীলা কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল—"সে-কথা সত্যি! আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে আর আমাদের এখানে ফিরতে হত না!"

মিসেস্ রায় বলিলেন—"সেই কথাই বলছি! সে ত স্বচ্ছন্দে নিজে না গিয়ে মিঃ ডুরাণ্টকে একখানা চিঠি লিখে দিতে পারত! তা না করে সে নিজে তখনি ছুটে বেরিয়ে গেল—পাছে একটু দেরি হয়! পাছে সময়ে সাহায্য গিয়ে না পড়ে! তার এই নিঃস্বার্থপরতার জন্য চিরজীবন তার কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

ক্রমে মিসেস্ রায় এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই একে একে

লীলাকে শুনাইলেন। লীলা নিজের সমস্ত বিপদ ভুলিয়া মর্ম্মাহত হৃদয়ে অরুণের শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। এতক্ষণে কিরণও তবে সব শুনিয়াছে। তাহাদের উভয়ের এতক্ষণের সমস্ত আশা আনন্দ উৎসাহ—সবই শেষ; আবার লীলাকে তাহার পূর্ব্ব জী[illegible] ফিরিয়া যাইতেই হইবে!

লীলা এই অতর্কিত দারুণ আঘাতে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। মিসেস্ রায়ের কথা শেষ হইলে সে উঠিয়া আসিয়া ড্রয়িংরুমে একখানা চেয়ারের উপর লুটাইয়া পড়িল। মর্ম্মান্তিক কষ্টে তাহার অন্তর পুড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহার চোখে এক ফোঁটা জল আসিল না।

কিরণ অরুণের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অরুণ টেবিলের ধারে চৌকিতে বসিয়া আছে। তাহার দুই বাহুর উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে মাথাটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, যেন সে লীলার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে শ্রান্ত দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কিরণের পদশব্দে সে চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; বলিল—"কে ওখানে? ডাক্তার?"

সে স্বরে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। কিরণ সে স্বর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। অরুণের সেই শবের মত রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ মুখ—আর এই উদাস শুষ্ক স্বর—যেন তাহার মনের সমস্ত স্ফূর্ত্তি, আনন্দ সব নষ্ট করিয়া দিল। কি হইয়াছে—তাহা না জানিয়াও সে দমিয়া গেল। বলিল—"ডাক্তার নয়। আমি। কিরণ?"

"—কিরণ?" অরুণ চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিল।—"লীলা? লীলা কোথায়?"

অরুণের মুখের দিকে চাহিতেই একটা তীব্র অবর্ণনীয় যাতনায় ও

নৈরাশ্যে কিরণের চিত্ত সেই মুহূর্তে একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অরুণের চোখে এ কি লক্ষ্যহীন শূন্য দৃষ্টি! সে বলিল—"লীলা ভাল আছে, আমি তাকে বাড়ী ফিরিয়ে এনেছি। কিন্তু অরুন! এ কি? এ কি দেখছি?"

"—কি আর দেখবে? আমি অন্ধ। আবার আমি অন্ধ হয়েছি। আর এ সংসারে থাকবার আমার কি দরকার আছে? তোমরা এবার আমায় যেতে দাও। মুক্তি দাও আমাকে। ওঃ! ভগবান্! আবার! আবার আমি অন্ধ হলুম।" সে আবার চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কিরণ দেখিল—বুকফাটা কান্নায় তাহার দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

স্তম্ভিত হৃদয়ে কিরণ দাঁড়াইয়া রহিল! ভুল নয়! স্বপ্ন নয়! সত্যই অরুণ আবার দৃষ্টি হারাইয়াছে। তাহার হৃদয় তখন অব্যক্ত রুদ্ধ যন্ত্রণায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। তখনি তাহার মন হইতে স্বার্থপরতার সব চিন্তা লুপ্ত হইয়া গেল।

সে তখনি নিজেকে সংযত করিয়া অরুণের পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ও অতি কোমল করুণাপূর্ণ চিত্তে অরুণের তরঙ্গায়িত কুঞ্চিত কেশ-রাশির উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

"—আমি অন্য লোকের চেয়ে এমন কি পাপ করেছি, যার জন্যে আমার জীবন এমন অভিশাপগ্রস্ত হলো—কিরণ?"

কিরণ ধীর মৃদুস্বরে বলিল—"কিসের জন্য যে সংসারে কি ঘট্‌ছে, তার কোন্‌টাই বা আমরা ধরতে পেরেছি ভাই? অন্ধভাবে নিয়তিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর আমাদের কি-ই বা উপায় আছে? হয় তো তোমার যেমন এ অনিষ্ট হলো, তেমনি কোন উপায়ে ক্ষতিপূরণও হতে পারে।"

কিরণের স্নেহপূর্ণ কোমল স্পর্শ ও নীরব সহানুভূতিপূর্ণ সান্ত্বনায় অরুণ একটু সুস্থ হইল। রুমালে মুখ মুছিয়া ভগ্নস্বরে বলিল—"হতে পারে? তুমি এ-কথা বোলছো? কেবল একটিমাত্র উপায়ে এর ক্ষতিপূরণ হতে পারে—যা আমি সর্ব্বক্ষণ মনে মনে ধ্যান করছি। কিন্তু আমার এ পোড়া ভাগ্যে আবার কি সে শান্তি ফিরে আসবে?"

কিরণ বলিল—"আসবে না কেন? সন্দেহ করছো কেন—অরুণ?"

দুজনেই লীলার কথা ভাবিতেছিল, পরস্পরের মনের ভাব তাহাদের পরস্পরের অজ্ঞাত ছিল না।

অরুণ বলিল—"কেন সন্দেহ করছি, তা তোমায় খুলেই বলছি কিরণ! আমি যে কি যাতনা ভোগ করছি, সে তুমি বুঝতে পার্ব্বে না। মন আমার নরকের মত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। যখন ফিরে এসে শুনলুম, লীলা তোমার কাছে ছুটে গিয়েছে, তখন থেকে আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছি। আমি যে সর্ব্বক্ষণ তোমাকে কি হিংসা কচ্ছি, সে তুমি মনে ভাবতেও পারবে না। কতবার মনে হয়েছে—একটি গুলিতে আমার এ দগ্ধ জীবনের অবসান করে দি। কিন্তু লীলা নিরাপদ হয়েছে, তার আর কোন ভয় নেই—এই খবরটুকু না জেনে মরবারও ইচ্ছা হল না আমার।"

কিরণ বলিল—"এসব অনর্থক চিন্তা করে বৃথা কেন কষ্ট পাও অরুণ! লীলা তোমারই! সে বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ রেখ না।"

কিরণের ঠোঁট কাঁপিতেছিল। লীলার উপর তাহার সব দাবী সে আজ ছাড়িয়া দিল। আজ হইতে লীলার সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব ছাড়া তাহার আর কোন সম্বন্ধই রহিল না।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া সে বলিল—"তুমি ত সন্ধ্যা থেকে বাইরে বেরিয়েছিলে শুনলুম, তোমার আবার এ অবস্থা কেমন করে হলো ?"

"—আজ সমস্ত দিন ধরে লিখে লিখে চোখে বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল। ডাক্তার বার বার করে বারণ করে দিয়েছিল, চোখে যেন জোর না লাগে, চোখের পরিশ্রম যেন কোনদিন অতিরিক্ত না হয়ে যায়। সে হিসাবে কয়েক দিনই আমার চোখের কাজ বেশি হচ্ছিল। আজ যখন রাত্রের বিদ্রোহের খবর পেলুম, তখন বড় যাতনা বোধ হচ্ছিল ; কিন্তু এ খবর শুনে ত স্থির থাকতে পারি না। তখনি বেরিয়ে পড়লুম। আগে দানাপুরে ক্যান্‌টনমেন্টে গিয়ে মেজর স্মিথের সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলতে, তিনি বল্লেন, তাঁরা আগেই খবর পেয়ে সাবধান হয়েছেন, —ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াতে পায় নি। সেখান থেকে সহরে এসে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডুরাণ্টের কাছে গেলুম।—সেখানেও শুনলুম বিদ্রোহীদের অনেককেই ধরা হয়েছে ; এখনও ধরপাকড় চলছে !

"আর আমার সেখানে থাকবার দরকার নেই দেখে চলে আসছি—মনে ভাবলুম—বাড়ী এসেই ডাক্তার ডাকতে পাঠাব, চোখের যাতনায় মাথাশুদ্ধ খসে পড়ছে। কিন্তু এসেই শুনি, তোমার বিপদের কথা—আবার লীলা একা এই রাত্রে সমস্ত বিপদ মাথায় করে নিয়ে তোমার কাছে ছুটেছে। ব্যাপারটা যে আমার পক্ষে কত বড় আঘাত, তা অন্যে বুঝবে না। যাই হোক, এ বিপদ শুনেও কি আর এক মিনিট দাঁড়াতে পারি ? সেই মুখে আবার ছুটলুম—পুলিশ আফিসে। তখন আবার সব পুলিশের লোক যায়গায় যায়গায় বেরিয়ে গেছে বিদ্রোহীদের সন্ধান করতে। অনেক চেষ্টায় টেলিফোন করে তাদের কতক লোককে ফিরিয়ে, জনকতক টেরিটোরিয়াল সৈন্য যোগাড় করে—মোটরে তাদের

তুলে দিয়ে বাড়ী এলুম। তখন চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে—ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

"ডাক্তার এলো। সে বল্লে, আমি যদি অন্ততঃ সন্ধ্যার পরেও তার কাছে যেতুম, তা হলে সে অস্ত্র করে আমার দৃষ্টি রক্ষা করতে পারতো। এখন আর উপায় নেই।"

মর্ম্মান্তিক কষ্টে কিরণের মাথা নত হইয়া আসিল। তাহার নিজের জীবনের সব ত গেলই, তাহার বন্ধুও যে অবশিষ্ট জীবন এইরূপ অন্ধ হইয়া থাকিবে—এই কষ্ট ও করুণায় তাহার অন্তর মথিত হইতেছিল,—সত্যই সে অরুণকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

বহুক্ষণ পরে সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এবার আর তাহলে কোন আশাই নেই?"

"—কিছু না! চোখের যাতনা আমার কমে গেছে—একটা লোশন ও একটা নার্ভ টনিকে। কিন্তু তাতে কি? আমার দৃষ্টি ফিরে পাবার আর কোন আশা নেই! আমি ভিখারীরও অধম! আমার সবই শেষ হয়ে গেল!"

"—কেন এত নিরাশ হচ্ছো অরুণ! অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তুমি আবার হয় তো সুখী হতে পার!"

অরুণ বলিল—"তা হতে পারতুম, যদি জানতুম, লীলা এখনো আমায় তেমনি ভালবাসে। কিন্তু সে আর হবার নয়। সত্যই সে যদি আমায় ভালবাসতো, তাহলে কখনো অমন পাগলের মত তোমার কাছে ছুটে যেতে পারতো না! সে আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি। তুমি আমার চেয়ে তাকে ঢের বেশি সুখী করতে পারবে।"

কিরণ এ-কথা ভালরূপেই জানে, ও এ-জ্ঞান তাহাকে উন্মাদ-প্রায় করিয়া তুলিতেছিল। লীলার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ নষ্ট করিয়া

তাহাকে অপরের হাতে তুলিয়া দিবার কি অধিকার আছে তাহার ? তবু, এ-কথাও সত্য যে, অন্ধের হাত হইতে সে লীলাকে কাড়িয়া লইতে পারে না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া অরুণ আবার বলিল—"আমি কেমন করে বিশ্বাস করবো—সে তোমায় ভালবাসে না? তুমি ত তাকে ভালবাস ?

অরুণের ঈর্ষাকাতর মুখ দেখিয়া কিরণ ব্যথিত হইল। বলিল —"তাকে ত সকলেই ভালবাসে। সে কিন্তু তোমাকেই ভালবাসে।"

—"কিরণ! তোমার এ-কথা যেন আমার দগ্ধ প্রাণে শান্তি দিলে! আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন এ-কথা সত্য হয়! আমার জীবনের সর্ব্বস্ব সে। সে যদি আমায় ছাড়তে চায়, তবে আর আমি বাঁচতে চাই না।"

"—সে কোন দিনই তোমায় ছাড়তে চাইবে না অরুণ! কেন এ-সব ভেবে বৃথা কষ্ট পাচ্ছ ?"

কিরণ দৃঢ়ভাবে এ-কথা বলিয়া অরুণকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। তাহার আঁধার জীবনের মধ্যে আলোকের, আশার সুখময় চিত্র দেখাইয়া, বহুক্ষণ একত্র গল্প করিয়া, তাহাকে অনেকটা সুস্থ ও অন্যমনা করিয়া রাখিল। অরুণের শোচনীয় অবস্থা, তাহার ভগ্ন হৃদয়, তাহার সান্ত্বনার প্রয়োজনীয়তা—এক মুহূর্ত্তেই তাহার উদার চিত্তের মহানুভবতা জাগাইয়া দিয়াছিল।

অরুণ একটু সুস্থির হইয়া নিজের স্বার্থপরতায় লজ্জিত হইয়া বলিল—"আমি তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলুম! সেই থেকে কেবল নিজের কথা নিয়েই মেতে আছি। তোমরা কি করে রক্ষা পেলে ?"

কিরণ বলিল—"সে-সব লীলা তোমায় এর পর বলবে! এখন তুমি বিছানায় শোবে চল! বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।"

"—তা সত্য—আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার শুতে যেতে বা কিছু করতে মোটে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

"—ও-সব কেবল তোমার মনের নৈরাশ্যের জন্য। মন প্রফুল্ল কর। আমি বল্‌ছি—আবার তুমি সুখী হবে! চল! তোমায় বিছানায় শুইয়ে আসি।"

"—আমি কি এখন একবার লীলাকে দেখতে পাব না?" অরুণ অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে মিনতির সুরে বলিল।

কিরণ বুঝিয়াছিল—এই অকস্মাৎ আশাভঙ্গে লীলা কি তীব্র যাতনা ভোগ করিতেছে! এই মুহূর্ত্তে আবার অরুণের সঙ্গে দেখা করা তাহার পক্ষে কি মর্ম্মান্তিক কষ্টকর হইবে!

সে তাহাকে এই অগ্নি-পরীক্ষা হইতে দূরে রাখিবার জন্য বলিল —"আজ সে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে! বাকি রাতটুকু—অন্ততঃ ঘণ্টা দুই—তার একটু বিশ্রাম—একটু ঘুমানো দরকার। সকাল হয়ে এসেছে। কাল তুমি তাকে যতক্ষণ ইচ্ছা কর—ততক্ষণই পাবে। এটুকু সময় একটু ধৈর্য্য ধরে শোবে চল!"

অরুণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কিরণ বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সে যখন আলো নিভাইয়া দিয়া অরুণের কাছে বিদায় চাহিল, অরুণ তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল—"তুমি আমায় মাপ কর কিরণ! আমি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা জীবনে কখনো ভুলবো না! তোমার সঙ্গে আমি বড় অন্যায় ব্যবহার করেছি।"

"—কিছু ভেব না! আমার কাছে তুমি আমার চিরদিনের সেই প্রিয় বন্ধু!" অরুণের করকম্পন করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

৪৬

ড্রয়িংরুমে কৌচের উপর কুশনে মুখ ঢাকিয়া লীলা পড়িয়া ছিল; কিরণ ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

অনিবার্য্য হৃদয়ের আবেগে সে কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। অরুণের নিকট সে যে কিরূপে এতক্ষণ সহজ ও সংযত ভাবে কথা কহিয়াছে, তাহাই ভাবিয়া সে আশ্চর্য হইতেছিল।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বের আকাশ ধীরে ধীরে রঙিন আলোর আভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছিল। বাগানের উচ্চশীর্ষ বৃক্ষগুলি তখন আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্য হইতে অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমগাছের ঘন পাতার ফাঁকের মধ্যে বসিয়া একটা কোকিল কেবলই অশ্রান্তভাবে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখনো অন্যান্য পাখীরা জাগিয়া তাহাদের প্রভাতী সঙ্গীতে যোগ দেয় নাই।

গভীর বিষাদে অবসন্ন ও মুহ্যমান হৃদয়ে কিরণ কিছুক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। লীলার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, তাহাদের উভয়ের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, অরুণের আবির্ভাব, তাহার ফলে তাহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ—সমস্তই যেন আলোকচিত্রের দৃশ্যাবলীর মত একে একে তাহার মনশ্চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল।

লীলার সহিত তাহার বিচ্ছেদের ফলে সে নিশিদিন কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়াছে, সে-কথা কিরণের মনে পড়িল। সেই সামান্য অল্পদিনের মনোমালিন্যের ফলে লীলা হইতে অন্তরে থাকিয়া সে কিরূপে জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়াছিল, কেমন করিয়া সংসারের সকল শোভা-সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দ-উৎসব তাহার চোখের উপর হইতে নীরস হইয়া নিবিয়া গিয়াছিল, সে-সব কথা আবার নূতন করিয়া মনে

পড়িল। সেদিন তবু আশা ছিল, যেমন করিয়াই হোক, সে লীলাকে ফিরাইবে, এ-ভুল তাহাকে সে কোনদিন করিতে দিবে না; তাহার লীলা আবার একদিন তাহারই হইবে। কিন্তু আজ? আজ আর লীলাকে ফিরিয়া পাইবার কোন আশাই রহিল না; আজ সে নিজের হাতে লীলাকে অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া সকল আশার মূলোচ্ছেদ করিয়া আসিয়াছে। যে তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব ছিল, আজ সে তাহার কাছে পরস্ত্রী—বন্ধুর পত্নী! ইহার পর আর তাহার কাঁদিয়া ফল কি?

মর্ম্মাহত হৃদয়ে কিরণ একবার তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। লীলা তখনো তেমনি নির্ব্বাক্‌ভাবে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া ছিল। নিস্তব্ধ রোদনের রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে এক একবার তাহার দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল!

কল্যাণপুরের মহারাজার বাড়ীর উৎসবের দিন সেই উজ্জ্বল আলোকমালাভূষিত, বহুজনাকীর্ণ আনন্দ ও শোভাময়ী রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সেদিনও লীলা সেই প্রমোদ-গৃহের অসংখ্য আমোদ-আহ্লাদের সব সুযোগ উপেক্ষা করিয়া আজিকার মত এমনিই একান্তে বসিয়া এমনি নীরবে কাঁদিয়াছিল! কিরণ তাহার উপর রাগ করিয়াছিল, সে সেই মর্ম্মান্তিক বেদনা সহ্য করিতে পারে নাই। কিরণ অভিমান করিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে ছিল, সে সেই ব্যথায় অধীর হইয়া আকুল প্রাণে কাঁদিয়াছিল। আর আজ? আজ কিরণ স্ব-ইচ্ছায় তাহার সহিত সব সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইতেছে! আজ এ দুঃসহ বেদনা হইতে লীলাকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই নাই! এমনি নিস্তব্ধ রোদনে বক্ষ পূর্ণ করিয়া, এমনি দুঃসহ ব্যথা অন্তরে ঢাকিয়া, এই ভাবে লীলা জীবন কাটাইতে বাধ্য

হইবে ; তাহার জন্য কিরণের কিছুই করিবার উপায় নাই ! লীলার সহিত সকল সম্বন্ধই তাহার মুছিয়া গেল !

বহুক্ষণ পরে কিরণ হৃদয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া লীলার কম্পিত কোমল হাত দুটি ধরিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"আমি ভেবে দেখলুম, অরুণকে তোমার ছাড়বার কোন উপায় নেই লিলি ! সে বড় দুঃখী, বড় অসহায় ! তুমি না হলে চলবে না তার !"

"—আমি যখনই তার কথা শুনেছি তখনই জানি।"

কিরণ বলিল—"এর পরে আর আমার কিছু বলবার নেই ! এখন থেকে তুমি আমায় তোমার প্রকৃত বন্ধুর মত, বড় ভাইয়ের মত মনে ক'রো। আমি এবং আমার যা-কিছু আছে সবই তোমার—যতদিন আমি বেচে থাকবো আমায় এইভাবে মনে রেখো ! মনে থাকবে ত ?"

লীলা বিদীর্ণ হৃদয়ে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল !

"—যদি কখনো কষ্ট পাও, যদি কোনদিন জীবনে বিপদে পড়, আমি যত দূরেই থাকি, আমায় খবর দিও ! কোন দিন এ-কথা ভুলে যেও না। আমি দূরে থাকলেও, জেনো, প্রয়োজনের দিনে আমি তোমার পাশেই চিরদিন আছি।"

লীলা কষ্টে বল সঞ্চয় করিয়া অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া বলিল—"সে-কথা আমি খুব ভাল করেই জানি কিরণ !"

কিরণ লীলার মুখের দিকে চাহিয়া আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! একদিন লীলা নিজেকে কিরণের প্রতি অনুরক্ত জানিয়াও, নিজের ন্যায়নিষ্ঠ চিত্তের সততা ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া, কিরণের সমস্ত অনুনয় বিনয় যুক্তি উপেক্ষা করিয়া, তাহার নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিয়াছিল ; কিরণের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আশা সবই এতদিন নিষ্ফল হইতে চলিয়াছিল। যেদিন লীলা নিজে

হইতে গিয়া তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিল, সেই [illegible] অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া এ সম্ভাবনার সব দিকই নির্ম্মূল করিয়া দিল ! না[illegible] মধ্যপথে বিস্তর ঝড়-তুফান কাটাইয়া আনিয়া তীরের কাছে আসিয়া ভরা-ডুবি হইয়া গেল !

—"অরুণ বড় হতভাগা ; আমার চেয়ে তারি তোমাকে দরকার বেশি ! কাল সকালে তার সঙ্গে দেখা ক'রো ! তাকে সুখী করবার জন্য চেষ্টা ক'রো। আমি জানি, কেবল তুমিই তাকে সুখী করতে পার্ব্বে !"

লীলা বলিল—"আমি তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো !"

"—বিদায়, তবে লীলা ! এখন কিছুদিনের মত বিদায় !"

লীলা অশ্রুর আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া আবার কুশনের উপর লুটাইয়া পড়িল।

উষার অস্পষ্ট ধূসর আলোক-রেখার মধ্য দিয়া কিরণ মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল !

৪৭

পরদিন যখন অরুণ নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিল, তখন বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। শরীর ও মনের একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া সে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল !

সে জাগিয়া উঠিয়াই প্রাতদিনের অভ্যাসমত লাফাইয়া বিছানা হইতে নামিতে গেল ; কিন্তু তখনি তাহার পূর্ব্বদিনের সমস্ত কথা একে একে মনে পড়িয়া গেল ! সে জানিল, এ জীবনে সে আর কোন দিনই চোখে দেখিতে পাইবে না।

বাগান হইতে পাখীদের সুমিষ্ট কলরব বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল ; নানা পরিচিত গৃহকর্ম্মের শব্দে বাড়ী পরিপূর্ণ ; জানলা হইতে রৌদ্রের কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে—সে সবই অনুভবে

বুঝিল, সবই জানিল—কিন্তু সেদিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার তাহার আর প্রবৃত্তি রহিল না! এই শয্যা যদি তাহার মৃত্যুশয্যা হইত, তাহা হইলে হয়ত সে মনে শান্তি পাইত!

মর্ম্মান্তিক বেদনায় ও নিরাশায় সে আবার অবসন্ন দেহে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত অবস্থা নিমেষের মধ্যে তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। আবার উঠিয়া নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করিতে আর তাহার কোন উৎসাহ রহিল না!

এক সময় তাহার আশা ছিল, নষ্ট দৃষ্টি আবার ফিরিয়া আসিতেও পারে, কিন্তু এবার আর তাহার কোন আশাই নাই।

যাহাতে এ দুর্ঘটনা না হয়, তাহার জন্য তাহাকে যথেষ্ট সতর্ক করা হইয়াছিল; কিন্তু যে সময় তাহার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, ঘটনাচক্রে তাহা হইয়া উঠিল না। ফলে চিরদিনের জন্য আবার সে অন্ধ হইয়া গেল।

এখন আবার তাহার সেই পূর্ব্বের অসহায় অবস্থা। সকল বিষয়ে, সকল কাজে চিরদিন অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। একবার অন্ধত্বের সমুদয় দুঃখ জানিয়া, ভোগ করিয়া, দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়া—আবার সেই দুঃখে পড়া দ্বিগুণ অসহনীয় যাতনা। যৌবনের সকল শক্তি, উৎসাহ, কর্ম্মদক্ষতা—সব থাকা সত্ত্বেও, এই অসহায় অকর্ম্মণ্য জীবন কত—কত দীর্ঘ দিন বহন করিতে হইবে! জীবনে তাহার বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছে!

তাহার অন্ধত্ব আজিকার মত আর কোনদিন এত দুঃখময়, এত হতাশায় পূর্ণ বলিয়া মনে হয় নাই! লীলা তাহার বাগ্দত্তা পত্নী; সে হয়ত তাহার প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিবে; কিন্তু সে কি শুধু শুষ্ক কর্ত্তব্যের খাতিরেই নয়? যেখানে ভালবাসার জন্য হৃদয় জ্বলিয়া

যাইতেছে, সেখানে নীরস কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় কে প্রাণে শান্তি পাইতে পারে? এ চিন্তা ছুরির মত তাহার হৃদয়ে বিঁধিতে লাগিল! তাহার নিজের প্রয়োজন ও সুবিধার জন্য কেন আর অন্য একজনের জীবন সে নষ্ট করিবে? তাহার আর এ-জগতে কোন-কিছুরই প্রয়োজন নাই। এবারের মত তাহার সবই ফুরাইয়াছে।

একজন ভৃত্য চা ও খাদ্যপূর্ণ ট্রে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, কিন্তু অরুণ আর সেদিকে মনোযোগ দিল না!

ভৃত্য চলিয়া গেলে, সে যখন আবার আহত হৃদয়ে অকূল নিরাশাসাগরে মগ্ন হইয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল, সেই সময় লীলা বাহির হইতে তাহার দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিল—"অরুণ! অরুণ!"

সেই পরিচিত সুমিষ্ট স্বরে অরুণের মনের কুয়াসা এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল! অবাধ প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার তাহার মনে পড়িল, লীলার প্রিয়-সুন্দর মুখ, তাহার সেই উজ্জ্বল হাস্যময় চক্ষু সে আর কখনও দেখিবে না।

"—অরুণ! এত বেলা হলো, এখনো তুমি ওঠো নি?" লীলা আবার বাহির হইতে তাহাকে ডাকিল।

"—আমি আজ বড় কুড়ে হয়ে গেছি—লীলা!" অরুণ তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে নামিতে নামিতে বলিল।

"—এখনো বিছানায়? বেশ যা হোক্! আমি ভিতরে যাব?" লীলার এই প্রেম ও মাধুর্য্যে-ভরা হৃদয়ের পরিচয়ে অরুণের মনে হইল—তাহার অন্ধকার জীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল! তাহার হতাশ জীবনে আবার আশার সঞ্চার হইল!

"—ভিতরে এসো—লীলা!" বলিবার পরই অরুণ লীলার ঢাকাই

শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইল। খাটের কাছে আসিয়া সে শব্দ থামিতেই অরুণ হাতড়াইয়া হাত বাড়াইল।

লীলা তাহার হাত ধরিল—একটি কোমল বাহু তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া তাহার মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া আনিল। স্নেহ ও আদরভরা স্বরে লীলা বলিল—"আবার নাকি তুমি অনিয়ম করে এই কাণ্ড বাধিয়েছ? যাহোক তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না! আমরা দুজনে ঠিক আগের মতই সমান আনন্দে সময় কাটাব! কেমন?"

অরুণ কোন কথা বলিতে পারিল না! আনন্দে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল! সে অবশভাবে লীলার কাঁধে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল!

লীলা তাহাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিবার জন্য বলিল—"একটা ভাল খবর শুনেছ? আজ সকালে উঠে মায়ের কাছে শুনলুম, এ সপ্তাহের শেষে আমাদের বিবাহের দিন ঠিক হয়েছে। তার পরে আমরা আমাদের বাড়ী যাব! তুমি অনেক দিন ধরে বাড়ী-ছাড়া হয়ে আছ! বাড়ী যেতে তোমার খুব ইচ্ছা করে—নয়?"

অরুণ অন্তরের অন্তস্তল হইতে বলিল—"তোমার সঙ্গে আমি যেখানেই থাকি, সে আমার কাছে স্বর্গ।"

তাহার অন্তর তখন অপূর্ব্ব সুখের আবেশে ভরিয়া উঠিতেছিল।

৪৮

মিঃ ঘোষের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর পরে এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট চিত্ররেখার ন্যায় সেই বৃহৎ শোকাচ্ছন্ন পুরী স্থির নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। একজনের অভাবে

সমস্ত বাড়ী যেন শূন্য, ভীতিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। চারিদিক নীরব। মানুষের চলাফেরা, কথাবার্ত্তা কিছুরই আভাস নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে কেবল মাঝে মাঝে পিসিমার মৃদু রোদনের ও বিলাপের ধ্বনি বাতাস ভাসিয়া আসিতেছিল।

ড্রয়িংরুমে টেবিলের ধারে একখানা চৌকিতে নির্ম্মলা বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আসিত।

টেবিলের উপরে এক তাড়া কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, নির্ম্মলার নত দৃষ্টি তাহারই উপর ন্যস্ত।

অসিতের মুখ ম্লান, গম্ভীর; মূর্ত্তি রুক্ষ ও মলিন; ললাটে চিন্তা ও বেদনার গভীর রেখা। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, দুদিনের মধ্যেই যেন তাহার দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে!

সে বলিল—"আমি আজ কদিন থেকেই আস্‌ব-আস্‌ব মনে করছি; কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পাচ্ছিলুম না! সেদিন যে অবস্থায় তোমাকে ফেলে চলে যেতে হলো, তাতে কি মন স্থির থাকতে পারে? এ কদিন একলাই ছিলে ত?"

নির্ম্মলা বলিল—"না,—খবর পেয়ে কিরণ বাবু এসেছিলেন। তিনিই তখনকার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিলেন। এখানে পিসিমার কাছে তিনি ছিলেনও দু-দিন। তিনি চলে যাবার পর আমার বন্ধু লীলা এসে এ কয়দিন আমার কাছে ছিল, আজ বিকেলে সে বাড়ী গেছে। আমায় একলা থাকতে বা কোন দিক দেখতে হয় নি, ওদের জন্যে।"

অসিত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ভালই হয়েছে! ওঁরা তোমায় দেখা-শুনা করেছেন, দরকার হলে পরেও করতে পারবেন জেনে আমার মনটা নিশ্চিন্ত হলো। আমার দ্বারা ত তোমার

কোন উপকার হওয়াই সম্ভব নয়; বরং আমি এখানে থাকলে তোমার বিপদ ঘটতে পারে!"

নির্ম্মলা তাহার ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া অসিতের দিকে চাহিল।

সে কথাটা বিশেষ বোঝে নাই দেখিয়া অসিত আবার বলিল,—"আজ তোমার মনের অবস্থা ভাল নেই নির্ম্মলা! দারুণ পিতৃশোকে তুমি কাতর; আর আমার নিজের অবস্থা—সেও তদ্রূপ! আমি আজ যে শোকের ব্যথা ভোগ করছি, সে কেউ বুঝতে পারবে না; সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভাল। তাই বলছিলুম, আজ আমাদের তুজনেরই যে অবস্থা, তাতে কোন গুরুতর কথা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তবু আজ তু' একটা কথা সংক্ষেপে তোমায় বলে না গেলে চলবে না। আমি আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কোথায় কত দূরে যে যাব, কত দিনের জন্য, আর কখনো ফিরতে পারবো কি না—কিছুরই স্থিরতা নেই! তাই একবার ওরই মধ্যে একটু সময় করে তোমার কাছে চলে এসেছি!"

নির্ম্মলা তাহার সজল বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"তুমিও চলে যাচ্ছ? আজই? আমার তবে কি হবে?"

অসিত অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"সত্যি! তোমার কথা মনে হলে আমি আর কোন রকমে মন স্থির করে আমার কাজ-কর্ম্মে হাত দিতে পারি না। মন আমার অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমার নিজের জীবন যে এমন ব্যর্থ হয়ে গেছে, তার জন্য আমার আর কোন দিনই কোন তুঃখ বোধ হয় না; কিন্তু তোমার জীবনটা যে এমন ভাবে আমার মত একটা নিতান্ত হতভাগা ভবঘুরের জন্য মাটি হতে বসেছে, এ চিন্তা আমায় সর্ব্বক্ষণ বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে নির্ম্মলা! আমি ত জানি, আমরা

দুজনে পরস্পরের কথা যেমন করেই নিই না কেন, আর-সবাইয়ের মত আমরা কখনো পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবো না! ঘটনাচক্রে পড়ে যে-পথে আমি আজ দাঁড়িয়েছি, সেদিক থেকে ফেরা আমার পক্ষে প্রায় অসাধ্য। তা ছাড়া, আমার মায়ের রক্ত তোমার আর আমার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলে দাঁড়িয়ে আছে! সে ব্যবধান কোন দিনই দূর হতে পারবে না! তবে তুমি কেন চিরদিন আমার জন্য কষ্ট পাবে?"

নির্ম্মলা এতক্ষণ নতমুখে অসিতের কথা শুনিতেছিল। তাহার কথার শেষাংশ শুনিয়া সে মাথা তুলিয়া চাহিল। বলিল—"এই খানেই তোমাদের একটা মস্ত বড় ভুল থেকে গেছে। তোমাদের সমস্ত কষ্ট, অপমান ও ব্যর্থতার জন্য আমার বাবা দায়ী, এ-কথা আমি স্বীকার করছি। তিনিও আজীবন ধরে নিজেকেই সর্ব্ব দোষে দোষী ভেবে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন; তাঁর ও-ভাবে আকস্মিক মৃত্যুর কারণও তাই। কিন্তু তবু তোমরা যা তাঁর সম্বন্ধে ভেবে আসছ, সে অন্যায় তাঁর দ্বারা হয় নি—তিনি তোমাদের বংশের অপমান করেন নি।"

অসিত এ-কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুমি এ-সব জানলে কোথা থেকে? মিঃ ঘোষ কি তোমাকে—"

নির্ম্মলা বাধা দিয়া বলিল—"না! তিনি আমাকে কোন কথাই মুখে বলেন নি। বোধ হয় যখন এই সব কথা ভেবে ভেবে বড় কষ্ট পেতেন, তখন হয় ত আমার কাছে সব কথা বলে মনটা হালকা করবার ইচ্ছা হতো; কিন্তু তাঁর মধ্যে যে অত্যন্ত ভদ্রতা ও কুণ্ঠা ছিল, তারি জন্য কোন দিন তিনি এ-কথা মুখে আনতে পারেন নি। যে-দিন বৈকালে হঠাৎ তিনি মারা যান, সেই দিন দুপুর বেলা আমাকে বলেছিলেন, তাঁর আমাকে বলবার যা-কিছু ছিল, সে-সব তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে লেখা আছে। তাঁর যদি

এই অসুখে মৃত্যু হয়, তা হলে আমি যেন পরে সেই কাগজগুলি দেখি। এতদিন লীলা ছিল বলে আমি আর এদিকে আসি নি। আজ সে চলে গেলে এ-ঘরে এসে কাগজপত্রগুলো পড়ে দেখলুম।”

নির্ম্মলা টেবিলের উপরের কাগজগুলি গুছাইয়া অসিতের হাতে দিতে গেল; বলিল—“তুমিও একবার এগুলি পড়ে দেখ!”

অসিত একটু কুণ্ঠিত ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—“ওটা কি আমার দেখা ভাল হবে নির্ম্মলা? তিনি তাঁর যা-কিছু মনের কথা বা গোপনীয় বিষয় তোমাকে জানিয়ে গেছেন, তার মধ্যে—”

নির্ম্মলা বলিল—“সে-সব কথা কিছু ভেব না! ওতে যা-কিছু আছে, সে কেবল তোমাদেরই কথা। আর তোমারও সে-সব কথা ভাল করে জানা উচিত।”

নির্ম্মলা উঠিয়া একখানা চৌকি অসিতের দিকে আগাইয়া দিল। অসিত বসিয়া মিঃ ঘোষের লিখিত কাগজগুলি পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

নির্ম্মলা! মা আমার! প্রথম যৌবনে বুদ্ধির দোষে একদিন একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছিলুম; সারা জীবন তার স্মৃতির দংশনে অসহ্য জ্বালা ভোগ করে এসেছি। অবশিষ্ট দিন কয়টাও যে তা থেকে অব্যাহতি পাব না, তা স্থির জানি।

কিছুদিন থেকে আমার কেমন সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে যে, বোধ হয় আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কোন্ এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে যে সেই শেষ ডাক এসে পৌঁছবে, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তাই দিন থাকতে, আমার যা-কিছু বলবার আছে, সব লিখে রেখে গেলুম। যেদিন আমার নাম এ-সংসার থেকে মুছে যাবে, সেই দিন এ অনুতপ্ত বৃদ্ধের শোচনীয় কাহিনী পড়ে তোমরা আমায় ক্ষমা ক'রো; অন্যায়

করে তার যে শাস্তি আজীবন ধরে ভোগ করে গেলুম, তা ভেবে আমার উপর কোন রাগ বা অভিমান রেখো না। তোমাদের কাছে আমার এই শেষ অনুরোধ।

বাবার মৃত্যুর পর যেদিন আমি বিস্তীর্ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হয়ে বাড়ী এসে বসলুম, তখন আমার বয়স অত্যন্ত অল্প। হয়ত চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের বেশি হবে না। সুবিধা পেয়ে জন-কতক হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব এসে চারপাশে জুটলো। তাদের প্রভাব এড়াতে না পেরে শীঘ্রই আমি তাদের বশে চলতে সুরু করে অবাধ আমোদে গা ঢেলে দিলুম।

এ-সব বন্ধুদের মধ্যে হরনাথই ছিল আমার সব চেয়ে শত্রু; অথচ সে এমন ব্যবহার করে আমায় হাত করে রেখেছিল যে, আমি সে সময় ভাবতুম, তার মত সুহৃদ বুঝি আমার আর কেউ নেই। আমাদের পুরানো কর্ম্মচারী, যিনি আমাদের বিষয়-কর্ম্ম সব দেখতেন,—আমার এই সব অন্যায় ব্যবহার দেখে দেখে তিনি প্রায়ই আমায় এ-সব সংসর্গ ছাড়বার জন্য, নিজের বিষয় নিজে দেখা-শুনা করবার জন্য অনুরোধ করতেন। আমার তখন সে-সব কথা ভাল লাগতো না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে তাঁর মনান্তর হয়ে যেতো।

একদিন এই রকম একটু গুরুতর বচসা হওয়ায় তিনি কাজ ছেড়ে দিলেন। আমিও দ্বিতীয় বার অনুরোধ না করে তখনি হরনাথকে সমস্ত কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতে বললুম।

হরনাথ এই ঘটনায় একবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়াল। সে আমাকে বিষয়-সংক্রান্ত কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে দিত না। কারণে অকারণে বলতে না বলতেই অজস্র টাকা এনে যোগাত। আমি খুব খুসি হয়ে ভাবতুম, হরনাথ আছে বলেই কোন বেগ না পেয়ে আমার এমন স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটছে।

আমার জমিদারীর স্থানে স্থানে প্রজাদের মধ্যে হাহাকার উঠলো। আমি অবশ্য তখন এ-সব কিছুই জানতুম না; পরে সন্ধান করতে করতে সব শুনেছি। আমার প্রজারা ভাবলে, আমি একটা ভয়ানক নৃশংস অর্থ-পিশাচ,—জমিদারীর ভার হাতে পেয়েই অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে দিয়েছি।

এই সময়ে মণ্ডলগড় পরগণা আমি আমার পাশের অন্য জমীদারের কাছ থেকে কিনে নিই। হরনাথ তার নূতন সব বন্দোবস্ত করতে সেখানে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে সে কি যে-সব করলে, তা আমি জানি না। ফিরে এসে আমায় বল্লে, মণ্ডলগড়ের প্রজারা অত্যন্ত বদমাস ও অবাধ্য; তারা তাদের আগের জমীদারের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত। তারা বলে, আমাদের থাজনা দেবে না—সেই জমীদারকেই সব কিস্তীর থাজনা দেবে। তাদের সায়েস্তা করবার জন্য কিছুদিন তাকে সেইখানে গিয়ে থাকতে হবে। আর জনকতক মাতব্বর লোক, যারা প্রজাদের এই সব কুমন্ত্রণা দিয়ে ক্ষেপাচ্ছে,তাদের সঙ্গে মামলা-মোকর্দ্দমা করে তাদের জব্দ করতে হবে।

আমি এ-কথায় আপত্তি করবার কোন কারণ দেখলুম না। ঘরের পয়সা খরচ করে যখন পরগণাটা কিনেছি, তখন যে রকম করেই হোক্ তাকে দখলে আনতে হবে ত? তার জন্য জোর-জবরদস্তি না করলে যদি বিদ্রোহী প্রজা বশে না আসে, তা হলে অগত্যা তা করতেই হবে। হরনাথকে সে-কথা বলাতে সে খুব খুসি হয়ে সেখানে চলে গেল।

এই ঘটনার প্রায় তিনমাস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় আমি বাড়ীর ভিতরের বাগানে বসেছিলুম, কাছে তখন আর কেউ ছিল না। হঠাৎ দেখলুম, একটা গাছের পাশ থেকে একজন দীর্ঘাকৃতি লোক ধীরে

ধীরে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল! তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

আমি প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। কে তুমি! এখানে কেমন করে এলে?—এই রকম একটা কিছু বলে লোক-জন ডাকবার উপক্রম করতেই, সে লোকটা এগিয়ে এসে বল্লে—ভয় পাবেন না মশায়! আমি কেবল তুটো কথা বলেই চলে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি; কোন রকমে সে সুযোগ না পাওয়ায়, আজ অগত্যা এই পন্থা অবলম্বন করতে হলো। আমি হুজুরের মণ্ডলগড় পরগণার প্রজা—রামগোবিন্দ দত্ত।

মণ্ডলগড় শুনেই আমার হরনাথের কথা, সেখানকার বিদ্রোহী প্রজাদের কথা সব মনে পড়ে গেল। সেই সব তুষ্ট বদমাইসদের এত সাহস যে আমার বাড়ীতে পাঁচিল টপকে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানের ভিতর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে! এর মতলবটা কি?

রাগ করে কড়া সুরে বল্লুম, কথা কিছু থাকে ত কাল সকালে সদরে এসো—শোনা যাবে! তোমরা সেখানকার প্রজাদের সব আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছো—আমি আমার নায়েবের কাছে তোমাদের বদমাইসির কথা সব শুনেছি!

সে বল্লে, কিছুই শোনেন নি আপনি! আমি বরাবর সেই সন্দেহই করে আসছি যে প্রকৃত কথা হয় ত কিছুই আপনার কাণে যায় না! হয়েছেও তাই! আমি সেই বিশ্বাসে আপনার কাছে সত্য কথাটা বলে সুবিচার প্রার্থনা করতে এসেছি।

তার কাছে শুনলুম, হরনাথ আমার কাছে যা বলেছে, তা না কি সর্ব্বৈব মিথ্যা! জমিদারীটা কেনা হবার পর, কিছু দিন পূর্ব্ব-জমিদারের দখলেই ছিল। সেই সময় প্রজারা প্রথম কিস্তীর খাজনা তাদের

নায়েবের কাছেই দেয়। হরনাথ সেখানে গিয়ে সেই কিস্তীর খাজনা আমাদের প্রাপ্য বলে দাবী করে। তা ছাড়া, জমীর খাজনার হার বাড়িয়ে নতুন নতুন নিয়ম জারী করে। যারা তার আদেশমত বেশি খাজনা দিতে অক্ষম বলে প্রার্থনা জানায়, সে বেওজর তাদের কাছ হতে সে জমী কেড়ে নিয়ে বেশী খাজনায় অন্যত্র বিলি করে দেয়। প্রজারা প্রথম কিস্তীর খাজনাটা দুবার করে দিতে পারবে না ব'লে মাপ চায়; কিন্তু হরনাথের উৎপীড়ন ও জুলুমে তারা বাধ্য হয়ে সে-টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখন সে বেশি বেশি সেলামি নিজে নিয়ে একজনের জমী অন্য জনকে বিলি করে দিচ্ছে। গ্রামের দু একজন গরিব প্রজার মেয়েদের সম্বন্ধেও সে অন্যায় আচরণ করেছে। জন-কয়েক প্রধান লোক একত্র গিয়ে তার এ-সব ব্যবহারের প্রতিবাদ করায়, সে সবাইকে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রজারা সকলেই তার অত্যাচারে উত্যক্ত। এর উপর সামনের মাসে তার ছেলের না কি অন্নপ্রাশন, সেইজন্য সে এ খরচটা মণ্ডলগড় থেকে তুলবে বলে সবাইকে ডেকে কাল জানিয়েছে। এই কথা শুনে তারা সব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পরামর্শ করছে, এ অন্যায় তারা সহ্য করবে না। নজর দিতে হয় জমীদারকে দেবে। ওই যে লোকটা গিয়ে অবধি তাদের উপর এত অত্যাচার করছে, তার এত আব্দার আর তারা সহ্য করবে না।

আমি তাই আপনাকে সব জানাতে এসেছি—আপনার নায়েবের উপর একেবারে সমস্ত ভার ছেড়ে না দিয়ে, নিজে একটু একটু দৃষ্টি রাখবেন। মণ্ডলগড়ের প্রজারা বদমাইস বা বিদ্রোহী কিছুই নয়। তবে যদি কেবলই তাদের আঘাত করে করে উত্তেজিত করে তোলা হয়, তা হলে শেষে কি দাঁড়াবে, তা কে জানে। তার ফল রাজা-প্রজা কারুর পক্ষেই ভাল হবে না। আপনি যদি একবার দুদিনের জন্যও

সেখানে যান—যাদের জমী-জায়গা কেড়ে নিয়ে অন্নহীন করে রেখেছে—যাদের বাড়ী থেকে মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে অপমান করেছে,—তাদের ডেকে বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করেন, তা হলেই এ অসন্তোষ মিটে যাবে। আর তা যদি একান্তই না পারেন, তো আপনার নায়েবকে ডেকে ধমক দিয়ে এ-সব জুলুমবাজি বন্ধ করবার ব্যবস্থা করবেন। আর এ দুটোর যদি কিছুই না হয়, হরনাথের প্রতাপ যদি এমনি অক্ষুণ্ণ ভাবেই চলতে থাকে, তা হলে এর ফল বিশেষ ভাল হবে না। প্রজাদের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে প্রত্যেক স্থানে এর প্রতিবাদ করবো—জানবেন। কথা শেষ হতেই, লোকটা যেদিক দিয়ে এসেছিল, আর এক মুহূর্ত্তও না দাঁড়িয়ে সেই দিক্ দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

আমি খানিকটা অবাক্ হয়ে বসে রইলুম! তার চোখে-মুখে এমন একটা তীব্র তেজ ছিল, তার কথার মধ্যে কি যে অদ্ভুত জোর ছিল, যাতে আমায় একেবারে অভিভূত করে দিয়েছিল।

রাত ভোর কথাগুলো মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। সকালে উঠেই সর্ব্বপ্রথমে হরনাথকে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিলুম! কি ব্যাপারটা, সব জানতে হবে।

হরনাথ খবর পেয়েই সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির। আমি তাকে নিভৃতে ডেকে সব কথা খুলে বল্লুম।

সে প্রথম কিছুক্ষণ অবাক্ হতবুদ্ধি হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো; কোন কথাই বল্লে না।

আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে বিরক্ত হয়ে বল্লুম—কি, হলো কি? এ-সব কথা কেন আমায় শুনতে হলো? কি ঘটনা সত্য সত্য সেখানে ঘটেছে, আমি সব শুনতে চাই। কথা কও না যে?

সে বল্লে—কথা বোলবো কি? তোমার কথা শুনে আমি ত হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। সে ব্যাটা এখানে পর্য্যন্ত সত্যি সত্যি ধাওয়া লাগিয়েছিল? তবে ত নিমাই আমায় যা বলেছিল, সবই যথার্থ কথা! আমি না বিশ্বাস করে তাকে বকে ধমকে তাড়িয়ে দিলুম। এখন দেখছি—সে একটা কথাও মিছে বলে নি।

আমি বল্লুম—কথাটা কি, তাই আগে বল্ল না ছাই! সে বল্লে, কথাটা এই—ওরা সবাই তোমাকে যো পেলে খুন করবে বলে পরামর্শ কচ্ছিল। মণ্ডলগড়ের বুড়ো জমীদারের সঙ্গে তোমার বাবার চিরদিনের শত্রুতা—তাঁর সঙ্গে মামলা-মোকর্দ্দমা করে করেই ওরা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে! ঘুরে ফিরে ওদের অমন ভাল জমিদারীটা তোমার হাতেই পড়লো—এই এখনকার ছোকরা জমিদারের রাগ আর কি? রামগোবিন্দ ব্যাটা ওদেরই পেটাও লোক,—ওরই পরামর্শে প্রজারা সব বিগড়ে যাচ্ছে! ওরা সব একদিন জটল্লা করে এই সব কথা বলাবলি করছিল। রামগোবিন্দ বলে যে, যত রকমে পারা যায়, ওকে নাকাল করে মারতে হবে। অপূর্ব্ব বাবু বলেছেন, যত টাকা লাগে লাগুক্—কিছুতেই ওকে দখল নিয়ে বসতে দেওয়া হবে না।

আর একজন বল্লে, শুধু নাকাল কেন? বাবু একবার হুকুম দিন্ না—বাছাধনকে ছটি মাসের জন্য ঝোল ভাত খাইয়ে দেব এখন! আর উঠে জমিদারীর দখল নিতে হবে না।

আমার চাকর নিমাই কোথা থেকে এ খবর পেয়ে আমায় এসে বল্লে। আমি বল্লুম—দূর! এ কি কখনো হতে পারে? নীলামে সম্পত্তি কিনেছেন বাবু, তাতে দোষটা হয়েছে কি? তিনি না কিনলে অন্য লোকে কিন্‌তো—তার জন্যে তাঁকে খুন করবে? এ হতেই পারে না। আমরা হলুম সরল লোক—কি করে জান্‌বো বল? তবে সেই

সর্দ্দার বদমাস ব্যাটা যখন এতদূরে এসে তোমারি বাড়ীতে ঢুকে তোমাকেই এমনি করে শাসিয়ে গেছে—তখন ঐ সব ব্যাপার মিথ্যা না হতেও পারে বলেই ত আমার মনে হচ্ছে।

আমি এ-কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! জমিদার হয়েছি বটে, তবে জমিদারীর চালচলন কিছুই জানি না! সামান্য কারণে বা অকারণে এমন অহেতুক হিংসা লোকে করতে পারে—এ আমি জানতুম না।

আমায় নীরব দেখে হরনাথ বল্লে—আর তুমিও ত আচ্ছা লোক! তোমার বাড়ীর ভিতরে জোর করে ঢুকে এসে একটা লোক তোমায় যা-তা বলে শাসিয়ে গেল, আর তুমি চুপ করে তার এই সব কথা শুনলে? ধরতে পাল্লে না তাকে? লোকজন কেউ ছিল না কি সে সময়?

আমারও তখন রোখ চেপে গেল। তাই ত! আমি কি করে তার এত চোটপাট কথা শুনে অত সহজে তাকে ছেড়ে দিলুম! আমার কাপুরুষত্ব প্রমাণ হয়ে যেতে, অকস্মাৎ আমি রেগে উঠলুম!

বল্লুম, যেমন করে পার, ওদের সায়েস্তা করতেই হবে। টাকার জন্য ভেবো না। আর আমি কিছু শুনতে বা বলতে চাই না! ওদের দলবলকে জব্দ করা চাই-ই!

হরনাথ মুখ ভার করে বল্লে—না ভাই! তোমার বরঞ্চ একবার সেখানে যাওয়া ভাল। এসব বজ্জাত লোকদের জব্দ করতে হলে, ন্যায়-অন্যায় অনেক রকম চাল চালতে হয়। শেষ, আবার কে এসে আমার নামে তোমায় কি বলে যাবে—তখন আবার তোমার মন ভার হয়ে উঠবে। যাহোক্ পরামর্শটি দিয়েছে ভাল—এখানে তুমি তোমার এলাকায় আছ; চারদিকে লোকজন, গোলমাল—এখানে ত

বাগে পাওয়ার সুবিধা হবে না? তার চেয়ে তাদের সীমানার মধ্যে চল—বেশ গল্পগুজব করে আসাও চলবে। জমিদারী দেখাও হবে, দরকার হলে মাথাটা ফাটানও সহজে হয়ে যাবে। ঐ রামগোবিন্দ ব্যাটাই খুনে বদমাস্! চোখ দেখেছ—ব্যাটার?

আমি মণ্ডলগড় সম্বন্ধে হরনাথকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে আবার আগের মত নিশ্চিন্ত আরামে গা ঢেলে দিলুম। হরনাথের সঙ্গে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে রামগোবিন্দের মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা চলতে লাগলো।

এক বৎসর এই ভাবে কাটলো! তার পরে একটা মামলায় আমাদের হার হলো। রামগোবিন্দের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? হরনাথ বল্লে —সে না কি তার দলবল নিয়ে আমাদের মণ্ডলগড়ের কাছারীবাড়ীর পথ দিয়ে খুব বাজনা বাদ্য করে ঘটা করেছে; আর আমাকে ও হরনাথকে নানা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছে।

বিষম রাগে ও আক্রোশে হরনাথ যেন পিঞ্জরে-পোরা বাঘের মত গর্জ্জে বেড়াচ্ছিল। তার মুখে ক্রমান্বয়ে এই সব শুনে শুনে আমিও রাগে অন্ধ হয়ে উঠলুম! এ দুর্জ্জয় লোকটাকে কি করে জব্দ করা যায়?

অনেক রাত্রে হরনাথ আমার বৈঠকখানায় এসে বসলো। তখন আর-সব বন্ধুবান্ধবরা উঠে গেছে—আমি একা!

হরনাথ একটা নূতন বোতল বার করলে! আমার অবস্থা তখন খুব শোচনীয়—তবু সে আবার একগ্লাস পূর্ণ করে আমার সামনে ধরে বল্লে—দেখ! সন্ধ্যে থেকে ভেবে ভেবে সে ব্যাটাকে জব্দ করবার একটা চমৎকার মতলব বার করেছি। আর সব ব্যাটার বিষদাঁত ভেঙ্গেছি—এখন এই ব্যাটাকে বাগে আনতে পাল্লেই হয়। কিন্তু

ও যেমন ধুঁদে বদমাইস, তেমনি ওর আঁতে ঘা দিতে হবে—তবে না ওষুধ ধরবে ?

আমি নির্ব্বিবাদে গ্লাসটি শেষ করে বল্লুম, কি—মতলবটা কি ? তার বোধ হয় কথাটা বলতে কুণ্ঠা হচ্ছিল—সে ইতস্ততঃ করে করে আমায় আরও দু-এক গ্লাস খাওয়ালে। শেষ খুব চুপি চুপি বল্লে—দেখ ! ও ব্যাটার স্ত্রী বড় সুন্দরী। শুনেছি না কি তাকে ও ভারি ভালবাসে ! আমি বলি কি—সুবিধামত একদিন তাকে ধরে এনে কাছারিবাড়ীতে ঘণ্টা দুই আটকে রেখে ছেড়ে দি ! ব্যাটা গাঁয়ের লোকের কাছে যা জব্দ হবে তা'হলে। কোথাও আর মুখ দেখাতে পারবে না। তার পরে নিজেই গাঁ ছেড়ে পালাবে তখন ! কি বল ? ঠিক হবে না ?

আজ এসব কথা লিখতে লজ্জা ও ঘৃণায় আমার মন ধিক্কারে ভরে উঠেছে—কিন্তু তখন আমি খুব প্রফুল্ল হয়ে উঠলুম। আমার তখন মাথার কোন স্থিরতা ছিল না। হরনাথ যা বল্লে, আমি তাতে সায় দিতে দিতে সেইখানে অচৈতন্য হয়ে পড়লুম !

তার পরদিন সকালেই কলকাতা থেকে মামার এক টেলিগ্রাম পেলুম ! কি একটা বিশেষ দরকারি কাজে টেলিগ্রাম পাবামাত্র তিনি আমায় কলকাতায় যেতে লিখেছেন। তখনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বাড়ী ফিরে আসতে চার পাঁচ দিন দেরি হলো। এসে দেখি, হরনাথ মণ্ডলগড়ে ফিরে গেছে। সেদিন রাতে অচৈতন্য অবস্থায় নেশার ঘোরে আমি তাকে কি বলেছিলুম, তা আমার কিছুই মনে ছিল না। কাজেই এ বিষয়ে আমি কোন খোঁজ-খবর করিনি।

তখন আশ্বিন মাস। ৺পূজা আগতপ্রায়। ঠাকুরদালানে প্রতিমা

গড়া আরম্ভ হয়েছে। সামনের মাঠে যাত্রা হবে বলে আটচালা বাঁধা হচ্ছে!

সন্ধ্যার সময় যে-যার কাজ সেরে চলে গিয়েছে—আমি একলা ঘুরে ঘুরে আটচালাটা কেমন বাঁধা হলো, দেখছিলুম। কাছে বেশি লোকজন ছিল না।

হঠাৎ মাঠের অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘকায় লোক দানবের মত আমার দিকে তীরের বেগে ছুটে এলো। তার হাতে একটা বড় ছোরা—আলো লেগে ঝক্‌মক্ করে উঠলো।

লোকটাকে অমনভাবে ছুটে আসতে দেখে আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলুম! তখনি দুজন পাইক ছুটে এসে তার ছোরা-সমেত উদ্যত হাত ধরে ফেল্লে!

সে যখন তাদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, আমি তখন একটু হাঁপ ছেড়ে চেয়ে দেখি—সে সেই মণ্ডলগড়ের সর্দার বদমাস্—রামগোবিন্দ!

তার কাপড় ময়লা—মাথার চুল রুক্ষ, উস্কোখুস্কো। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল—চোখের ভিতর থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে!

আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম! সে আমার দিকে চেয়ে ভগ্ন রুক্ষ কণ্ঠে বল্লে—পাষণ্ড! নরপিশাচ! আজ বেঁচে গেছ বলে মনে করো না যে, তোমার বিপদ কেটে গেল! আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ তোমার রক্তপানের তৃষ্ণা আমার যাবে না! আমি তোমার ভালর জন্য তোমায় যে সুপরামর্শ দিতে গিয়েছিলুম, তুমি তার পরিবর্ত্তে আমায় এই এক বৎসর ধরে ছন্নছাড়া করে তুলেছ। আজ আমার এমন অবস্থা, ঘরে এক মুঠা অন্ন নেই—জীবনধারণ

করবার কোন অবলম্বন নেই। তবু তাতেও তোমার তৃপ্তি হলো না—তুমি আমার বুকে নরকের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ? এর ফল তোমায় একদিন না একদিন পেতেই হবে! রামগোবিন্দকে বন্ধুভাবে নিতে পাল্লে না, শত্রুভাবে নিয়েছ;—বেশ—তাই ভাল! আবার দেখা হবে!

তার গায়ে কি অসীম ক্ষমতা! একবার দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে একটি ধাক্কা দিতেই—যে তার হাত ধরেছিল, সে ঘুরে পড়ে গেল! চোখের নিমিষে আর একটাকে এক-ঘা লাথি কসিয়ে দিয়ে সে কোন দিকে উধাও হয়ে গেল, আর তাকে কেউ দেখতে পেলে না।

আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলুম! হরনাথ তবে যা যা বলেছিল, সবই সত্য! বিনা কারণে আমায় সত্য সত্যই খুন করবার জন্য অপূর্ব্ব মিত্তির এদের লাগিয়ে রেখেছে! কিন্তু ও-লোকটা আরও যে-সব কি কতকগুলো কথা হড়বড় করে বলে গেল, সে-গুলোরই বা মানে কি? আমি ঘরের পয়সা দিয়ে যে সম্পত্তি কিনেছি, তাকে দখলে রাখবার চেষ্টা না করে নিরীহের মত ওদের হাতে তুলে দিতে হবে না কি? আব্দার মন্দ নয় দেখছি! আজই এদের নামে পুলিশে ডায়েরী করিয়ে আসতে হবে! দিন দিনই বাড় বেড়ে চলেছে!

পাইক্ দুটো তখনো সেখানে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাদের ডেকে বল্লুম, এ কি কাণ্ড রে নফরা? এ লোকটা শুধু শুধু আমায় তেড়ে খুন করতে এলো কেন?

তারা দুজনে মাথা হেঁট করলে! মনে হলো—তাদের যেন কিছু বলবার আছে! আবার জিজ্ঞেস কল্লুম; বল্লুম—জানিস কিছু ত বল না?

নফর বল্লে—আজ্ঞে ওনার ইস্তিরী এই তিন দিন আগে ঐ পুকুরটায় ডুবে মরেছে।

আমার সর্ব্বশরীর যেন কেমন কেঁপে উঠলো। রামগোবিন্দের স্ত্রী? কি এই রকম একটা অস্পষ্ট কথা যেন মনে পড়ছিল—অথচ ঠিক ধরতে পাচ্ছিলুম না। বল্লুম,—কেন মরলো, তোরা জানিস?

তারা আবার ঘাড় হেঁট করে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বল্লে—আজ্ঞে—গোমস্তা মশায়রা সব জানে।

যা! ডেকে নিয়ে আয়! আমার বসবার ঘরে পাঠিয়ে দিবি! এখনি!

তারা ছুটে চলে গেল। আমিও ঘরে এসে বসলুম। শশিভূষণ আমলার কাছে শুনলুম, আমি কলকাতায় চলে যাবার পর হরনাথ একদিন আমার সব পাইক আর লোকজন নিয়ে রামগোবিন্দের ঘর ভেঙ্গে ঢুকে তার স্ত্রীকে এখানে ধরে আনে। এই ঘরটাতেই তাকে এক রাত আটকে রেখেছিল। রামগোবিন্দ তখন অন্য কাজে গ্রামান্তরে গিয়েছিল। সকালে তার স্ত্রীকে হরনাথ ছেড়ে দিতেই, সে আর কোন দিকে না গিয়ে সোজা পিছনের পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৈকালে তার দেহ ভেসে উঠতে সবাই দেখতে পায়। হরনাথকে এজন্য দু একজন অনুযোগ করাতে, সে বলে যে বাবুর হুকুমেই সে এ-কাজ করেছিল, নিজের মতে করে নি। তাই শুনে আর কেউ কোন কথা বলতে সাহস করে নি।

এবার আমার সব কথা মনে পড়লো। আমার সম্মতি যে হরনাথ কি করে' আর কি অবস্থায় নিয়েছিলো, তাও ক্রমে ক্রমে মনে হলো! লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুতাপে আমার বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল! আমি এ কি করলুম! আমার জন্য একটি নিরপরাধিনী নারী এমনভাবে

নির্য্যাতিত হয়ে প্রাণ দিলে! আমিই এ স্ত্রীহত্যার কারণ! রাম-গোবিন্দের সঙ্গে আমার যতই শত্রুতা থাক্—সে বোঝাপড়া আমার তার সঙ্গে হবে! তার স্ত্রী আমার কাছে কোন্ অপরাধ করেছিল যে, আমি তাকে এত বড় দণ্ড দিলুম? আমি নিজে যতই অধঃপাতে যাই—আমার দ্বারা কখনো কোন নারীর অমর্য্যাদা হয়নি। আর সেদিন হরনাথের প্ররোচনায় আমার মাথায় এ কি শয়তানি বুদ্ধি যোগাল, যে আমি অনায়াসে এত বড় একটা অন্যায় কার্য্যে সম্মতি দিয়ে এই কাণ্ডটি ঘটালুম?

সমস্ত রাত শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় কাটলো! ভোর হতে না হতেই কারুকে কিছু না বলে সোজা মণ্ডলগড়ে চলে গেলুম। এ সুবুদ্ধি যদি আর কিছুদিন আগে হতো, তা হলে আর এত বড় মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটতো না!

হরনাথ আমায় এত সকালে বিনা সংবাদে সেখানে হঠাৎ দেখেই কেমন থতমত খেয়ে গেল!

আমি কোন ভূমিকা না করে একেবারে এই কথাই পেড়ে তাকে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলুম।

সে বল্লে,—তা—তুমি যা শুনেছ—সে-সব সত্যই বটে। সেদিন রামগোবিন্দ মামলা জিতে যে কাণ্ডটা করলে, তাতে কেমন রোখ চেপে গেল—তাকে শাস্তি দিতে হঠাৎ একটা কাজ করে ফেল্লুম, এখন দেখছি—কাজটা ভাল হয় নি। আমারও বড় মন খারাপ হয়ে গেছে! মেয়েটাই যে খামকা অমন একটা কাণ্ড করবে, তাই বা কেমন করে জানবো বল? আমি ত তাকে চোখেই দেখি নি! পাইকরা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল; ছেড়ে দিতেই এই ব্যাপার।

হরনাথের কথা আমার বিশ্বাস হলো না। তার স্বরে বা চেহারায়

তার স্বাভাবিক ভাব কিছু ছিল না। আমার বোধ হল—সে ভয় পেয়ে সবই মিথ্যা কথা বলছে।

খানিক চুপ করে থেকে সে বল্লে,—কথাটা তোমাকেও ত বলেছিলুম। তুমিও যদি সে সময় বারণ করতে, তা হলেও এমন কাণ্ড হতো না। তা তোমারও সে সময় মাথায় এলো না।

আমি তাকে ধমক দিয়ে উগ্রভাবে বল্লুম,—বাজে কথা কতকগুলো বোল না। তোমার নিজের বরাবর এই সব বদমাইসি বুদ্ধি ছিল,—শুধু দোষ কাটাবার জন্য আমার মুখ থেকে কথা নেবার তোমার দরকার ছিল। তাও যে-রকম করে আর যে-অবস্থায় বার করে নিয়েছিলে, তুমি নিজে সে-কথা ভাল করেই জান। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে হবে না।

হরনাথকে কাছারী-বাড়ীতে বসতে বলে আমি বেরিয়ে পড়লুম। পথেই সে গ্রামের কয়েকটি ভদ্র গৃহস্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়ে গেল! তাঁরা আমার পরিচয় পেয়ে সবিনয়ে ও সাদরে আমায় তাঁদের ঘরে নিয়ে বসালেন। তখন কথায় কথায় এক এক করে সব কথা প্রকাশ হয়ে গেল।

হরনাথ এখানে এসে নিরীহ প্রজাদের উপর নানা জুলুমবাজি ও অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। রামগোবিন্দ ও আর জনকতক ভদ্রলোক তার কাজের প্রতিবাদ করায় সে প্রজাদের ছেড়ে এদের উপরে উৎপীড়ন অত্যাচার করতে থাকে। অবশেষে সকলে উত্যক্ত হয়ে তার কাজের উপর কথা বলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তারা সকলেই নির্ব্বিরোধী সংসারী লোক, নিজেদের সংসার ছেলে-পিলে নিয়ে বিব্রত—নিজেদের বিষয়-সম্পত্তিও দেখা-শোনা করতে হয়—কত দিন আর পরের কথা নিয়ে ঝগড়া করে বেড়াবে? কিন্তু রামগোবিন্দ ছিল বড়

তেজী ও ন্যায়পরায়ণ প্রকৃতি—আর তেমনি একরোখা; যা ধরবে—তার শেষ পর্য্যন্ত সমান অধ্যবসায় ও জোরের সহিত যুঝবে! সে হরনাথের সামান্য অন্যায়টি পর্য্যন্ত মেনে নিয়ে চলতো না। ফলে দুজনে বচসা, মনান্তর ইত্যাদি হতে হতে ক্রমশঃ বিষম শত্রুতা বেধে উঠলো। হরনাথ দেখলে, রামগোবিন্দকে সরাতে না পারলে তার এখানে জমিয়ে বসবার আশা বৃথা। তখন সে নানা হাঙ্গামার মধ্যে নিত্য নূতন মিথ্যা মামলার মধ্যে তাকে জড়িয়ে ফেলে, একেবারে ব্যতিব্যস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত করে তুললে। রামগোবিন্দ মধ্যে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করেছিল, সে-কথাও এঁদের মুখে শুনলুম।

রামগোবিন্দ আমার কাছ পর্য্যন্ত তার নামে নালিশ করতে গিয়েছিল শুনে, হরনাথ আরও জাতক্রোধ হয়ে উঠলো। তার উপরে আমাকে রাগিয়ে তোলবার জন্য সে অনেক মিথ্যা গল্প রচনা করে' আমায় শোনালে। আমায় খুন করার পরামর্শ, অপূর্ব্ব মিত্রের আমার উপর আক্রোশ—প্রজাদের বিদ্রোহী করবার জন্য রামগোবিন্দের চেষ্টা—থেকে আরম্ভ করে' মামলা জিতে রাম-গোবিন্দের ঢাক ঢোল বাজান ও আমায় গালাগালি পর্য্যন্ত সবই হরনাথের রচা গল্প। সে নিজের কু-প্রবৃত্তির জন্য ও রামগোবিন্দকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দেবার জন্য শেষোক্ত কাণ্ডটি করেছে।

কাছারী বাড়ী ফিরে এসে আর তাকে দেখতে পেলুম না। আমায় আসতে দেখেই সে তার সব কারসাজি বেরিয়ে পড়বে জেনে—দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

রামগোবিন্দের অনেক সন্ধান করলুম; কিন্তু সে যে তার শিশু

পুত্র অসিতকে নিয়ে সেই রাত্রে কোথায় চলে গেছে, তার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

আমি বুঝলুম, প্রথমে সে জানতো—এ-সব অন্যায় অত্যাচার হরনাথের কীর্ত্তি; তাই যাতে আমি নিজে সব বিষয় তত্ত্বাবধান করে এ-সব গোলমাল, বিরোধ মিটিয়ে ফেলি, সেই জন্য আমার কাছে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তার পরে আমি মণ্ডলগড়ে গেলুম না, উপরন্তু হরনাথের বদমাইসি ক্রমেই আরও বাড়তে লাগলো, তখন তার ধ্রুব বিশ্বাস হলো, যে, হুরনাথ আমার নিয়োজিত লোক মাত্র। সে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করে না আমার আজ্ঞা ও উপদেশ পালন করে মাত্র। হরনাথ ইচ্ছা করে' আমার ঘাড়ে সব দোষ ফেলবার জন্য, আমার বাড়ীর লোকজন নিয়ে গিয়ে রামগোবিন্দর ঘর ভেঙ্গে তার স্ত্রীকে টেনে আনে। মণ্ডলগড়ের কাছারিবাড়ীতে রাখলে তার নামে চাপ পড়তে পারে, তাই তিন চার ক্রোশ পথ ভেঙ্গে তাকে আমার বাড়ীর ভিতর আমারই বসবার ঘরে আটক করে রেখেছিল। ছাড়া পেয়ে স্ত্রীলোকটি আমারই বাড়ীর পিছনের পুকুরে ডুবে মরেছে। এই সব কারণে তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, এ-সবই আমার কীর্ত্তি। আমি যে তখন কল্‌কাতায় ছিলুম, এ খবরটা সে পায় নি।

এত ক্ষণে সব ব্যাপারটা আমার স্পষ্টরূপে বোধগম্য হলো। কেন যে সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সে শাণিত ছোরা নিয়ে আমায় তেড়ে এসেছিল, সে সবই এবার ভাল করেই বুঝলুম। তবে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল, বুঝে কোন ফল হল না।

এবার আর মণ্ডলগড় পরগণার বিরোধ মিটতে দেরি হলো না। সেখানকার সব সুবন্দোবস্ত করে আমি অনুতপ্ত ও মর্ম্মাহত হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলুম।

আমি তার পর থেকে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গ, আর আমোদ-প্রমোদ সবই ছেড়ে ফিরে দাঁড়ালুম। তখন থেকে নিজে সমস্ত বিষয় দেখা-শোনা, জমিদারীর স্থানে স্থানে গিয়ে কর্ম্মচারীদের কাজ-কর্ম্মের তদারক করা, প্রজাদের অবস্থার সন্ধান করা—ইত্যাদি সব বিষয়েই মনঃসংযোগ করলুম। কিছুদিন পরে তোমার মা ঘরে এলেন, আরও কিছুদিন পরে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত তুমি এসে আমার শূন্য নিরানন্দ গৃহ আনন্দের কলকাকলীতে পূর্ণ করে তুললে।

সবই হলো, কিন্তু আমি আর আমার মনের শান্তি ফিরে পেলুম না। দারুণ আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় আমার অন্তর দগ্ধ হয়ে যেত, —আমারই দোষে উদারচেতা, মহানুভব রামগোবিন্দ অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত হয়ে, ধনে-প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় দেশান্তরী হয়ে গেছে; এ-কথা আর আমি কিছুতে ভুলতে পাচ্ছিলুম না। তোমার মায়ের হাসিভরা সুন্দর, পবিত্র মুখখানির দিকে চাইলেই, আমার রামগোবিন্দের সুশীলা পত্নীর কথা মনে পড়তো; তোমায় বুকে চেপে আদর করতে গেলেই আমার শিশু অসিতের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উদাস হয়ে যেত। সেই ছোট কুসুম-সুকুমার শিশুকে নিয়ে তার উন্মাদ পিতা কোথায় পথে পথে আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরছে! আর তখন কোন দিকে, কোন কাজে আমি মন দিতে পারতুম না।

দিনের পর দিন আমার এই মানসিক ব্যাধি ও অশান্তি বাড়তে লাগলো। গভীর রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে আমি ভয়ে চীৎকার করে জেগে উঠতুম,—স্বপ্নে যেন রামগোবিন্দ ছোরা-হাতে জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে তেড়ে আসছে! ঘামে সর্ব্বশরীর ভিজে যেত! আমি উঠে বসে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকতুম! ক্রমান্বয়ে একই কথা ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। শেষে জাগ্রতে স্বপ্নে

সব সময়ই দেখি—তার সেই রুক্ষ দীর্ঘ আকৃতি,—সেই কালাগ্নিশিখার মত অগ্নিময় চক্ষু—হাতে সেই শাণিত অস্ত্র—সে উল্কার মত তীব্র বেগে আমার দিকে ছুটে আসছে! জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠলো! তখন অগত্যা উপযুক্ত লোকের হাতে বিষয়-কার্য্য ছেড়ে দিয়ে আমি তোমাদের নিয়ে দেশত্যাগ করলুম।

মা নির্ম্মল! এই আমার কলঙ্কিত জীবনের শোচনীয় দীর্ঘ ইতিহাস। এর পর থেকে আর আমার জীবনে লুকোবার বা লজ্জা পাবার মত আর কোন বিষয় নেই। প্রথম বয়সে বুদ্ধির দোষে একদিন যে অন্যায় করেছি, সারা জন্ম তারই জের টেনে কাটলো, আজও শান্তি পেলুম না।

এখানে এসে সম্পূর্ণ নূতন দেশ, নূতন সঙ্গ ও সবই নূতনের মধ্যে পড়ে আমার সব মানসিক রোগ অনেক কমে গিয়েছিল, তবে মনের ভিতর থেকে একেবারে যায় নি। আমি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দেশে গিয়ে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে আসতুম। রামগোবিন্দের যে-সব সম্পত্তি মামলা-মোকর্দ্দমার জন্য, ঋণের দায়ে ও হরনাথের চক্রান্তে নষ্ট হতে বসেছিল, সে-সবের পুনরুদ্ধার করে যোগ্য লোকের হাতে ভার দিয়ে এসেছি—পঁচিশ বৎসরে তার সে সম্পত্তি ও নগদ টাকা—একটা রীতিমত বড় বিষয়ে দাঁড়িয়েছে! তার গৃহ প্রতি বৎসর সংস্কার করিয়ে অভগ্ন নূতন অবস্থায় ভাল লোকের তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছি—যদি কোন দিন অসিতকে খুঁজে পাই, সে এসে তার সব ভোগ করবে বলে। হরনাথ আমার ভয়ে তার টাকা-কড়ি সব নিয়ে দেশে পালাচ্ছিল,—পথিমধ্যে ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে সে মারা গিয়েছে, খবর পেয়েছিলুম। কিন্তু রামগোবিন্দ ও অসিতের অনেক খোঁজ করেও কোন সন্ধান পেলুম না।

পঁচিশ বৎসর এমনি করেই কেটে আসছিল। তাদের সন্ধান পাবার আশা যখন মন থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে, সেই সময় একদিন পাটনার জঙ্গলে অতর্কিত ভাবে অসিতের সঙ্গে দেখা হলো! আমার পরিচয় পেতেই তার চোখে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তাতেই আমি বুঝলুম, রামগোবিন্দ সারা জীবনেও আমার প্রতি সে প্রতিহিংসা ভুলতে পারে নি,—অসিতকে সে জ্ঞানের উদয় থেকে এ-সব কথা ভাল করেই বুঝিয়ে গেছে,—তার সেই ভীষণ প্রতিহিংসার জ্বালা তার সন্তানের মর্ম্মে মর্ম্মে দেগে দিয়ে গেছে! তার সে শিক্ষা, সে উপদেশ কখনো ব্যর্থ হবে না।

সেই দিন থেকে আবার আমার মনে সেই দীর্ঘ অতীতের স্মৃতি নূতন করে জেগে উঠেছে। সেই অশান্তি, সেই বিভীষিকাময় মৃত্যুর ছবি আমি আর কিছুতে ভুলতে পারছি না। আমি জানি, হয় ত কোন এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে অসিতের হাতেই আমার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু তবু এজন্য আমি কারুকে দোষী করতে চাই না! আমি জানি এ দণ্ড আমার ন্যায্য প্রাপ্য। আমি কি তাদের সুখ ও শান্তিময় গৃহে নরকের আগুন জ্বালিয়ে দিই নি?

যার হাতে বহু লোকের সুখ-দুঃখের ভার থাকে, সে যদি তার নিজের অযোগ্যতা ও আলস্যের জন্য সে কর্ত্তব্য পালন করতে না পারে, তবে তার উচিত, নিজেকে সে পদ, সে ঐশ্বর্য্য থেকে অপসৃত করা। সেইখানে চেপে বসে সে সম্পত্তি, সে বিষয় ভোগ করা তার উচিত নয়! আমি ত তা করি নি মা! আজ হরনাথের দোষ দিয়ে নিজেকে নির্দ্দোষ বলে মনে সান্ত্বনা কি বলে নিই? হরনাথকে আমি অন্যায় করবার অবসর ও সুযোগ দিয়েছিলুম, তবে ত সে করতে পেরেছে? অপরাধ সবই আমার! আমার মনে স্থির বিশ্বাস যে, এইবার আমার দণ্ড গ্রহণ

করবার সময় এসেছে। না হলে এতদিন পরে আবার তার সঙ্গে কেন দেখা হলো? সে আমাকে তার পরম শত্রু বলে জানবার শিক্ষাই আজীবন পেয়ে এসেছে; তাই আমার বিরুদ্ধে তার মনের সমস্ত ক্রোধ, ঘৃণা, বিরক্তি ও প্রতিহিংসা উদ্দীপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু সে যদি জানতো, আজ এই দীর্ঘ দিন ধরে আমি কত আগ্রহে, কত আশায় তাদের সন্ধান করেছি!

ভাগ্য যদি অন্যরূপ না হতো, তা হলে আমার একমাত্র কন্যার বিনিময়ে তাকে পেয়ে আমি পুত্রের অভাব ভুলতে পারতুম; এই শেষ বয়সে সে আমার জীবনের অবলম্বন ও আশ্রয় স্বরূপ হতে পারতো। কতদিন মনে মনে এই কথা আলোচনা করেছি; কিন্তু সে ত হবার নয় মা! বিধির বিধানে আমাদের সম্বন্ধ যে-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়ে এসেছে, কার্য্যক্ষেত্রে তাই ত দাঁড়াবে!

কিন্তু তবু আমার তার সঙ্গে দেখা করবার বা তাকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌বার সাহস নেই। সে যে কোথায় আছে, তাও আমি জানি না। তাই সব কথাই লিখে রেখে গেলুম, মা। যদি কোন দিন তার সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাকে এই পত্র দেখিও, তার নিজের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাকে বুঝে নিতে বলো। আর বলো—যদি সে পারে, তবে যেন এই অনুতপ্ত বৃদ্ধকে মন থেকে ক্ষমা করে। তোমার পিতার সব কথা জেনে তুমিও তাকে ক্ষমা করো মা। ভগবান তোমাদের কল্যাণে রাখুন—আমি তাকে ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি।

৪৯

মিঃ ঘোষের সুদীর্ঘ আত্মকাহিনী শেষ করিয়া অসিত কিছুক্ষণ স্তব্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। নির্ম্মলাও এতক্ষণ পাষাণপ্রতিমার মত

নিশ্চল ভাবে বসিয়া অসিতের পাঠ শুনিতেছিল; পত্রের শেষাংশ শুনিতে শুনিতে তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মিঃ ঘোষের শোচনীয় জীবনের স্মৃতি উভয়ের অন্তরেই মর্ম্মান্তিক বেদনা জাগাইয়া তাহাদের আকুল করিয়া তুলিতেছিল।

নির্ম্মলা আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল—"আমার বাবা! আমার অমন দেবতার মত বাবা! কি দুঃখ ও যাতনা ভোগ করেই তাঁর দীর্ঘ জীবনের এক একটি দিন কেটেছে! কোন দোষে দোষী না হয়েও একদিনের জন্য মনে শান্তি পেলেন না তিনি! তাঁর কথা মনে হলেই কেবল আমার বুক ফেটে চোখে জল আসে!"

অসিত বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আর আমার কারু উপর রাগ বা দুঃখ কিছু করবার নেই নির্ম্মলা! জগতের ব্যাপার দেখে দেখে আমার এখন নিশ্চিত ধারণা হয়ে গেছে যে, মানুষ ভাল মন্দ কোন কাজই তার নিজের ইচ্ছায় বা শক্তিতে করতে পারে না! সে জন্মাবার পর থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন এক অদৃশ্য প্রবল শক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তার নিজের কোন স্বাধীন সত্তা নেই। অনেক দুঃখ পেয়ে পেয়ে, অনেক অনেক আশায় বঞ্চিত হয়ে, ঠেকে ঠেকে এখন আমার এ জ্ঞান হয়েছে। কার জন্যে কে দুঃখ পায়, কার আশার বস্তু আর কার হাতে চলে যায়, কেন যায়, কি হয়,—জগতের এ সব দুরূহ সমস্যার আমরা কোন সমাধানই করতে পারি না; কেবল একে ওকে দোষ দিয়ে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে' মরি মাত্র।

এই মিঃ ঘোষের কথাই ধর। তিনি সত্য সত্যই কোন দিন ত আমাদের অনিষ্টের কল্পনা করেন নি। আমাদের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা থাকা দূরে থাক, চাক্ষুষ পরিচয় মাত্র ছিল না। তবু দেখ—তাঁকে

লক্ষ্য করে' এতদিন ধরে কি সব ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড ঘটে' কটা জীবন একসঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল !

আমার মা ইতরের হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করে' আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন ; আমাদের সংসার, বিষয়-সম্পত্তি সব ছারখার হয়ে গেল ; বাবা অসহ্য অপমানে ও ব্যর্থ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে অশেষ কষ্ট সহ্য করে' পথের উপর অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন ; আমি বাড়ীতে থেকে মানুষ হলে যে-ভাবে আমার জীবন গড়ে উঠতো, তার কিছু না হয়ে, পথে পথে ঘুরে একটা কেমন জীব হয়ে দাঁড়ালুম। মিঃ ঘোষ সারা জীবন দারুণ মনঃকষ্টে ভুগে ভুগে অপঘাত-মৃত্যু বরণ করে নিতে বাধ্য হলেন ; আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, তুমি মাঝ থেকে আমাদের এই সব জালে জড়িয়ে পড়লে। যাদের কোন কালে দেখ নি, যাদের নাম পর্য্যন্ত কখনো কাণে আসে নি তোমার, তাদের জীবনের ঘটনার মধ্যে পড়ে তোমার ভাগ্যও নিরূপিত হয়ে গেল। তোমার এই নূতন মুকুলিত জীবন আরম্ভ হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল !

মোটামুটি ধরতে গেলে হয় ত মিঃ ঘোষকেই এর জন্য দায়ী করা যায় ; কিন্তু সত্যিই কি কোন দিন তিনি এ-সব চেয়েছিলেন ? এ-সব বিষয়ে আমরা যেমন নির্দ্দোষ, তিনিও কি তাই নয় ?"

উভয়েই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর অসিত আবার বলিল—"আর আমারও বড় মন্দ ভাগ্য, নির্ম্মলা ! শিশুকাল থেকে—মা মারা যাবার পর থেকে, কত দুঃখ, কত বড় বড় ঝড়ই যে আমার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, সে বলে বোঝান যাবে না। কিন্তু সব চেয়ে আমার বড় দুঃখ এই ছিল, আমি কোথাও একটু, এতটুকুও স্নেহ বা ভালবাসা পাই নি। বাবা হয় ত ভালবাসতেন ; কিন্তু তাঁর

সে ভালবাসার বাহ্যিক কোন প্রকাশ ছিল না। নানা দুঃখে
তাঁরও বোধ হয় মনটা পাথর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে কেব
শিক্ষা আর উপদেশ, বিরক্তি ও তিরস্কার—এ ছাড়া আর বিশেষ কি
পাই নি। তবু তিনি যতদিন ছিলেন, একটা অবলম্বনও ছিল
তিনি যাবার পর থেকে একবারে পথ সার। কেবল পথে পথে ঘু
যাদের জীবন কাটে, যাদের স্নেহ বা ভালবাসা পাবার কোথাও এক
উপায় না থাকে, সে-সব লোক যেমন হয়ে ওঠে, আমিও দিন দি
সেই রকম শুষ্ক ও নীরস হয়ে উঠেছিলুম।—শুধু কাজ আর কাজ
শুধু শুষ্ক কর্ত্তব্য-জ্ঞান ছাড়া আমার জীবনে কিছুই ছিল না। তোমা
দেখবার পর থেকে নির্ম্মলা, আবার যেন আমার জীবন নূতন পথে
আলো দেখতে পেলে; আবার আমি নূতন করে সব কথা ভাবতে
বুঝতে আরম্ভ করলুম। আমার জীবনের গতি নূতন পথে প্রবাহি
হলো।

কিন্তু তবু দেখ! আমার মত হতভাগ্য সর্ব্বস্ব-বঞ্চিত ভবঘুরে
জন্যও এক স্থানে স্নেহের এমন উৎস লুকানো ছিল, অথচ, আ
জীবনে তার কোন সন্ধানই পেলুম না। সবই হতে পারতো, সবই
পেতে পারতুম; ধন ঐশ্বর্য্য, বিলাস সুখ, অগাধ স্নেহ-যত্ন, আর সকলে
চেয়ে প্রিয় ও বাঞ্ছিত—আমার কাছে একমাত্র কাম্য বস্তু—তুমি—
তোমাকেও সহজেই পেতে পারতুম,—আর পারতুমই বা বলি কেন-
এখনো ত পেতে পারি; কিন্তু তা ত আর হবার নয়—নির্ম্মলা
তোমার বাবা কিছু না করেও আমার মায়ের—আমার বাবার—স
দুঃখ ও অপমানের কারণ; আর আমি মন থেকে মিঃ ঘোষের প্রতি
সব রাগ ও হিংসা বর্জ্জন করলেও, কার্য্যতঃ আমিই তাঁর হত্যাকা
আমরা দুজনে কোন দিন কি এ-কথা ভুলতে পার্ব্ব? আমা

উভয়ের মিলন, আমাদের উভয়ের সান্নিধ্য কি প্রতি দণ্ডে, প্রতি পলে এই দুঃখময় ঘটনার স্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত থেকে পরস্পরের জীবন বিষাক্ত করে তুলবে না? তাই বলছিলুম, যে সৌভাগ্য সময়ে এলে জীবন হয় ত ধন্য হতে পারতো আজ আর তা কোন কাজেই লাগবে না। আজ আমাদের জীবনের পথ জটিল, দুর্গম, নানা সমস্যায় পূর্ণ। আজ আর তার মাঝে সমাধান বা মীমাংসার চেষ্টা বৃথা।"

নির্ম্মলা নীরবে নতমুখে কাঁদিতেছিল—সে কোন কথা বলিল না।

অসিত কিছুক্ষণ পরে আবার বলিল—"মানুষের মন অন্য মনকে কি আশ্চর্য্য ভাবে টানে, নির্ম্মলা? আমি তাই ভেবে অবাক্ হচ্ছি। আজ আমি মিঃ ঘোষের লেখা পড়ে যেন সব ঘটনা বুঝলুম; কিন্তু যখন এই সব কিছুই জানতাম না, যখন আমাদের সর্ব্ব দুঃখের জন্য তাঁকেই দায়ী করতুম, তখন অনেক চেষ্টা করেও তাঁর প্রতি কিছুতে রাগ বা হিংসার ভাব আনতে পারতুম না। এজন্য নিজেকে কত ধিক্কার দিয়েছি, কাপুরুষ বলে নিজের উপর ঘৃণা জন্মে গেছে; কিন্তু তবু তাঁর সেই স্নেহ ও বাৎসল্যে ভরা সদানন্দময় মুখ মনে হলেই আমার হিংসা ক্রোধ কোথায় ভেসে যেত; মনে হ'ত—এমন লোকের দ্বারা কি এ রকম নৃশংস কাণ্ড হওয়া সম্ভব? মনে মনে তাঁর উপর আর আমার বিশেষ বিরাগ ছিল না; কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি জেনে গেলেন—আর কতকটা সত্যও বটে—যে, আমিই তাঁর হত্যাকারী। সেদিন আমি ভেবেছিলুম, প্রবল জ্বরে তিনি হার্টফেল হয়ে মারা গেছেন; কিন্তু আজ বুঝছি, তা নয়; তিনি আমার সম্বন্ধে যে সংশয় ও আতঙ্কে সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন, তাতে সেদিন তাঁকে ধরবার জন্য আমায় ছুটতে দেখে ভয়েই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেছে! কি আশ্চর্য্য দুঃখময় ঘটনা!"

সহসা ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অসিত চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল—"কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল যে! আমাকে আজ রাত্রের ট্রেণে অনেক দূরে যেতে হবে। এখন তবে আসি নির্ম্মলা? এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারলেই, আবার যেমন করে হোক তোমায় খবর দেব।"

নির্ম্মলা মুখ তুলিয়া বলিল—"বাবার চিঠিতে ত সব দেখলে;—তোমার নিজের ত অনেক টাকা রয়েছে, বাড়ী ঘর রয়েছে,—আর কেন এমন করে পথে পথে কষ্ট করে ঘুরবে? সেগুলো সব বুঝে নিয়ে সেখানে গিয়ে থাকলেও ত হতো?"

অসিত একটু হাঁসিয়া বলিল—"সে-সব আর হয় না, নির্ম্মলা। এমন দিনও গিয়েছে, যখন একসঙ্গে দশ বিশ টাকা হাতে পড়লে ভাগ্য বলে মানতুম; কিন্তু এখন? এখন নিজের জন্য টাকা আর কি হবে? তা ছাড়া সেদিন তোমায় যে-কথা বলে গিয়েছিলুম, মনে আছে ত? আমাদের দল থেকে আমরা সমস্ত দেশব্যাপী একটা বিদ্রোহের আয়োজন করেছিলুম। দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় সে-কথা পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের কাণে ওঠায় ব্যাপারটা ফেঁসে গেছে। এখন চারিদিকে গ্রেপ্তারের ধূম! আমাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই ধরা পড়েছে। সৈন্যদের মধ্যে অনেকের ফাঁসী হয়ে গেছে। আমি আর দু' চার জন এখনও জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে আত্মগোপন করে আছি। তাও পুলিশ সর্ব্বক্ষণ ঘরে, বাইরে, মাঠে, জঙ্গলে শিয়াল কুকুরের মত আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে! আমাদের এখন দাঁড়াবার স্থান নেই। দল থেকে তাই যে কয়জন এখনো বাইরে আছে, তাদের নিরাপদ রাখবার জন্য অনেক দূরে গুপ্তভাবে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই জন্য আজ রাত্রে যেতে হবে।"

নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিয়া সভয়ে বলিল,—"তুমি এনার্কিষ্টদের দলে মশেছ—তা হলে? কেন এমন সাংঘাতিক কাজ করলে?"

অসিতের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—গবর্ণমেণ্ট আমাদের ওই নামই দিয়েছে বটে, তবে সত্য সত্যই আমরা সে-সব কিছু নই। আমরা দেশের স্বাধীনতা চাই। আরো অনেক বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোকে অন্য অন্য উপায়ে সে চেষ্টা করছেন। আমাদের কাছে যে-পথ শ্রেয়ঃ বলে মনে হয়েছে, আমরা সেই পথই বেছে নিয়েছি। দল থেকে এতদিন অন্য অন্য নানা কাজই হচ্ছিল; তবে এ-রকম একটা বড় বিদ্রোহের আয়োজন করে তোলা—এটা এই প্রথম হয়েছিল; তা সবই পণ্ড হয়ে গেল। কত দীর্ঘ দিন ধরে, কত লোকের মিলিত শক্তির সাহায্যে, কত ভয়ে ভয়ে, সংগোপনে তিল তিল করে এই বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল; কাজ আরম্ভ হবার দু'দিন আগে এক নিমেষে এক জনের জন্য সব ব্যর্থ হয়ে গেল। এ ব্যর্থতা, এ আশাভঙ্গ যে কতদূর গুরুতর—"

অসিত কথাটা শেষ না করিয়াই একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তাহার বিষণ্ণ ম্লান মুখ ও কথা নির্ম্মলার হৃদয়ে আঘাত করিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল,—"তা হলে এখন তোমরা আবার কি কর্ব্বে?"

"—তার ত এখন কিছুই ঠিক নেই নির্ম্মলা! এখন এ-সব গোলমাল চুকতে কিছুদিন সময় লাগবে। আমরাও আবার একটু স্থির নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পেলে, তখন আবার ভেবে দেখব—কি করা সম্ভব, কিই-বা করতে পারা যায়। তুমি টাকার কথা বলছিলে—নিজের জন্য টাকার বিশেষ প্রয়োজন নেই; তবে দেশের কাজে টাকার বিস্তর প্রয়োজন আছে। স্থির হয়ে বসে কোন উপায় স্থির করতে পারি যদি, তবে

এই সব টাকার দরকার হবে। তবে এটা ঠিক যে, আমরা যে-পথে নেমেছি, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সেই একই পথ। বিদেশীয় শাসনের ফলে দিন দিন আমাদের যে রকম অধঃপতন হচ্ছে, দিনের পর দিন সকল স্থানে, সকল কাজে, প্রতি পদে পদে দেশের উপর দিয়ে যে লাঞ্ছনা ও অবমাননার স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তা দেখে আমরা মাথা হেঁট করে এ-সব মেনে নিতে পারছি না; কাজেই, আমাদের এ-পথ ছাড়া উপায় কি? যতদিন বাঁচি, এই চেষ্টাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।"

নির্ম্মলা বলিল,—"আমি দেশের কথা কিছু জানি না, কখনো কিছু ভেবেও দেখি নি। তবে ভাল হোক্, মন্দ হোক্—তোমার যে গতি, যে পথ—আমারও তাই। টাকা আমার অনেক আছে; তাতেই বা আমার দরকার কি? আমার সব টাকা তুমি নিয়ে দেশের কাজে ব্যয় করো। আর আমায় তোমাদের কোন একটা কাজের ভার দিও; আমি দূরে থেকে তোমার কাজে লেগে থাকবো। না হলে আমিই বা কি নিয়ে থাকবো?"

অসিত প্রফুল্লচিত্তে বলিল,—"বেশ তো নির্ম্মলা! সে দিন আর সে সময় আবার আসুক। তখন তুমি যা বোলছো, সেই মতই কাজ হবে। তবে এখন আসি! সুধীরকে বলে যাচ্ছি—সে মাঝে মাঝে এসে তোমার খোঁজ-খবর নেবে। আমারও সব খবর তার কাছেই তুমি পাবে। রাত অনেক হয়ে গেল, আমি এবার উঠি।"

অসিত যাইতে উদ্যত হইলে নির্ম্মলা অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে বলিল—"আর একটা কথা—একটু দাঁড়াও! বল—আবার কত দিনে দেখা হবে?"

অসিত ফিরিয়া দাঁড়াইল। একবার নির্ম্মলার অশ্রুপ্লাবিত কাতর